বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি-গ্রন্থাবলী—নং ২

বীরভূম-বিবরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

মহারাজকুমার

শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

তত্ত্বভূষণ মহোদয় সম্পাদিত।

হেতমপুর-রাজবাটী—বীরভূম।

১৩২৬ সাল

মূল্য—৩৲ তিন টাকা।

বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থাবলী নং—২

বীরভুম-বিবরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

মহারাজকুমার

শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তত্ত্বভূষণ

মহোদয় সম্পাদিত।

(রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সহ)

"বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি" হইতে

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

হেতমপুর-রাজবাটী, বীরভূম

১৩২৬ সাল।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

"অবনীনাথ সংগ্রহ"

printed by
R. C. Mitra, at the **Visvakosha-Press.**
9, Visvakosha Lane, Baghbazar.
CALCUTTA.
1920.

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ; সি, আই, ই।

উৎসর্গ-পত্র

বর্ত্তমান বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতত্ত্ববিদ্ পূজ্যপাদ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এম্, এ, সি, আই, ই,

মহোদয় করকমলেষু—

বীরভূমের জন্য আপনি যাহা করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহা মনে রাখিব। আপনার মূল্যবান্ উপদেশ, আপনার অকৃত্রিম সহায়তায় বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি বহুল পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের প্রতি আপনার স্নেহ কত গভীর এবং কিরূপ আন্তরিক। যে স্নেহবশে—শত কার্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও আপনি আমাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, সেই স্নেহ স্মৃতি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। স্নেহ যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না, সেই ভরসাতেই আমার বড় সাধের এই

"বীরভূম বিবরণ ২য় খণ্ড"

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ আপনার করে সমর্পণ করিলাম। আশা করি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

নিবেদন ইতি

হেতমপুর-রাজবাটী,
বীরভূম
১৩২৬। ৪ঠা মাঘ

স্নেহমুগ্ধ
শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীভগবানের কৃপায় 'বীরভূম-বিবরণ ২য় খণ্ড' প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর দীর্ঘ তিন বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, এই অযথা-বিলম্বে আমরা লজ্জিত,—এবং সেজন্য সমিতির হিতাকাঙ্ক্ষীগণের নিকট ত্রুটি-স্বীকার করিতেছি। নিজেদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিয়া—কৈফিয়ৎ দিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া কোনো লাভ নাই।

প্রথম খণ্ডের নিবেদনে বলিয়াছিলাম—"বলিয়া রাখা ভাল,—ইহা ইতিহাস নহে"—এবারেও—এই স্থানে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। তবে একটা কথা বলিবার আছে,—এই খণ্ডের অনেক কাহিনীতে মাঝে মাঝে ইতিহাসকে লইয়া টানাটানি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সমিতির সম্পাদক মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তত্ত্বভূষণ মহোদয় লাভপুর-কাহিনীর শেষে যাহা বলিয়া—এই পুস্তকের উপসংহার করিয়াছেন,—আমরা সেই কথাই এখানে একটু বিষদ করিয়া বলিতেছি। মহারাজকুমার মহোদয়ের একান্ত ইচ্ছা, যে এইরূপে সংগৃহীত কাহিনী—মানুষের-বলা কাহিনীর শেষ হইয়া গেলে—এই সমস্ত কথাই—তিনি আর একবার অন্য আকারে শুনিবার চেষ্টা করিবেন। বীরভূমের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলি খনন করাইয়া—তাহার ভিতর হইতে কোনো তথ্যের উদ্ধার হয় কি না—চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। এই উদ্দেশ্যেই সন্দেহজনক স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য—তত্তৎ স্থানীয় প্রবাদের সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসের সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিবার,—একটা সূত্র খুঁজিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা যদি অনধিকার চর্চ্চা হয়—আশা করি ঐতিহাসিকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। সাধারণে সেই সেই অংশগুলি বাদ দিয়া যাইতে পারেন।

সম্পাদক মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তত্ত্বভূষণ মহোদয়ের অকৃত্রিম-স্বদেশানুরাগ, অক্লান্ত-উদ্যম এবং অজস্র-অর্থব্যয় ভিন্ন এই অগ্নিমূল্যের বাজারে—প্রায় একশতখানি ছবি—দিয়া এতবড় একখানা বই প্রকাশ করা কখনই সম্ভবপর হইত না। অবশ্য উপন্যাস-প্রকাশকগণের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই, কারণ উপন্যাসের নামে এখন সকলই চলিয়া যায়। কিন্তু 'দেশের কথা' আর পয়সা দিয়া কেহ কিনিয়া পড়ে না! সুতরাং এ বাজারে এ হেন পুস্তক প্রকাশের মূলে—শুদ্ধ স্বদেশ-প্রীতি বই আর কি থাকিতে পারে? যাহা হউক

তিনিই সমিতির সর্ব্বস্ব, অতএব তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের আন্তরিক কামনা—দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া বীরভূমের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-সংকলনে তিনি সাফল্য লাভ করুন।

বর্ত্তমান-বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সি, আই, ই মহোদয়ের মূল্যবান্ উপদেশে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। সমিতির কার্য্যে বীরভূমে আসিয়া—কয়েকবার তিনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন। চেদিরাজ কর্ণদেবের নামীয় শিলালিপির পাঠোদ্ধারকালে তিনি এবং আমাদের সভাপতি মহাশয় যখন বীরভূমে আসিয়াছিলেন তখন মুরারই ষ্টেশন হইতে পাইকোড় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে খেয়া-ডিঙ্গিতে যাতায়াত করিতে হয়,—পাগলা নদীর প্রবল প্লাবনে পথ-ঘাট সেবারে এতই দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল। সে কষ্টের কথা আমরা আজিও ভুলি নাই, তাঁহাদেরও বোধ হয় মনে আছে,—হয়তো চিরকাল থাকিবে। বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যে এই সে-দিনও শাস্ত্রীমহাশয় কেন্দুবিল্বে আসিয়া, সহজিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস-সংগ্রহ, এবং 'ইছাই ঘোষের দেউল' ও 'শ্যামারূপার গড়' প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া—বহু তথ্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। সম্পাদক মহারাজকুমার—বর্ত্তমান বিবরণ খানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া উপকৃত-সমিতির—ঋণভার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সমগ্র বীরভূমবাসী তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়—সমিতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, সময়ে সময়ে বীরভূমের দুর্গম পল্লী-পথ-পরিভ্রমণে—আপনার সময় ও স্বাস্থ্য ব্যয় করিয়া তথ্য-সংগ্রহে যেরূপ অকাতরে সাহায্য করিতেছেন, বাস্তবিকই তাহার তুলনা হয় না। বিশ্বকোষ সম্পাদনের পর হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সম্প্রতি তিনি কিছু অধিক পরিমাণে অসুস্থ। কিন্তু তথাপি—বর্ত্তমান ২য় খণ্ড প্রকাশে আমরা তাঁহার বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অসুস্থ অবস্থাতেও ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তিনি এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যের জন্য সমিতি—তথা সমগ্র বীরভূমবাসী তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি নিরাময়-দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া—এইরূপে স্বদেশের ঐতিহাসিক-সম্পদ-অর্জ্জনের সহায় হউন।

এই 'বিবরণের' জন্য যাঁহারা কাহিনী আদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন,—সকলকেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যথাস্থানে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীযুক্ত রমাপতি কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত মহতেশম আলী আল্‌কাদেরী, শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামতারন রায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। পাইকোড়ের কয়েকটি প্রবাদ কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। আলী সাহেব বারার বীরেন্দ্র রায়ের প্রবাদ ও পীরগণের নামাবলী আদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। রামপুরহাটের হ্যামটন সাহেবের বিবরণ—নীলরতন বাবুর, এবং কৈলাসানন্দের জীবনী, ঢেকার দক্ষিণগ্রামের ও রাৎমার বহু বিবরণী পণ্ডিত রামতারণ রায়ের নিকট পাইয়াছি। কলহপুরের প্রাচীনতথ্য কালীপদ বাবুর সংগৃহীত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'দি-বেঙ্গল-একাডেমি অব লিটারেচারের' সমস্ত বিবরণ এবং রণ্যাড়ার কাহিনী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমরা ইহাঁদের নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়—কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর জন্য,—বঙ্গবাসীর পুরাতন ফাইল দেখিতে দিয়া—এবং 'বঙ্গভাষার লেখক' হইতে প্রবন্ধ সংকলনের অনুমতি দিয়া আমাদিগকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহার মঙ্গল হউক। শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি,এল মহাশয়—কবি গোবিন্দচন্দ্র ভক্তিভৃঙ্গের এবং রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর—স্বর্গীয় যাদব বাবুর জীবন-কথার বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত তৈলচিত্র হইতে তাঁহার পিতৃব্য রঙ্গলালের ফটো গৃহীত হইয়াছে। বলবন্তনগরের উদয়নারায়ণের প্রবাদ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন হালদার মহাশয়ের সংগৃহীত। ইহাঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

অনুসন্ধানে বাহির হইয়া যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছি,—তাঁহাদের মধ্যে—শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বি, এল, (উকিল, পাকুড়), শ্রীযুক্ত রসিকলাল সিংহ (পাকুড়), শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র গুপ্ত (রেলওয়ে-ওভার্সিয়ার, পাকুড়), শ্রীযুক্ত ইস্‌মাইল চৌধুরী (কোটালপুকুর), শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় (মৌর-পুর), শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ মণ্ডল (ভাঁট্‌রা), শ্রীযুক্ত কিরীটীশ্বর রায়চৌধুরী (ভূতপূর্ব্ব পুলিশ-সাবইন্‌স্পেক্টর, মুরারই), শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সিংহ (কনকপুর),

শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাইকোড়), শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বাজীগ্রাম), শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস হাজরা (নন্‌গড়), শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় (রুদ্রনগর), শ্রীযুক্ত সেখ জেলানী (বিলাসপুর), শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় (নলহাটী), শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত (বারা), শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ভদ্রপুর), শ্রীযুক্ত নলিরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, (রামপুরহাট), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (খরবোনা কাছারী), শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইস্‌-মাইল, (পোষ্টমাষ্টার) মাড়গ্রাম, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দাস কবিরাজ (মাড়গ্রাম), শ্রীযুক্ত লাবণ্যগোপাল মণ্ডল (বিষ্ণুপুর), শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন হালদার (নারায়ণপুর), শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ফতেপুর), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সিংহ (দিনাজপুরের মহারাজের কাছারী, তারাপুর), শ্রীযুক্ত রামতারণ রায় (দক্ষিণ-গ্রাম), শ্রীযুক্ত তারাদাস ঘোষাল (ঘোষগ্রাম), শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষাল (তুরীগ্রাম), শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী (গুড়ে), শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য (তাঁতিবিরল), শ্রীযুক্ত সৈয়দ আব্দুল রব (সেখের-দীঘি) মহাশয়গণের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন অপর যাঁহা-দের নিকট সাহায্য পাইয়াছি, সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পাকুড়ের শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমার সঙ্গে গিয়া,—হস্তীপৃষ্ঠে বৃষ্টিতে ভিজিয়া—বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।

এই খণ্ডে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তরূপে) ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এই অবসরে তাহার সম্পাদক ও স্বত্বাধি-কারীর নিকট—সেজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। মুসলমান-আমলের প্রায় সমস্ত কথাই—তরকাৎ-ই-নাসিরী, রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন্‌, সিয়ার-উলমুতাক্ষরিণ প্রভৃতি হইতে গৃহীত। এসিয়াটিক্‌-সোসাইটির পত্রিকা, অপরাপর সাময়িক পত্রিকা এবং গ্রন্থাবলী হইতেও অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

প্রিয়-সুহৃদ্‌ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম, এ, একটি মুদ্রার এবং পার্সি-সনন্দের পাঠোদ্ধার করাইয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু হেতমপুর-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, বি, এল দণ্ডেশ্বর ও তিলোরায় কয়েকটি মূর্ত্তির ফটো তুলিয়া দিয়া অসময়ে আমাদিগকে

সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কাদায় হাটিয়া—যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছে। বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রয়োজন না থাকিলেও —এস্থলে এই দুইজনের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। অপর অধ্যাপক বন্ধু শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের নিকটও দুই একটি বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

সর্ব্বশেষে বিশ্বকোষ-প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীমান্ হরিচরণ মিত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এই সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মঘটের দিনে—কেবল শ্রীমানের চেষ্টাতেই আমরা এত শীঘ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। হরিচরণ বাবু আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে শ্রীমানের এরূপ কার্য্যদক্ষতা, বিশেষ বিনয়-মধুর-ব্যবহার এবং সেবাপরায়ণতা—একালে একটা ভরসার কথা বলিয়া মনে করি। ভগবান্ তাহার মঙ্গল করুন।

নানাকারণে পুস্তকের মধ্যে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। সম্পাদক অসুস্থ,—সভাপতি অসুস্থ,— আমরা ব্যস্ত হইয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি বই বাহির করিতে গিয়া—বরং উল্টা উৎপত্তি হইল। সুতরাং উপায়ান্তরাভাবে—শেষ-সম্বল সহৃদয়গণের করুণা ভিক্ষা করিয়া—নিবেদনের উপসংহার করিতেছি। ভরসা করি—তাঁহারা আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

বিনয়াবনত নিবেদক

হেতমপুর-রাজবাটী,
বীরভূম।
১লা ফাল্গুন, ১৩২৬

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

ভূমিকা

গত ১৩২৩ সালে বীরভূম-বিবরণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তত্ত্বভূষণ এবং আমাদের সহকারী-সম্পাদক বা বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির একনিষ্ঠ-সাধক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের যত্নে তৎকালে বা তৎপূর্ব্বে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত-পরিচয় উক্ত খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির ১ম বার্ষিক-উৎসবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, বীরলীলার বরক্ষেত্র বীরভূমে আমাদের পুরাতত্ত্ব-আলোচনার যথেষ্ট উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা একত্র সংগৃহীত হইলে কেবল বীরভূম বা রাঢ়দেশ বলিয়া নহে—প্রাচ্য-ভারতের সহিত সমগ্র ভারতের গৌরবকীর্ত্তিভাষিত ইতিহাসের অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু অধ্যায় আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। আমাদের সেই ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয় নাই। এবার তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম-ভারতে-ভেরাঘাট ও করণবেল্-শিলালেখ হইতে আমরা বহুদিন পাইয়াছি, চেদিপতি কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পিত হইত।[1] গৌড়পতি গর্ব্ব ছাড়িয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতেন।[2] শ্রীজ্ঞান অতীশের জীবনী হইতে পাইয়াছি—"পশ্চিম দেশের কর্ণরাজের সহিত মগধাধিপ নয়পালের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। মগধনগরী জয় করিতে না পারিয়া কর্ণরাজের সৈন্যগণ কতকগুলি পবিত্র বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে। অবশেষে নয়পালই জয়লাভ করেন। মগধবাহিনীর হস্তে কর্ণরাজের সৈন্যদল অধিকাংশই বিনষ্ট হয়। কর্ণরাজ সদলে অতীশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতীশের মধ্যস্থতায় উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।"[3] সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতেও দেখিয়াছি—নয়পালপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল "সংগ্রামে কর্ণকে পরাজয় করিয়া আবার তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত

নূতন আবিষ্কার

(১) বঙ্গের-জাতীয়-ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) ঐ ঐ ঐ ১৮৮ পৃষ্ঠা „
(৩) „ „ „ ১৮৫ „ „

পৃথিবীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৪] উক্ত প্রমাণসমূহ হইতে সন্ধান পাইতেছি, প্রথমতঃ গৌড়াধিপ নয়পাল কর্ণদেবের অধীনতা স্বীকার বা আদেশ-পালনে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপুত্র বিগ্রহপালের বীরত্বপ্রভাবে কর্ণদেব পরাজিত ও নিগৃহীত হন, অবশেষে দীপঙ্কর অতীশের মধ্যস্থতায় গৌড়াধিপ ও চেদিপতি মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন, সেই মিত্রতা সুদৃঢ় করিবার জন্য সম্রাট্ কর্ণদেব বিগ্রহপালকে কন্যা সম্প্রদান করেন। কর্ণদেবের গৌড়-সংশ্রব সম্বন্ধে উক্ত সামান্য পরিচয় মাত্র পাইয়াছিলাম। কোথায় উভয় নৃপতিতে সন্ধি হইয়াছিল, চেদিসম্রাট্ কোথায় আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, এখানে তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তির কোন সন্ধান পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই।

সম্রাট কর্ণদেব ও রাজা বিজয়সেনের শিলা-লিপি

গত ১৩২৩ সালের শেষ ভাগে আমাদের সহকারী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু মুরারই হইতেই আমাকে সংবাদ দেন, যে মুরারই হইতে তিন মাইল দূরে তিনি একটী শিলালিপির সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার পত্র পাইয়া স্বচক্ষে সেই শিলা-লিপির দর্শন ও পাঠোদ্ধার করিবার আশায় আমি মুরারই যাত্রা করি। মুরারই হইতে পাইকর বা পাইকোড় গ্রামে গিয়া ভগ্ন প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ সেই প্রাচীন শিলালিপি দর্শন করি এবং সহকারী সম্পাদকের নিকট সেই গ্রামমধ্যে ও পার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থান হইতে অতীত কীর্ত্তির বিশাল নিদর্শনের সন্ধান পাই। প্রস্তর-স্তম্ভে চেদি-পতি কর্ণদেবের নাম ও একটী দেবমূর্ত্তির নিম্নে 'রাজ্যে শ্রীবিজয়সে' লিপি পাইয়া আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হয়। (১০ পৃষ্ঠার চিত্র ও বিবরণ দ্রষ্টব্য) এখানকার অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া আমাদের অনুসন্ধান সমিতির উপদেশক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে সেই নবাবিষ্কারের বিষয় জ্ঞাপন করি। কয়েকমাস পরে ১৩২৪ সালে তিনিও আমাদের সহিত পাইকোড়ের অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে আসেন। সম্রাট্ কর্ণদেব যে এখানে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থানকালে এখানে দেবী-মূর্ত্তি প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও প্রমাণিত হয়। কর্ণদেব একদিন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। সুতরাং এখানে তাঁহার শিলালেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের ইতিহাসের সহিত এই স্থানের সংশ্রব সূচিত হইতেছে। গৌড়াধিপ নয়পালের সহিত সম্রাট্ কর্ণদেবের যেখানে মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল, পাইকোড়ের অদূরে সেইস্থান অদ্যাপি নয়গড় বা ননগড়-মিত্র-

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুর নামে পরিচিত। সম্পাদকীয়-বিবরণী মধ্যে উভয়স্থানের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।[৫] বিবরণীতে নয়গড়ের মহীপাল দীঘি ১ম মহীপালের কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উহা ২য় মহীপালের কীর্ত্তি হইলেও হইতে পারে। আনুষঙ্গিক ঘটনা আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ৩য় বিগ্রহপালের পুত্র পুণ্যচেতা ২য় মহীপাল পিতামহ ও মাতামহের পবিত্র মিলনক্ষেত্রে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্যস্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। রাঢ়ে পালবংশের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে জানা যায় গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের পাটলিপুত্রে এবং তৎপুত্র দেবপাল হইতে নারায়ণপাল পর্য্যন্ত ৪ জনের সময় মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে পালবংশের রাজধানী ছিল। ১ম রাজ্যপাল হইতে ২য় বিগ্রহপাল পর্য্যন্ত (৯২৫—৯৭৫ খৃঃ অঃ) পালবংশের কোথাও নির্দ্দিষ্ট রাজধানীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এ সময় কর্ণাট, লাট, ও চন্দেল্লগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে পালরাজগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা একস্থানে স্থির থাকিতে সমর্থ হন নাই। ২য় বিগ্রহপালের পুত্র ১ম মহীপালই নিজ তেজোবীর্য্যপ্রভাবে প্রণষ্ট পৈতৃক-রাজ্যের উদ্ধার ও নূতন নূতন জনপদ অধিকার করিয়া 'বিলাসপুর' নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে বরেন্দ্রের কোন স্থানে বিলাসপুর থাকিতে পারে।[৬] কিন্তু এখন আমার সেই সন্দেহ দূর হইয়াছে। রাজেন্দ্র-চোড়ের তিরুমলয়-গিরি-লিপিতে ১ম মহীপাল উত্তর-রাঢ়পতি বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন, সুতরাং উত্তর-রাঢ়েই তাঁহার 'বিলাসপুর' রাজধানী বাহির করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে পাইকোড ও নয়গড মিত্রপুরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নিকটই বিলাসপুর বাহির হইয়াছে। এখানে যে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান।[৭] বলা বাহুল্য ১ম মহীপালের তাম্রশাসনগুলি এই **বিলাসপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার** হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল।

বীরভূমে মহীপাল-দীঘী

রাঢ়ে পাল-রাজধানী বিলাসপুর

(৫) বীরনগরকাহিনী, ৯—১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) বঙ্গের-জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা।

(৭) বীরনগর-কাহিনী ১৫পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এখানে বিবরণীমধ্যে বিজয়সেনের মহিষী বিলাস-দেবীর নামানুসারে 'বিলাসপুর' নাম হইয়াছে কিনা সন্দেহ করা হইয়াছে। কিন্তু বিজয়সেনের পূর্ব্ব হইতেই যে 'বিলাসপুর' প্রসিদ্ধ ছিল, নিকটবর্ত্তী ধ্বংসাবশেষ ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ হইতে তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

বীরভূমের এই বিলাসপুর-শাসনকেন্দ্র হইতেই কেবল বীরভূম বা উত্তররাঢ় বলিয়া নহে, এক সময় সমগ্র গৌড়-বঙ্গের ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ১ম মহীপাল (৯৭৫ খৃঃ) হইতে ২য় মহীপালের কনিষ্ঠ ২য় শূরপাল (১০৫৭ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত পালবংশীয় ৫ জন নৃপতি—বীরভূমের এই বিলাসপুর-রাজধানী হইতেই শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। ২য় শূরপালের কনিষ্ঠ গৌড়াধিপ রামপাল—সুদূর উত্তরে বরেন্দ্রীতে গিয়া মহাস্থানের নিকট রামাবতী বা 'রামপুর' নামে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিষ্ঠিত হইবার পর সম্ভবতঃ বিজয়সেন আসিয়া এই পালরাজধানী বিলাসপুর অধিকার করিয়া বসেন। এই বিলাসপুরের পার্শ্ববর্ত্তী পাইকোড় হইতে সেনকুলতিলক বিজয়সেনের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিতে তন্নামযুক্ত লিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

সম্পাদকীয় বিবরণী মধ্যে এ অঞ্চলে সেনরাজবংশের প্রভাবের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু পালবংশের প্রভাবের নিদর্শন এ অঞ্চলে তদপেক্ষা অনেক অধিক, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। পালনৃপতি রাজধানী-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাহার সন্নিকটে কিরূপ দেবকীর্ত্তি ভূষিত করিতেন, রামচরিত হইতে তাহার বিশদ পরিচয় বাহির হইয়াছে। রামপাল অতি উচ্চ শিবমূর্ত্তি, অতি উচ্চ মন্দির সহ দ্বাদশটী সূর্য্যমূর্ত্তি, স্কন্দ ও বিনায়কমূর্ত্তি, চৈদি-প্রাসাদ তুল্য একাদশ রুদ্রের সমুচ্চ মন্দির, সুবিশাল জাগদ্দল মহাবিহার ও তন্মধ্যে অবলোকিশ্বর ও মহত্তারা নামে বহু বৌদ্ধ দেব-দেবীরও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[৮] সেই বিশাল কীর্ত্তিরাজির নিদর্শন যেমন বিলুপ্তপ্রায়, এক্ষণে বিরাট্ ধ্বংসস্তূপে পরিণত।[৯] ১ম মহীপাল ও নয়পালের যত্নে এবং দীপঙ্কর অতীশের অধিষ্ঠানে উক্ত বিলাসপুর-সন্নিহিত বীরভূমের প্রাচীন ক্ষেত্রে রামপালের বহু পূর্ব্বে সেইরূপ বহু কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং রামাবতীর ন্যায় এখানকার সেই বিশাল দেবস্মৃতি লুপ্তপ্রায়। এ অঞ্চলে যাহা কিছু স্মৃতিচিহ্নের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান, তন্মধ্যে বারার অতীত-কীর্ত্তির স্মৃতিনিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন বারায় অধিকাংশই মুসলমানের বাস, হিন্দুর সংখ্যা অতি সামান্য। কিন্তু এই মুসলমানের পল্লী মধ্যে অদ্যাপি অপূর্ব্ব রাঢ়ীয় শিল্পের নিদর্শন বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। মুসলমান প্রাধান্যকালে শত শত দেব-মূর্ত্তি ও দেবকীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলেও এখনও যাহা

(৮) রামচরিত ৩য় সর্গ দ্রষ্টব্য।

(৯) রাজন্যকাণ্ড ২০৩ হইতে ২০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আছে, তাহা নিতান্ত বিস্ময়াবহ। রামপাল রামাবতীনগরী প্রতিষ্ঠাকালে যে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধের উপাস্য দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া উদার রাজনীতি ও দেবভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—অতীত কীর্ত্তির মহাশ্মশান বারাগ্রামে আমরা সেই সেই দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। এই বারাগ্রাম যে এক সময়ে বৌদ্ধ মহাবিহারশোভিত বৌদ্ধ-পীঠ রূপে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিহার বা সঙ্ঘারামবাসী মুণ্ডিতশীর্ষ শ্রমণগণই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণনিগ্রহে বা মুসলমানধর্ম্মপ্রচারকদিগের আশ্রয়ে মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। বারার বনিয়াদী মুসলমানগণ যে গৃহী শ্রমণগণের বংশধর এখানকার অতীত কাহিনী ও অতীত কীর্ত্তির স্মৃতি আলোচনা করিলে সহসা মনে উদয় হইবে। এখানে শৈয়দশাহ মহতেশম আলী সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে কষ্টি-পাথরের এক প্রকাণ্ড চৌকাঠ পড়িয়া রহিয়াছে।[১০] বলা বাহুল্য সেই পাথরের চৌকাঠ এক প্রকাণ্ড দেবমন্দির বা বিহারের ধ্বংসাবশেষ। তাহার গাত্রে যেরূপ লতাপাতা কাটা সূক্ষ্ম ভাস্করশিল্পের পরিচয় রহিয়াছে, তাহা প্রশংসার জিনিস। (৩৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। গ্রাম মধ্যে কষ্টিপাথরের একটি বৃহৎ পাদপীঠ বর্ত্তমান, তাহার উপর এক সময় অষ্টভুজা বজ্রবারাহী অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা হইতেও এখানকার সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন দেব-কীর্ত্তির স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। (৩১নং চিত্র) এইরূপ সামান্য স্মৃতিনিদর্শন ছাড়িয়া দিয়া সপ্তাশ্বরথবাহিত পারিষদসেবিত সূর্য্যমূর্ত্তি, (২৮নং চিত্র) পদ্মাসনে সমাসীন ধ্যানী বুদ্ধ, চতুর্ম্মুখী ও অষ্টভুজা-মূর্ত্তি (৩০নং চিত্র) মহাবোধি, নালন্দা বা বিক্রমশিলা হইতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মূর্ত্তি-গুলির অধরে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় হাস্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহা কেবল চিত্র দেখিলে বুঝা যায় না, মূল মূর্ত্তি না দেখিলে তাহা ধারণায় আসিতে পারে না। এখানে রাঢ়ীয় শিল্পী কেবল মাগধশিল্পের অনুসরণ না করিয়া তাহার উপর স্বর্গীয়জ্যোতির রেখা টানিতে সমর্থ হইয়াছেন! অষ্টভুজা চতুর্ম্মুখী দেবী বৌদ্ধ সাধনমালা-তন্ত্রে বজ্রতারা নামে অভিহিতা। এই দেবীর সাধন যথা—

রাঢ়ে পাল-রাজগণের কীর্ত্তি নিদর্শন

বজ্রতারা

"মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থাং তারাদেবীং বিভাবয়েৎ।
অষ্টভুজাং চতুর্বক্ত্রাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্॥
কনকবর্ণাভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জ্বলাম্।
বিশ্বপদ্মাসনাসীনচন্দ্রাসনসুসংস্থিতাম্।

(১০) বালাবলয়-কাহিনী ৬৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পীতকৃষ্ণসিতরক্তসব্যাবর্ত্তচতুর্ম্মুখাম্।
প্রতিমুখং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রজপর্য্যঙ্কসংস্থিতাম্।
রক্তপ্রভাং চতুর্ব্বুদ্ধমুকুটং ব্রজশর-শঙ্খ-বরদ-দক্ষিণলসৎকরা-
মুৎপলচাপ-বজ্রাঙ্কুশ-ব্রজপাশ সতর্জনী-বামলসৎ করাম্।
—(বজ্রতারাসাধনং)

বারাগ্রামে অদ্যাপি ভুবনেশ্বরী নামে আর একটী দেবী-মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই দেবীকে ভক্তি করেন এবং সময়ে সময়ে আপদ উদ্ধারের জন্য মানসিক করিয়া থাকেন। এই মূর্ত্তিটী এখানকার পূর্ব্বতন বৌদ্ধ-সমাজের প্রধান উপাস্য সিংহবাহিনী আর্য্য তারা-মূর্ত্তি—ইহার শিরোভাগে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, উভয় পার্শ্বস্থ সনাল পদ্মের পার্শ্বে অশোকান্তা মারীচি ও একজটা মূর্ত্তি—এবং সিংহের দুই পার্শ্বে, সনাল পদ্মের উপর অবস্থিতা দেব-দেবীর মূর্ত্তি, মহাদেবী ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় অবস্থিতা। এইরূপ মূর্ত্তি বৌদ্ধতন্ত্রে লোকেশ্বর বুদ্ধের শক্তি বলিয়া পূজিত। এখন এই মূর্ত্তিটী একটী সামান্য মৃণ্ময় কুঠীরে রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এক সময় এখানে যে একটী প্রকাণ্ড দেবালয় বা বিহার ছিল, এখানকার চতুঃপার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধংসাবশেষ হইতে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। পূর্ব্ববর্ণিত বজ্রতারা মূর্ত্তিটী এই ধংশাবশেষের মধ্যে পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য এখানে পূর্ব্বে বহু মূর্ত্তি ছিল তাহা নানা স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ২।১টী অদ্যাপি গ্রামের অপরাংশে বিদ্যমান। তন্মধ্যে মহত্তরী তারা-মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার মুণ্ডটী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে বসাইয়া—ফটো লওয়া হইয়াছে (২৭নং চিত্র) এই মূর্ত্তির মুকুটে অমোঘ-সিদ্ধি নামক ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে, দুইটী হাতে একত্র সংলগ্ন হইয়া ধর্ম্ম-চক্রমুদ্রার পরিচয় দিতেছে। বামহস্তের তাবিচের নিম্নে পদ্ম-নালের অংশমাত্র রহিয়াছে, অপর সকল অংশ গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের সনাল পদ্মের অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহার প্রকৃত পরিচয়ের বাধা জন্মাইয়াছে, কিন্তু মুকুটে অমোঘসিদ্ধি ও বামভাগে সনালেন্দীবরের অংশ থাকায়—এই মূর্ত্তিটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সমাজের আর্য্যতারা বলিয়া গ্রহণ করিতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। উক্ত বারার ধংশাবশেষ হইতে দুই ক্রোশ মধ্যে ভদ্রপুর গ্রামে একটী অতিসুন্দর ভাস্করশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন 'অবলোকিতেশ্বর' মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, [১১] তাহা বারার ধ্বংসা-

আর্য্যতারা

মহত্তরী তারা

অবলোকিতেশ্বর

(১১) বীরভূম-বিবরণ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য।

রশেষ হইতে স্থানান্তরিত মনে হয়। ভদ্রপুরের নিকটবর্ত্তী দেবগ্রামে ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় অবস্থিত পঞ্চধ্যানী বুদ্ধসেবিত সিংহের উপর পদ্মাসনে অবস্থিত বুদ্ধ ভট্টারকের মুর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। (৩৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য) এতদ্ব্যতীত এখানকার 'ঠাকুরুন্-পাহাড়ে' মারীচী বা 'বজ্রবারাহী' মূর্ত্তি (৪৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য) এবং তাহার নিকট সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অদ্যাপি সহজিয়াদিগের আশ্রম ও কএকটী নেড়ানেড়ী দেখা যায়। বলা বাহুল্য উপরোক্ত কীর্ত্তির নিদর্শন হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে বৌদ্ধ পাল-রাজগণের অধিকারকালে এখানে ঐ সকল কীর্ত্তিরাজি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ ভট্টারক

বজ্রবারাহী

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতীশ দীপঙ্করের যত্নে সম্রাট্ কর্ণদেব ও নয়পালের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। সম্রাট্ কর্ণদেব ছিলেন শৈব আর নয়পাল ছিলেন মহা-শাক্ত অতীশ দীপঙ্করের শিষ্য। উভয় নৃপতির মিলন-স্থান নয়গড় মিত্রপুরের পার্শ্ববর্ত্তী বর্ত্তমান পাইকোড় গ্রামে শাক্ত-বৈষ্ণবের—অপূর্ব্ব মিলনের নিদর্শন বাহির হইয়াছে, পাল এবং চেদিরাজের মধ্যে কেবল যে রাজনৈতিক মিলন ঘটিয়াছিল তাহা নহে—ধর্ম্মনৈতিক মিলনও সুসম্পন্ন হইয়াছিল; তাহারই ফলে চেদিরাজ কর্ণদেবের প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ-ক্ষেত্রে আজও মৎস্য-মাংস দিয়া গোপালের ভোগ এবং তুলসী পত্র দিয়া শিবের পূজা হইতেছে।

শৈবশাক্ত বৈষ্ণবের মিলন-স্থান

রাম-চরিতে বিশাল চেদিপ্রাসাদের উল্লেখ আছে। সেই চেদিপ্রাসাদ কোথায় ছিল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামপালের রামাবতী রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাঢ়দেশে বিলাসপুরে পাল-রাজধানী ছিল, এখানেই রামপালের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হয়। এই বিলাসপুরের পার্শ্বেই চেদিসম্রাট্ কর্ণদেবের শিলালেখ ও তাঁহার সময়ের দেব-কীর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই পাইকোর বা ইহার নিকট-বর্ত্তী কোন স্থানে চেদিসম্রাটের বাসযোগ্য বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রসিদ্ধি সমস্ত গৌড়বঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। রামপাল রামাবতী রাজধানীতে সেই চেদি-প্রাসাদের অনুকরণে সুবৃহৎ সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এক্ষণে যেমন তাহার কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, চেদি-প্রাসাদেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকিবে। তবে পাইকোড় বা ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি উত্তোলিত করিয়া—উপযুক্ত আলোচনা করিবার অবসর ঘটিলে রাঢ়-দেশের এই প্রান্তে সেই বিশাল 'প্রাসাদ' চেদি-বাস্তব্যের ধ্বংসা-বশেষ বাহির হইলেও হইতে পারে।

চেদিপ্রাসাদ

পূর্ব্বোক্ত পাইকোড়ের বুড়াশিবের মন্দিরে একটী ভগ্ন বাসুদেব-মূর্ত্তির পাদ-পীঠে "পণ্ডিত শ্রীবিশ্বরূপস্য" এইরূপ শিলালেখ উৎকীর্ণ আছে।[১২] এই লিপির অক্ষরের সহিত চেদি-পতি কর্ণদেব ও রাজা বিজয়সেনের শিলালিপির সাদৃশ্য আছে। এরূপ স্থলে পণ্ডিত বিশ্বরূপকেও ঐ সময়ের লোক বলিতে পারি। পাল-রাজ নয়পাল ও তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপালের সময় এক বিশ্বরূপ কর্তৃক গয়ায় নৃসিংহ-মূর্ত্তি ও বিষ্ণুমন্দিরপ্রতিষ্ঠার সন্ধান পাই।[১৩] আবার ঐ সময়ে উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র এবং বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মার শান্ত্যা-গারাধিকারী রামদেবের পিতা বিশ্বরূপের নাম পাই।[১৪] পাইকোড়ের বিশ্বরূপ এই দুইজনের একতম হইতে পারেন।

পণ্ডিত বিশ্বরূপ

পাইকোড়ের বুড়া-শিবতলায়—আর একটি চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সাধারণে তাহাকে চতুর্ভুজা বলিয়া পূজা করে। মূর্ত্তিটি হইতেছেন চতুর্ভুজ লোকে-শ্বর। (৫ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য) এক সময় এই লোকেশ্বর-মূর্ত্তির পূজা কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, সুদূর মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ সমাজে এই দেবমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল। মূর্ত্তিটির দক্ষিণ ও বাম দিকের দুইটি হস্ত তারা ও ভৃকুটি-মূর্ত্তির মস্তক স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। অপর দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা ও বামহস্তে শঙ্খ শোভা পাইতেছে। হিন্দু-বৌদ্ধের মিলন-ক্ষেত্রে এরূপ অনুসন্ধান করিলে আরো বহু বৌদ্ধ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। পাইকোড়ের ন্যায় লাভপুরের নিকটও হিন্দু-বৌদ্ধ-মিলনের স্মৃতি-নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। এই স্থানে অট্টহাস বা ফুল্লরা-পীঠ বলিয়া বীরভূমবাসীর নিকট পরিচিত। আমরা বর্দ্ধমান জেলায় এক অট্টহাস পীঠের সন্ধান পাইয়াছি, তথা হইতে রাঢ়ীয় শিল্প-নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন এক চামুণ্ডা বা কঙ্কালিনী-মূর্ত্তি আবি-ষ্কৃত হইয়াছে।[১৫] এক সময়ে হিন্দু-বৌদ্ধ সকলেই এইরূপ চতুর্ব্বিংশ প্রকার কঙ্কালিনী-মূর্ত্তির পূজা করিত। এই দেবী-মূর্ত্তির মুখের হাসি দেখিলেই অট্টহাস শব্দের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। এই অট্টহাস্যযুক্তা দেবী-মূর্ত্তির অধিষ্ঠানে যেরূপে বর্দ্ধমানে অট্টহাস-পীঠের নামকরণ হইয়াছিল, বীরভূমেও সুপ্রসিদ্ধ ফুল্লরা-পীঠের নিকট এইরূপ মূর্ত্তির অধিষ্ঠান হেতু তাহারও অট্টহাস

চতুর্ভুজ লোকেশ্বর মূর্ত্তি

(১২) বীরনগর-কাহিনী ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) রাজন্যকাণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, ১৩৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪) রাজন্যকাণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৫) এই মূর্ত্তিটি আনিয়া আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় প্রদান করিয়াছি।

নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। লাভপুরের পুণ্যতীর্থ ফুল্লরা-পীঠে যে সুবিশাল ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সমস্ত স্তূপের উপযুক্ত উদ্ধার না হইলে এখানকার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি,—বর্দ্ধমানের অট্টহাসে যেমন চব্বিশটি কঙ্কালিনীর মধ্যে একটি মূর্ত্তি বাহির হইয়াছেন, সেইরূপ লাভপুরের নিকট ঝলকাগ্রামেও আমরা আর একটি দশভুজা কঙ্কালিনী-মূর্ত্তির সন্ধান করিয়াছি। এই মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার মস্তকের উপর বোধিদ্রুম ও দুই পার্শ্বে দুইটি ধর্ম্মচক্র এবং পাদদেশের উভয় পার্শ্বে দুইটি ধর্ম্মচক্র শোভা পাইতেছে। (৫২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) বোধিদ্রুম ও ধর্ম্মচক্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে—যে হিন্দু-শাক্তের চামুণ্ডাকে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান চিহ্ন ভূষিত করিয়া পূজা করিতেন। এই মূর্ত্তি হইতে এখানে বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি-নিদর্শন বাহির হইতেছে। মূর্ত্তিটির পাদদেশের নিম্নাংশ সমুদয় ভগ্ন হওয়ায় পাদপীঠ কিরূপ ছিল বুঝিতে পারা যায় নাই। এইরূপ বোধিদ্রুম ও ধর্ম্মচক্রহীন আর একটি অষ্টভুজ-মূর্ত্তি অজয়তীরবর্ত্তী দণ্ডেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।(৮৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) এই উভয় প্রকার মূর্ত্তি হইতে আমরা, একই মূর্ত্তি হিন্দু ও বৌদ্ধসমাজে কি ভাবে পূজিত হইত তাহারই আভাস পাইতেছি। শক্তি পূজার লীলা-স্থলী বীরভূমে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ বহুতর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি দেবীমূর্ত্তির সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই মূর্ত্তিটি অদ্যাপিও তিলোরায় গঙ্গামূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইতেছেন। (৩৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) এই মূর্ত্তিটির পরিচয় বারা-কাহিনীর মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। এই দণ্ডায়-মানা দেবীমূর্ত্তির শিরোমুকুটে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ থাকায়—ইহাকেও বৌদ্ধ সমাজের পূজিতা দেবীমূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না।

কঙ্কালিনী

তিলোরায় বৌদ্ধদেবী

একদিকে যেমন বর্ত্তমান অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে আমরা বৌদ্ধকীর্ত্তির প্রভূত স্মৃতি-নিদর্শনের সন্ধান পাইয়াছি, অপর দিকে সেইরূপ সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব-প্রভাবের প্রভূত নিদর্শন বাহির হইয়াছে। বিবরণী মধ্যে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে ঢেকা অঞ্চলের প্রস্তর-কীর্ত্তি-নিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। রাঢ়ীয় শিল্পিগণ বৌদ্ধ কীর্ত্তিসমূহে যেরূপ নিপুণ ভাস্কর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ণব প্রভাবোদ্দীপ্ত কীর্ত্তিনিদর্শনেও সেইরূপ দিব্য জ্যোতিঃ বিকশিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

বর্ত্তমান বিবরণী মধ্যে বীরভূম অঞ্চলে ভারতের নানাস্থান হইতে নানা জাতির আগমন বা বিজয়যাত্রার কথা বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল নানা

বৈদেশিক সংশ্রবে সাধারণের অজ্ঞাত-পূর্ব্ব-বহু জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে এক্ষণে আমরা পুষ্পনাপিত, কুড়োল, মেহানা, মাড়ব, ভল্লা প্রভৃতি জাতির সন্ধান পাইতেছি। যেমন নানা জাতি তেমনি নানা রাজবংশের সন্ধান বাহির হইতেছে। কেবল পাল বা সেনবংশ বলিয়া নহে, নল, মৌর্য্য, মান, মল্ল প্রভৃতি রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপের সন্ধান পাইতেছি। তাহা বিবরণী মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য হইতে কর্ণাট, চোল, চেদি প্রভৃতি বংশ কিছুদিনের জন্ম এখানে আসিয়া অধিষ্ঠিত ইহয়াছিলেন। কর্ণাট, লাট, চোল প্রভৃতির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে নল ও মৌর্য্যবংশের আধিপত্যের যথেষ্ট পরিচয় বাহির হইয়াছে। কর্ণাট বা চেদি-বংশের ন্যায় ঐ সকল রাজবংশ কিছুদিন বীরভূমে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার লোকপ্রসিদ্ধি বা কিম্বদন্তী এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। নল-রাজবংশের কথা বিবরণী মধ্যে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি মনে করি মৌর্য্যবংশের অধিষ্ঠান হেতুই মৌড়েশ্বর বা মৌড়পুরের নামকরণ হইয়াছিল।

বীরভূমে শরাক জাতি

জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে এখানে শরাক-জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। (১৬) জৈন বৌদ্ধের মিলনের ন্যায় এখানে পূর্ব্ব হইতে হিন্দু মুসলমানেরও মিলন ঘটিয়াছে। তাই বীরভূমের মাণ্ডব্যেশ্বর শিব ও মন্দির গাজির সমাধিতে পরিণত হইয়া আজিও হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির নিকট পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বীরভূম শক্তিপূজার একটি প্রধান কেন্দ্র। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় হইতেই তারাদেবী প্রায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের উপাস্যা দেবতারূপেই পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। তাই বহুশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই বীরভূম তারাভক্ত-গণের অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। বীরভূম-বিবরণীতে এই তারামায়ের অনেক কথাই বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এমন কি প্রভু নিত্যানন্দের বিবরণীতেও আপনারা শাক্ত-প্রভাবের নিদর্শন পাইবেন।

বীরভূমে মল্ল সংশ্রব

মল্লারপুর-প্রসঙ্গে মন্দির-গাত্রে যে উৎকীর্ণ লিপির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে "১১২৪ শকাব্দা" পাওয়া যায়। এই লিপির অক্ষর-বিন্যাস আলোচনা করিলে সর্ব্বজনপরিচিত শকাব্দার লিপির অক্ষর বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যায় না। ঐ শকাব্দাকে আমি "মল্লশক" বলিয়াই মনে করি, এবং একসময় এ অঞ্চলে যে মল্লবংশের আগমন ঘটিয়াছিল, ঐ লিপিকে তাহার স্মৃতি-নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

(১৬) বীরভূম-বিবরণ, ২য় খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

প্রবলপরাক্রান্ত নানা রাজবংশের অধিষ্ঠানে,—তাঁহাদের আশ্রয়ে যেমন ভাস্কর্য্যের উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ এক সময়ে এখানে যে, সুকুমার শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহারও নিদর্শন মিলিয়াছে। সম্পাদকীয় বিবরণী মধ্যে বিষ্ণুপুরে রেশমের ও নারায়ণপুরে লৌহের কারবারের পরিচয়দান প্রসঙ্গে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এবার সম্পাদক মহারাজকুমারের বিশেষ উৎসাহে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে এবং অনুসন্ধান-সমিতির দক্ষিণহস্তস্বরূপ সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের অদম্য আয়াসে অনুসন্ধান-কার্য্যে আমরা যে আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছি, তজ্জন্য উভয়কে অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ভগবানের নিকট একান্ত প্রার্থনা—সুখ-স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া উভয়ে মাতৃভূমির অতীত কীর্ত্তির উদ্ধারে কায়মনোপ্রাণে যত্নবান্ হউন। এই সঙ্গে বীরভূমবাসীর প্রতি ও একান্ত অনুরোধ—রাঢ়ের অতীত কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য আমাদের সহায় হউন।

বিশ্বকোষ-কুটীর
শিবচতুর্দ্দশী, ১৩২৬

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি—বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি

বীরভুম-বিবরণ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

বীরনগর-কাহিনী

বীরভূম জেলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপলাইনের মুরারই ষ্টেশন হইতে প্রায় আট মাইল উত্তরে এবং রাজগাঁ ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি মাইল পশ্চিমে "বীরনগর" নামে একটী স্থান, পরিখা প্রাকার ও বিপুলায়তন নিকেতন-নিচয়ের ধ্বংসাবশেষ লইয়া পতিত রহিয়াছে। বীরনগরের পশ্চিমোত্তর কোণে "রাজবাড়ী" নামে অপর একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান আছে। বীরনগর এবং রাজবাড়ী এই উভয় স্থানেই, ছুইটী ক্ষুদ্র পল্লীতে এখন কয়েক ঘর সাঁওতাল, বাগ্‌দি প্রভৃতি জাতি বাস করিতেছে। বীরনগর ও রাজবাড়ীতে ছোট বড় পুষ্করিণীর সংখ্যা প্রায় তিনশত হইবে। রাজবাড়ীর উত্তরে এক বিশাল প্রাচীরের কিয়দংশ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। বীরনগর ও রাজবাড়ীর পশ্চিমস্থিত জঙ্গলময় ভূভাগের নাতিদূরেই সাঁওতাল-পরগণার (ধরণী) পাহাড় শ্রেণী। দক্ষিণে দূরবিস্তৃত নিম্ন জলা-ভূমি। দক্ষিণের কিয়দংশে ও পূর্ব্বে সীতাপাহাড়ী চন্দ্রপাহাড়ী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, স্বচ্ছন্দ-বনজাত তরুলতায় পরিপূর্ণ। সীতাপাহাড়ীতে "যোগীগুফা" নামে একটী পুষ্করিণী ও ছুইটী গুহা আছে। মাটির নীচে গুহা, সুন্দর পাথরের খিলানে উপরিভাগ আচ্ছাদিত ছিল। ছুইটী গুহার মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। নাম শুনিয়া মনে হয় গুহা ছুইটী কোনো যোগীর সাধনার স্থান ছিল। প্রবাদ আছে, বনবাস কালে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। স্থানটির প্রাচীনত্ব-খ্যাপনের জন্যই হয়তো এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। (১)

বীরনগর-পরিচয়

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী সম্বন্ধে প্রবাদ

(১) বীরনগরের প্রায় আট মাইল দূরে, রাজগাঁ ষ্টেশনের উত্তরপূর্ব্বে সীতাপাহাড়ী নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামে মুসলমান, রাজবংশী, তিওর প্রভৃতি জাতির বাস। গ্রামের

রাজগাঁয়ের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে রাজারামপুর গ্রাম। তাহার নিকটেই চিতারা ও তিলুরাণী এবং এক মাইল উত্তরপূর্ব্বে রাজনপুর গ্রাম। রাজগাঁয়ের দুই মাইল দক্ষিণে ভদ্রকালী ও ভাঁটরা গ্রাম। বীর-নগর সম্বন্ধে প্রবাদ,—তথায় "বীরসেন" নামে এক রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান "রাজবাড়ী" নামক স্থানে তাঁহার রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। চন্দ্রপাহাড়ীর নিকটে চন্দ্রপাড়া একটী ক্ষুদ্র পল্লী; তথায় বীরসেন-বংশীয় চন্দ্রসেন, এবং ভাঁটরা ও ভদ্রকালীতে ভদ্রসেন রাজা বাস করিতেন। রাজনপুর, রাজগাঁ প্রভৃতি স্থানে উক্ত রাজবংশীয়গণেরই বাস ছিল। রাজারামপুর ও তিলু-রাণীতেও কোন রাজা এবং রাণী বাস করিতেন।

বীরনগরের উপকণ্ঠ ও সেনরাজবংশ

ভদ্রকালীতে "অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী দেবী" প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। মূর্ত্তিটি প্রায় তিন হস্ত উচ্চ, দুই হস্ত বিস্তৃত, একখানি কৃষ্ণ পাষাণখণ্ড ক্ষোদিত করিয়া নির্ম্মিত; মূর্ত্তির অনেকাংশ অত্যাচারীর অত্যাচারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। (২) পুরাতন মন্দিরের ভগ্ন স্তূপের অদূরেই একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের নিকটে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্ত্তমান, মন্দি-রের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তর এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণের কতকাংশের নাম "ধনগাড়া" (এই নাম "ধনাগারের" অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়।) কৃষকগণের মুখে শুনিয়াছি, হলচালনার সময় অনেকেই তথা হইতে অর্থপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথায় মাটীর নীচে বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে,

নিকটেই একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ে পাথরের চুল্লি (উনান) আছে। প্রবাদ সীতা তথায় রন্ধন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত যে প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া তিনি ক্রীড়া করিতেন, তাহাতে চিহ্ন আছে। ভাতের ফেন (মাড়) গালিয়া ফেলিতেন যেখানে, সেখানে একটি নালা হইয়া গিয়াছিল। আজিও সে "নালা" রহিয়াছে। একটি কাকে সীতার উপর অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া রামচন্দ্র তাহাকে পাথরে টানিয়া হিঁচড়াইয়া শাস্তি দিয়াছিলেন। পাথরে কাকের পদচিহ্ন ও ডানা আঁচড়ের দাগ এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। সীতাপাহাড়ীর নিকট দিয়া পূর্ব্বে গঙ্গা স্রোত বহতা ছিল। গ্রামের পূর্ব্বে একটি বহু বিস্তৃত বিল আছে, লোকে বলে গঙ্গা মজিয়া ঐ বিল হইয়াছে। বিলের নাম এখন তপসী বা তপস্বী বিল।

নলহাটীর পাহাড়ে পার্ব্বতী মাতার মন্দিরের কিছু দূরে একটি প্রস্তরখণ্ডে দুইটি পদচিহ্ন আছে। সীতাদেবীর পদচিহ্ন বলিয়া এখনও লোকে তাহার পূজা করে। সুতরাং সীতাদেবীর সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহু প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিজড়িত বহু চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) এই ভদ্রকালীদেবীর এখনও পূজা হয়। দেবীর নামে অনেক সম্পত্তি আছে শুনিয়াছি। এই স্থান এখন নসীপুরের রাজাবাহাদুরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

ভাঁটরা গ্রামের—ভদ্রকালী

বীরভূম-বিবরণ ২য় পৃষ্ঠা

মৌড়াপুর গ্রামের—হরগৌরি---যুগল মূর্ত্তি

জানিতে পারা যায়। মন্দিরের নিকটে কয়েকটা পুরাতন পাথরের চৌকাঠ প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। বীরনগরের দক্ষিণস্থিত নিকটবর্ত্তী মথুরাপুর বা মহুরাপুরে একটি হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটির পূজা হয় না। ছোট মূর্ত্তি বটে, কিন্তু দেখিয়া বহু পুরাতন বলিয়াই মনে হয়।

ভাদীশ্বর গ্রাম হরগৌরী ও

মুরারই ষ্টেশনের পূর্ব্বে নিকটেই "ভাদীশ্বর গ্রাম"। সাধু ভাষায় ভদ্রেশ্বর বলে। এই গ্রামের উত্তরে এক পরিখা পরিবেষ্টিত অনতিবৃহৎ ইষ্টক-স্তূপ, দেখাইয়া লোকে তাহাকে ভদ্রসেন রাজার দেবালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে হরগৌরীর একটী সুন্দর যুগল মূর্ত্তি ও একটি মনসামূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরগৌরী মূর্ত্তি প্রায় দুই হস্ত উচ্চ, অনেকাংশ খণ্ডিত হইলেও মূর্ত্তির নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনসা মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত ছোট, সর্পসপ্তকের ফণাচ্ছত্রতলে বসিয়া, বাম-হস্তে একটি সর্পকে ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত জানুস্পৃষ্ট মুদ্রায় দক্ষিণজানুর উপর উত্তান ভাবে ন্যস্ত রাখিয়া, দেবী পদ্মদলের উপরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই গ্রামে একটি শিলালিপির ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে; লিপি প্রস্তরের উপরে কোনো মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, এবং লিপি প্রস্তরে (কার্ণিসে) সংলগ্ন ঝালরের অংশবিশেষ দেখিয়া মনে হয় নিম্নভাগেও যেন একটা কোনো কিছু ছিল। প্রস্তরখণ্ডে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীহরিদেবানাম্"।

একটি শিলা-লিপির একাংশ

এই গ্রামে এখন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতি লইয়া সামান্য কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস। মুরারইয়ে রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপিত হওয়ায় কতকগুলি পশ্চিমা বণিক্ ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে বাস করিতেছে। এখানে প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—"বীরনগরের সেনরাজগণ গঙ্গাস্নানাদিতে যাতায়াত পথে, অথবা কোনো যুদ্ধবিগ্রহাদির পর প্রত্যাবর্ত্তন পথে মধ্যে মধ্যে ভাদীশ্বরে বিশ্রাম করিয়া যাইতেন। একবার কোনো সেন-নরপতি তাহার মন্ত্রীর কোনো গুরুতর অপরাধে মন্ত্রীকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিছু দিন পরে রাজা উড়িষ্যাবিজয়ে গমন করিলে,—গোপনে সংবাদ লইয়া, মন্ত্রী সামান্য সৈনিকের ছদ্মবেশে যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর সহিত রাজার প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য রাজা তাঁহাকে মন্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। যুদ্ধ বিজয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভাদীশ্বরে আসিয়া আম্রসংযুক্ত কোনো প্রিয় আহার্য্যের আয়োজন দেখিয়া, রাজা

ভাদীশ্বরে বীর-নগরের সেননর-পতি ও তাঁহার মন্ত্রির সম্বন্ধে প্রবাদ

আশ্চর্য্যান্বিত হন, এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারেন, যে এক সৈনিক অগ্রে আসিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। পরিচয়ে বুঝিতে পারেন, এ সেই উড়িষ্যা-বিজয়ের সৈনিক। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে রাজধানী বীরনগরের পূর্ব্বসীমান্ত দুর্গ প্রাচীকোটের কর্ত্তৃত্ব প্রদানে পুরস্কৃত করেন। যে বৃক্ষবাটিকা হইতে রাজার প্রিয় আহার্য্যের উপকরণ আম্র সংগৃহীত হইয়াছিল, সৈনিক তাহাও দানপ্রাপ্ত হন। প্রাচীকোটের পশ্চিমস্থিত পাগলা নদীর তীরে সেই বৃক্ষবাটিকা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সে কালের প্রাচীন বৃক্ষাদি নাই, শুধু নাম আছে—"মহাবলের (পাইকোড়ের চলিত কথায় মহাবুল্লার) বাগান"। প্রাচীকোটে গিয়া সৈনিক পুরাতন দুর্গের নিকট একটি নূতন দুর্গ স্থাপন করেন। সেই অবধি প্রাচীকোটের নাম হইয়াছে "পাইকের (সৈনিকের) কোট" অপভ্রংশে "পাইকোড়", বীরনগরপতি সৈনিকের পূর্ব্ব পরিচয় অবগত হইয়া, তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, পুনরায় সাদরে তাঁহাকে মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

প্রাচীকোটের পাইকোড় নামের ব্যুৎপত্তি

ভাদীশ্বরের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে প্রাচীকোট বা 'পাইকোড়' গ্রাম। এই গ্রামে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সৎগোপ বেণে (গন্ধ-বণিক্) নাপিত, কুম্ভকার, কামার, মোদক, তাঁতি, পোদ্দার, তিওর, রাজবংশী, যুগী, মাল, বাগ্দী, কুড়োল, কৈবর্ত্ত, হাড়ি, ডোম, মুচি প্রভৃতি প্রায় পাঁচশত ঘর হিন্দু এবং প্রায় তিনশত ঘর মুসলমানের বাস। গ্রামে কায়স্থের বাস নাই। এই সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে, একজন ব্রাহ্মণ, একজন বৈদ্য এবং একজন কায়স্থ তিন বন্ধু মিলিয়া ইষ্ট সাধনার উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে গমন করেন। তিনজনেই পূর্ণকাম হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু কায়স্থ আসিয়া গ্রামের আপামর সাধারণকে সাধন রহস্যের কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ায়, গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী "ক্ষ্যাপা কালী" তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। সেই অবধি কায়স্থ কেহ গ্রামে বাস করিতে পান না"। এই গ্রামে চারিটি শিলালিপি এবং অনেকগুলি প্রাচীন (প্রস্তরনির্ম্মিত) দেবমূর্ত্তি আছে। গ্রামের (বাহিরে) পশ্চিমে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী জয়দুর্গা দেবী আজিও পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন। গ্রামের 'নারায়ণচত্বর' নামক পুষ্করিণী-তীরে (ঘাটের বাম দিকে) একটি ইষ্টকবেদীতে দুইটি শিলালিপি, একটি অষ্টা-দশভূজা ভগ্ন দেবীমূর্ত্তি, একটি ভগ্ন নরসিংহ মূর্ত্তি, এবং আরো দুই একটি ভগ্ন মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। বুড়া শিবতলা নামক আর একটি দেবস্থানে একটি মন্দিরে

পাইকোড়ের পরিচয়

কায়স্থ-হীন পাইকোড়

পাইকোড়ে দেবমূর্ত্তি ও শিলালিপি

ভাদীশ্বর গ্রামে প্রাপ্ত—হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি
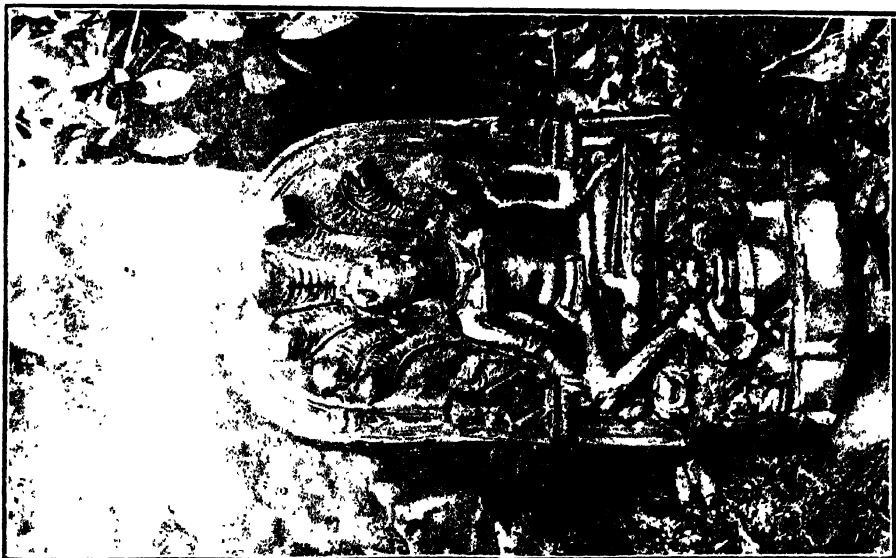
ভাদীশ্বর গ্রামে প্রাপ্ত—মনসা মূর্ত্তি

দুইটি শিলালিপি এবং বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। পাইকোড়ে "তুলসীমঞ্জরী" দিয়া শিবের পূজা হয়। গ্রামে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এক ধাতুনির্ম্মিত বালগোপাল মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার ভোগ হয় মৎস্য মাংস দিয়া। সরস্বতীপূজার (শ্রীপঞ্চমীর) পূর্ব্ব দিন "বাণব্রতের" অনুষ্ঠান, পাই-কোড়ে একটি প্রধান উৎসব। এই উপলক্ষে তথায় একটী বৃহৎ মেলা বসে। মেলায় বহুলোক সমবেত হইয়া থাকে। বাণব্রত উপলক্ষ্যে বুড়া শিব ও ক্ষ্যাপাকালীর পূজা খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়। বহু নরনারী পূজা দেয়। আমরা সংক্ষেপে এই বাণ-ব্রতের বিবরণ বিবৃত করিতেছি—(৩)

তুলসীমঞ্জরী পূজিত শিবলিঙ্গ ও মৎস্য-মাংস-ভোজী গোপাল

পাইকোড়ে বাণব্রত

"দেয়াশী এবং বালা (বোধ হয় নূতন) ভক্তকে শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বের অমা-বস্যায় ক্ষৌরকার্য্যান্তে শুচি হইতে হয়। ঐ দিন হবিষ্যান্ন ভোজনবিধি। প্রতিপদ্ হইতে শ্রীপঞ্চমীর দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ ফল মূলাদি আহার করিয়া থাকিতে হয়। ষষ্ঠীর দিন উপবাস এবং ব্রতকথাশ্রবণ। সপ্তমীর দিন পারণা। দেয়াশী ও বালা ভক্ত ভিন্ন অপর ভক্তগণ ২য়া, ৩য়া বা চতুর্থীতে কিংবা শ্রীপঞ্চমীর দিনেও ক্ষৌর করিয়া ভক্ত হইতে পারে। চতুর্থীর দিন শ্মশানে গিয়া একটি নরমুণ্ডের কঙ্কাল কুড়াইয়া আনিয়া তাহাতে তৈলসিন্দুর লেপন করিতে হয়। পরে একজন ভক্ত সেই সিন্দুরাক্ত নরশিরকঙ্কাল একহস্তে ও একটি বেল (ফল) অপর হস্তে লইয়া অপর তিন জন ভক্তের সহিত নৃত্য করে। শ্রীপঞ্চ-মীর দিন পূর্ব্বাহ্নে শিবের অভিষেক এবং হোম হইবে। এই দিন সমস্ত ভক্ত-কেই পুনরায় ক্ষৌর হইতে হয়। বৈকালে ভক্তগণ নদীস্নান করিতে যায়। যাইবার সময় সমস্ত ভক্ত শিবমন্দিরের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইবে। 'পাণ্ডা' মন্দিরের পৈঁঠায় দাঁড়াইয়া বেত্র ঘুরাইয়া "বার্ গাছে নারিকেল" মন্ত্র পাঠ করাইবেন। তৎপরে "দণ্ডবতী" পাঠ করিয়া শিবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভক্তগণ আঙ্গিনা হইতে বাহির হইবে। নদীতে যাইবার পথে গ্রামের উত্তরে এক অশ্বত্থমূলে অধিষ্ঠিতা হাটগাছার কালীকে "দণ্ডবতী" পাঠপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইবে। পাণ্ডা "ঘাট ঘাট মহাঘাট" মন্ত্র পাঠ করাইবেন। অতঃপর ভক্তগণ স্নান করিবে। স্নানের পর তাহারা নদীর অপর পারে চলিয়া গেলে, পাণ্ডা ঘাটে (এ পারে) দাঁড়াইয়া "বল মন

বাণব্রতের বিবরণ

(৩) পাইকোড় গ্রামের বুড়াশিবের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ পাণ্ডা মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট ব্রতের এই অনুষ্ঠানকাহিনী আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

হরিবোল, হরি বল ভকত ভাই, নেচে গেয়ে ঘর যাই” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। অমনি ও পার হইতে ভক্তগণ দলে দলে এপারে আসিয়া দাঁড়াইবে। পাণ্ডা তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে “দেবকুঁড়া” নামক ভাণ্ড হইতে (হোমশেষের শান্তিজল) শান্তিজল লইয়া ছিটাইয়া দিবেন। জল ছিটাইয়া দিবামাত্র ভক্তগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবে। ছুটিতে ছুটিতে কেহ পথে, কেহ শিবমন্দিরের আঙ্গিনায় গিয়া পড়িবে। অনেকে অচৈতন্য হইয়া যাইবে। তখন ঐ দেবকুঁড়ার জল দিয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরে সকলে একত্র হইয়া হোমশেষ ভস্ম-তিলক গ্রহণ করিবে। রাত্রে পুষ্করিণীর ঘাটে “খিচুড়ি” পাক করিয়া “মাছ পোড়াইয়া” সেই সমস্ত উপকরণে শিবের ভোগ দিতে হয়। ষষ্ঠীর দিন উপবাস। পূর্ব্বাহ্নে পাণ্ডা সমস্ত ভক্তকে এক একটি তুলসীমঞ্জরী মন্ত্রপূত করিয়া দেন, ভক্তগণ তাহা কটীদেশে বাঁধিয়া রাখে। ইহার নাম ‘“কাচবন্ধন” (কাছা বন্ধন ?) পরে অঞ্চলে আতপ তণ্ডুল ও তুলসী মঞ্জরী লইয়া “দণ্ডবতী” পাঠের পর শিবকে দণ্ডবৎ করিয়া নদীতে গিয়া ভক্তগণ পূর্ব্বদিনের মত মন্ত্রপাঠ ও স্নান করিবে। স্নানান্তে গদাধর নামক শিবকে নদী হইতে (এই শিব সংবৎসর নদীর জলেই অবস্থিতি করেন) তুলিয়া তাঁহার মাথায় আতপ তণ্ডুল ও তুলসী দিয়া পূজা করিবে। পরে বালা ভক্তের জিহ্বায় “বাণ ফুড়িয়া” দিলে, সে (“কলার ভেলার” সঙ্গে গাঁথা) একত্র তিনটি খাঁড়ার উপর চড়িয়া, ভক্তদের স্কন্ধে প্রায় আধ মাইল পথ ঘুরিয়া, ক্ষ্যাপাকালীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিবে। তথায় পাঁচালী পাঠ শুনিয়া—সমস্ত ভক্ত পাণ্ডার বাড়ীতে আসিয়া (পাণ্ডা-বাড়ীর) কোনো স্ত্রীলোকের নিকট ষষ্ঠীর কথা শুনিবে। সপ্তমীর দিন “পারণা” করিতে হয়। সাধারণের কৌতুহল নিবারণজন্য নিম্নে বাণব্রতের পাঁচালী আদি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (৪)

বাণব্রতের বিবরণ

মাঘী ষষ্ঠীর ব্রতের পাঁচালী ও কাচবন্ধ আদি।

বাণব্রতের পাঁচালী

১। কাচবন্ধ। জলে আনি জলেবন্ধ, জলের জলতি বন্ধ, এক বন্ধ নয় দুয়ার, অমুকের (ভক্তের নাম করিতে হয়) দশ দুয়ার। মোর বলে আস্থা রাখে, মহাদেবের আজ্ঞায় লাগে বজ্র কপাট।

(৪) শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ পাণ্ডা ও শ্রীযুক্ত কুলেশ পাণ্ডার প্রদত্ত মূল পুঁথি হইতে সংগৃহীত।
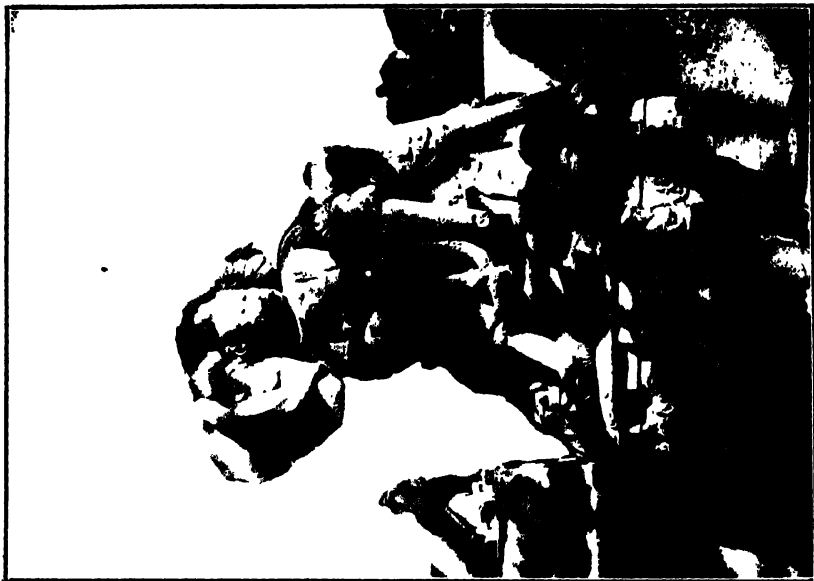
পাইকোড় গ্রামে প্রাপ্ত—নরসিংহ মূ

পাইকোড় গ্রামের—জয় দুর্গাদেবী

২। দণ্ডবতী। আদি বন্দ অনাদি বন্দ মূল ধর্ম্মের পাট।
ত্রিশ কোটী দেবতা বন্দ বৃদ্ধ মা বাপ॥
ডাইনে দামোদর বন্দ বামে হনুমান।
শিরে তুলি বন্দি গোসাঞী জাজ্বল্যমান॥
আকাশে চণ্ডিকা বন্দ পাতালে বাসুকী নাথ।
আপন আপন গুরুর চরণে দ্বাদশ প্রণাম॥

৩। বেত ঘুরাইবার মন্ত্র।
বার গাছে নারিকেল তের গাছে তাল।
তাহাতে উপজিল আন গিয়ে শাল॥
হনুমান আন্‌লে লাঠী, বিশ্বকর্ম্মা দিলে দড়ি।
লাঠির উদ্দেশে গেল মহিমান গিরি॥
লাঠির এইখানে কাটি।
উদয়গিরি পর্ব্বতে উপজিল লাঠি॥
আগে ধরে ব্রহ্মা পাছে ধরে শিব।
যেখানে বালাভক্ত ধরে লাঠির সেই খানে জীব॥

বাণব্রতের পাঁচালী

৪। ঘাটশুদ্ধি।
ঘাট ঘাট মহাঘাট, সোণা আর রূপোর পাট।
হনুমান সৃজিলে ঘাট, সিঞ্চিলে পঞ্চম পানী, (জল)
ব্রত কর এসো এয়ো' রাণী।
জলকুম্ভীর, সপ্ত সাগর, আজিকার ষষ্ঠীর চারি প্রহর রাত।
চারি প্রহর দিন না করে ব্রত।
শুদ্ধ গঙ্গাজলে করিয়ে প্রহর, আমিষ পানী (জল) নিরামিষ হউক
সুখে বালাভক্ত প্রহর করুক।

৫। পাঁচালী। এস হে কার্ত্তিক তাম্বুল খাও।
মাঘী ষষ্ঠীর ব্রত ক'রে যাও॥
দেহ নর হরিধ্বনি দেহ জয় জয় কার।
কর জোড়ে বন্দি গাইব ধর্ম্ম অবতার॥
প্রথমে বন্দিয়ে গাইব গুরুর চরণ।
যার সম্বে পাঁচালী কণ্ঠ নহে বিস্মরণ॥

বাণব্রতের পাঁচালী

দ্বিতীয়ে বন্দিয়ে গাইব দেবী সরস্বতী।
যাঁর কৃপা বলে স্বরে না হয় অখ্যাতি॥
আমার মধুর স্বরে যেবা দেয় ঘা।
আপনার গুরুর মাথায় পাখালে বাম পা॥
প্রথম হবিষ্যে যেবা লুন তেল খায়।
দ্বিতীয় হবিষ্যে যেবা পান নিতে চায়॥
তৃতীয় হবিষ্য যেবা নর করে।
তাঁহার সমস্যা গোসাঞী পুরে॥
অষ্টম হবিষ্য যেবা নর করে।
অষ্টম দারিদ্র্যে তাহারে বেড়ে॥
একুশ হবিষ্য যেবা নর করে।
সাজিয়ে যম তার কি করিতে পারে॥
বনে উড়ে চিল চিলুড়া ক্ষণে উড়ে সুয়া।
আমার 'টোল' (৫) সোজা হইল, হুদ্দু (৬) ধর গুয়া॥

আইলাম আইলাম পূর্ব্ব দুয়ার—
পূর্ব্ব দুয়ারে সূর্য্যমণ্ডলি, তাতে আছে অরুণ প্রহরী।
হে অরুণ প্রহরী ছাড় দুয়ার, আমার সত্বে রইলো ভার॥
তুমি যাও দক্ষিণ দুয়ার—
আইলাম আইলাম দক্ষিণ দুয়ার—
দক্ষিণ দুয়ারে যমের মণ্ডলি, তাতে আছে গরুড় প্রহরী।
হে গরুড় প্রহরী ছাড় দুয়ার, আমার সত্বে রইলো ভার॥
তুমি যাও পশ্চিম দুয়ার—
আইলাম আইলাম পশ্চিম দুয়ার—
পশ্চিম দুয়ারে বরুণমণ্ডলি, তাতে আছে ভীমকাল প্রহরী।
হে ভীমকাল প্রহরী ছাড় দুয়ার, আমার সত্বে রইলো ভার॥
তুমি যাও জলকুমারের ঠাঁই—

(৫) 'টোল' অর্থে বাঁক। ঘটি বাটির কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া "তুপ সাইয়া" গেলে তাহাকে "টোল খাওয়া" বলে।

(৬) 'হুদ্দু' কি বুঝিলাম না। পাওয়ারাও মানে বলিতে পারে না।

পাইকোড় গ্রামে প্রাপ্ত—চতুর্ভুজা মূর্ত্তি

পাইকোড় গ্রামে প্রাপ্ত—সূর্য্য মূর্ত্তি ও অপর—কয়েকটি ভগ্নমূর্ত্তি

গঙ্গাহে শিরে বন্দি হরিষে ভকতি।
বাহ্মণ মালা শিরে বন্দি করিয়া প্রণতি॥
আই বহে না উয়া বহে টুনাই বহে আড়ে। (৭)
পীঠের মাস খান খান হলো' মাঘ মাসের জাড়ে॥ (৮)
ওধা ধুতি ওধা কাচা দেব ধর্ম্মে যাক তাবত কাল,
যাবত না পাকিবে মাথার কেশ।
দুয়ার ঘুচাও গোসাঞী হুড়ুক ধুরুকে।
গোসাঞী দেখি আমি শমন (তুরুকে?) (৯) তরুকে॥
শমন (তুরুকে) তরুকে মার ঘোর তালি, পূজ দেবতা মার তালি,
শঙ্কর পূজে দাও কর তালি।

তোমার খাবো না দাবো।
সন্দেশরূপে প্রাপ্তি গাবো'॥
আনি দুর্গার শংখের পানী (জল)।
সে পানী নেতে ছানি॥
পাঁচ পানী একত্র হউক।
সুখে বালাভক্ত প্রহর করুক,
গঙ্গার প্রহর শিবকে দিয়ে।
যে বর মাগি সে বর পাইয়ে॥

বাণব্রতের পাঁচালী

নারায়ণচত্বরে যে শিলালিপি দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার একটি চেদিরাজ শ্রীকর্ণদেবের। অপরটি রাজা শ্রীবিজয়সেনের। কর্ণদেবের শিলালিপি কিঞ্চিদূন প্রায় এক হস্ত উচ্চ একটি স্তম্ভে ক্ষোদিত রহিয়াছে। স্তম্ভটি সুন্দর কারুকার্য্যে সুশোভিত। লিপিগুলি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। অধিকাংশ অক্ষরই উঠিয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় পাইকোড় গ্রামে গিয়া এই লিপির যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। (লিপি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত)—

পাইকোড়ের শিলালিপি

(৭) এই ছত্রটীর অর্থ কি? আই বহে না উয়া বহে, বোধ হয় এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। কিন্তু টুনাই বহে আড়ে কি?

(৮) 'জাড়ে' শীতে।

(৯) তুরুকে কি তুর্কী যবন যোদ্ধা? না শমনতরুকে—শমনরূপ তরুকে।

১। শ্রীশ্রীগণপতে * * *

২। * * * *

৩। দেব দ্বিজ গুরু ভজন্তো বৈষ্ণবাদয়ঃ স্বং ভিনত্তি তু * *

৪। নিবেদয়ন্ শ্রদ্ধয়াস্মিন্ কর্ম্মণি রাজশ্রীকর্ণদেবস্য * *

৫। স্বস্তি সমৃদ্ধরাট্ শ্রীচেদিরাজ শ্রীকর্ণদেবস্য ধ্বনস্তি বা কীর্ত্তিপ্রশস্তি বিশালা * *

৬। স্বহস্তিয়ঃ বিশ্বকর্ম্মচরণপ্রসাদাৎ দেবীমূর্ত্তি নূর্ম্মিত্যাং শ্রিয় শ্রীমূর্ত্তি * *

চেদিরাজ শ্রীকর্ণদেবের শিলালিপি

দ্বিতীয় শিলালিপি খানি একটি মূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষোদিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। লিপির নিম্নলিখিত অংশটুকু মাত্র বর্ত্তমান আছে যথা,—

বিজয়সেনের নামযুক্ত লিপি

"রাজ্যে শ্রীবিজয়সেন"

নারায়ণ চত্বরস্থিত অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তির মস্তক, কটীর নিম্নভাগ হইতে সমস্ত অংশ, এবং হস্তগুলির প্রায় তিন চতুর্থাংশ কর্ত্তিত। সুতরাং মূর্ত্তির পরিচয়লাভের কোনই উপায় নাই। শিলালিপি দুইটি ও অপর ভগ্ন মূর্ত্তি গুলির সহিত এই দেবীমূর্ত্তিটি উক্ত "নারায়ণচত্বর" পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে পাওয়া গিয়াছিল। কে জানে এই মূর্ত্তিই শ্রীকর্ণদেবপ্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি কি না? নরসিংহমূর্ত্তিটি প্রায় তিন ফুট উচ্চ, দুই ফুট চওড়া। নৃসিংহ নখাঘাতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতেছেন। পদতলে একটি নারীমূর্ত্তি (বোধ হয় কয়াধু) পতিতা রহিয়াছেন। প্রহ্লাদের মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেবমূর্ত্তি

বুড়াশিবের মন্দিরে একটি ভগ্ন বাসুদেবমূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষোদিত আছে—

লিপিযুক্ত মূর্ত্তি

"পণ্ডিত শ্রীবিশ্বরূপস্য"।

অপর শিলালিপিখানি একটি গোলাকৃতি অনতিবৃহৎ স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে। স্তম্ভটি এমন সুন্দররূপে পালিশ করা যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই স্তম্ভ শিবরূপে পূজিত হইতেছে। লিপিটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। অক্ষরগুলি প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। লিপির অনেকাংশ খণ্ডিত। লিপির প্রথম শ্রেণীতে আছে—

* * * "মাঘস্য" * * *

পাহিদত্তের শিলালিপি

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে—

"মণ্ডলপাত্র শ্রীপাহিদত্তেন" * * *।

বুড়াশিবের মন্দিরে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বাসুদেব মূর্ত্তি, একটি সূর্য্যমূর্ত্তি, ও কয়েকটি শক্তি মূর্ত্তি।
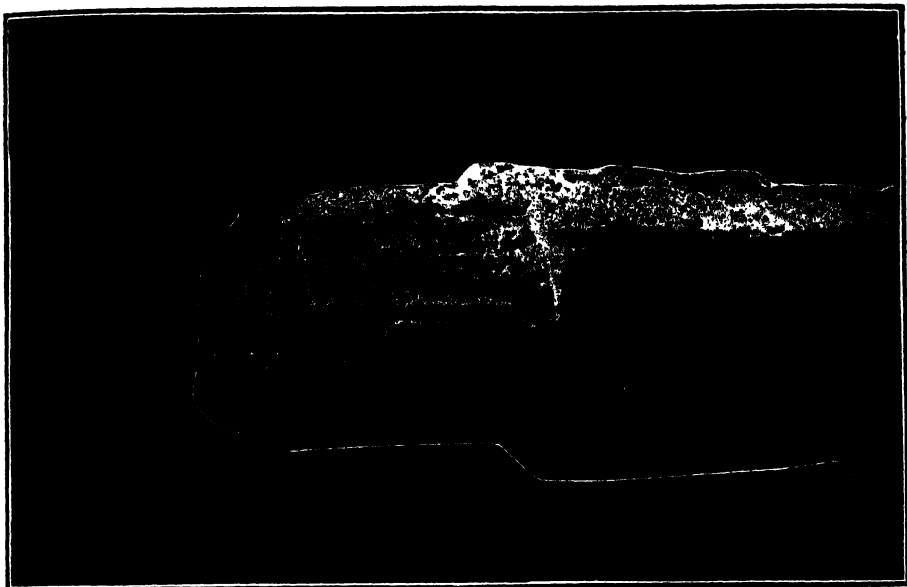
পাইকোড় গ্রামে প্রাপ্ত—কর্ণদেবের লিপি স্তম্ভ
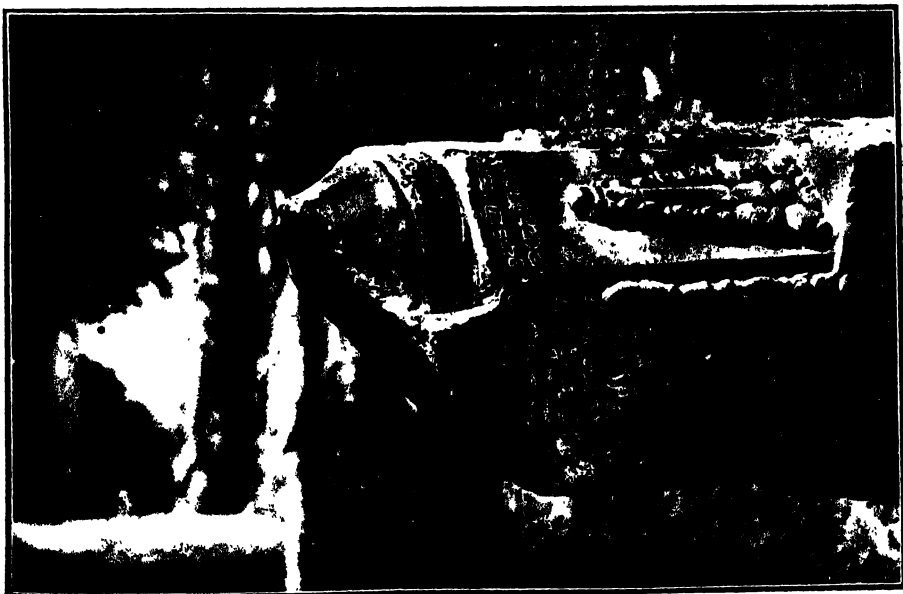
কর্ণদেবের শিলালিপির—এক পার্শ্বের দৃশ্য

পাইকোড়ের উত্তরে একটী দীঘি আছে, নাম দোরাজ দীঘি। প্রবাদ আছে, বীরনগরের কোনো রাজা যখন ঐ দীঘি খনন করাইতেছিলেন, সেই সময় কোথা হইতে এক রাজা আসিয়া পাইকোড় দখল করেন, এবং ঐ দীঘি খনন-কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। দুই রাজা কর্ত্তৃক খনিত হয় বলিয়া দীঘির নাম হইয়াছে 'দোরাজদীঘি'। পাইকোড়ের উত্তরপূর্ব্বে এক প্রান্তর আছে নাম 'দোনহার'। প্রবাদ আছে, বীরনগরের রাজা পরাস্ত হইলে তাঁহার এক সেনাপতি রাত্রিযোগে বিজেতা রাজার শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন, ঐ প্রান্তরে দুই জনই পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাই প্রান্তরের নাম 'দোনো হার' বা 'দোনহার'। পাই-কোড়ের পূর্ব্বে 'ননগড় মিত্রপুর' নামে দুইখানি গ্রাম আছে, উভয় রাজা যেখানে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হন সেই স্থানই মিত্রপুর নামে আখ্যাত হয়। মিত্রপুর ও পাইকোড়ের মাঝে একখানি গ্রাম আছে, নাম ভাগাইল। ঐ ভাগাইল উভয় রাজ্যের সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দিত। আইল শব্দে বাঁধ, অংশনির্দ্দেশক বাঁধ—চলিত কথায় ভাগাইল হইয়াছে। মিত্রপুরে একটি অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী দেবী মূর্ত্তি পূজিতা হইতেছেন। মূর্ত্তি পুরাতন বলিয়াই অনুমান হয়। গ্রামে একটি অর্দ্ধনির্ম্মিত পুরাতন মন্দির আছে, নাম 'জোড়বাঙ্গলা'। প্রবাদ গঙ্গাগর্ভ হইতে বৃষপৃষ্ঠে বাহিত গঙ্গামৃত্তিকায় ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল, দেশের তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তা—সংবাদ পাইয়া ঐ মন্দিরে নমাজ পড়ি-বার আদেশ প্রচার করেন, তজ্জন্যই মন্দির অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ননগড়ে একটি দীঘি আছে, নাম "রাজা মহীপালের দীঘি"। দীঘির পরিমাণ প্রায় দেড় শত বিঘা হইবে।

পাইকোড়ের দীঘি ও প্রান্তর

রাজ্যসীমা ভাগাইল

ননগড় মিত্রপুর মূর্ত্তি, মন্দির ও রাজা মহীপালের দীঘি

পাইকোড়ের (১০) উত্তর পার্শ্বে "আজান সহিদ" পীরের আস্তানা আছে। গ্রামের পূর্ব্বে "হজরৎ সাহজামাল, এবং সা তুর্কান সাহেব" পীরের আস্তানা,

(১০) পাইকোড়ের লাগাও দক্ষিণ পূর্ব্বে হিয়াৎ নগর গ্রাম, এই স্থানেই প্রাচীন কোট বা দুর্গ ছিল। গ্রামে এখনো কোটের ডাঙ্গা, কোটের পুকুর প্রভৃতি ডাঙ্গা ও পুকুর বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিজুলপুরের ডাঙ্গা, রামকান্তপুরের ডাঙ্গা প্রভৃতি নাম এখনো শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামে এখন কেবল মুসলমানের বাস। মুসলমানপ্রাধান্যকালে হিন্দুগণ পাহির কোট পাইকোড়ে আসিয়া বাসকরিয়াছিল। পাইকোড়ের দক্ষিণে বিলাসপুর, তীরগ্রাম, গোয়ালমাল প্রভৃতি গ্রাম। বিলাসপুরে এখন হিন্দুর বাস নাই, সমস্ত মুসলমান। গ্রামে গোরা সৈয়দের আস্তানা আছে। কিন্তু পুষ্করিণীগুলির নাম শুনিয়া মনে হয়, গ্রাম পূর্ব্বে হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। কানুপালের পুকুর, সিদ্ধি গড়ে', ভূষণা, দুলালী, রাণীদীঘি, মুসলমানি নাম প্রায় একটিও নাই। রাণীদীঘির দক্ষিণে পরিখার অন্তিম চিহ্ন পরিবেষ্টিত অনতিবৃহৎ প্রান্তর মধ্যে একটী ধ্বংসস্তূপকে লোকে রাজবাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

পাইকোড়ে মুসলমানপীর

ও গ্রামের মধ্যে "সাতাশ সাহেব" পীরের আস্তানা আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বোগদাদ্ হইতে "সা গোলাম হুসেন" এবং তাঁহার অপর চারি ভ্রাতা এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেন পাইকোড়ে অবস্থিতি করেন। তাঁহার দুই পুত্রের নাম সা ফজলি আলি, ও সা গোলাম পাঞ্জাতন। ইহাদের বংশধরগণ পাইকোড়ে বাস করিতেছেন। সহিদ শব্দের অর্থে ধর্ম্মযুদ্ধে হত। আজান সহিদপীর হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন এইরূপ প্রবাদ আছে। তিনি কোন্ সময় এদেশে আসিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচার ও উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কেহ বলিতে পারে না। ননগড়ে একটি মসজিদে একটি আরবী শিলালিপি আছে। লিপিপ্রস্তর এমন স্থানে দেওয়ালের গায় গাঁথা আছে, যে তাহার আলোকচিত্র গ্রহণ একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিকটে আরবী-ভাষাভিজ্ঞ কোনো লোক না থাকায় পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। পাইকোড় গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী, একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি পোষ্ট আফিস্ আছে। প্রতিসপ্তাহে দুই দিন,

ননগড়ে আরবী-লিপি

তীরগ্রামে একটি ভগ্ন বাসুদেব মূর্ত্তি, একটি ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি পড়িয়া আছে। বহু কষ্টে জোড়াতাড়া দিয়া মূর্ত্তি চিনিতে হয়, তাই আলোকচিত্র লওয়া হয় নাই। গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বণিকের বাস ছিল। তাহার পুত্রের বিবাহে জল সাধিবার সময় কোনো কুটুম্বিনী নাকি গ্রামের কর্দ্দমাক্ত পথে তাঁহার চরণালঙ্কার হারাইয়া আসিয়াছিলেন, এই জন্য বণিক গ্রামের পথ ইষ্টক দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এখনো গ্রামের জীর্ণ পথে বণিকের পুণ্য কীর্ত্তির শেষ নিদর্শন-স্বরূপ ইতস্তত পতিত ইষ্টকগুলি সেই বণিক্, বণিক্ পুত্র, বিবাহ উৎসব, এবং সেই পরিহাসরসিকা কুটুম্বিনীর উজ্জ্বল চিত্র স্মৃতিপথে জাগ্রত করিয়া দেয়। বণিকের বাড়ী এখন "বথের ডাঙ্গা" নামে বিখ্যাত। গ্রামের প্রান্তে সে বথের ডাঙ্গা আজিও রহিয়াছে। গ্রামে নূতন পুকুর নামে একটি পুষ্করিণী আছে। তাহার ইতিহাস,—গ্রামের পূর্ব্বতন কোনো জমিদার, একবার প্রজাদের অবস্থা পরিদর্শন জন্য তীরগ্রামে আগমন করেন। তিনি জমিদার, সুতরাং তিনি তো আর পরের পুকুরের জল পান করিতে পারেন না। সেই জন্য গ্রামে আসিয়া ডাবের জলে পিপাসা নিবারণ করিতে লাগিলেন, এবং যথাসম্ভব ত্বরিত গতিতে নূতন পুষ্করিণী খননের আদেশ দিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই নূতন পুকুর কাজল-কালো-জলরাশিতে এবং বাঁধাঘাট ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিবমন্দিরে পরিশোভিত হইয়া উঠিল। মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইলেন। যথাকালে জমিদার, মহাসমারোহের সহিত পুষ্করিণী ও শিবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণাদি গ্রামবাসিগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া, তবে সেই পুষ্করিণীর জলগ্রহণ করিলেন। সেই পুষ্করিণী ও মন্দির আজিও মানবনেত্রকে পবিত্র করিতেছে। এইরূপ ঘটনাবলির আলোচনা করিয়া, এখনকার সহিত তখনকার তুলনা করিলে কি মনে হয়? বড় দুঃখেই বলিতে হয় হায়রে সে কাল আর এ কাল !!
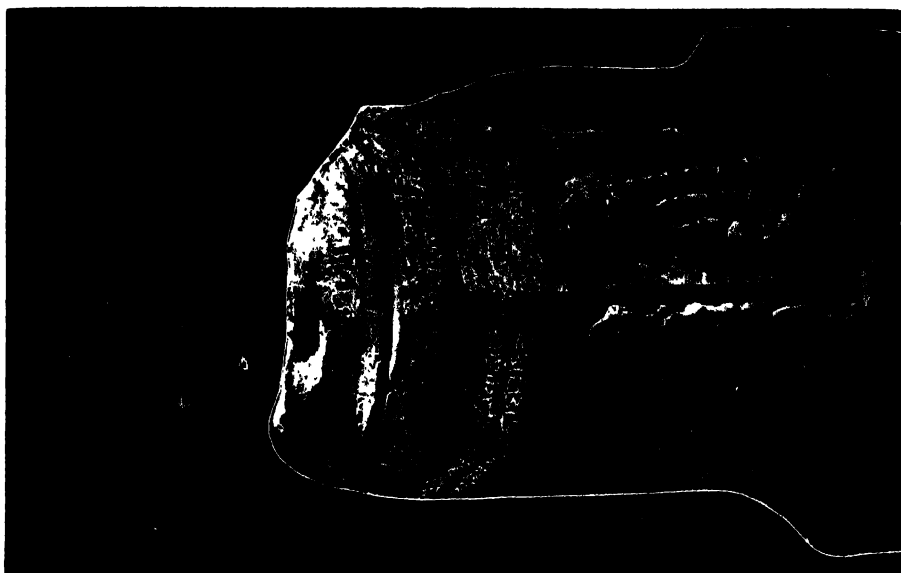
বৃহস্পতিবার ও রবিবার 'হাট' বসিয়া থাকে। হাটে নানাবিধ তরকারি, স্থানীয় পল্লীজাত ফল-মূল, মাছ ও তাঁতে বোনা কাপড়, গামছা প্রভৃতি বিক্রয় হয়। গ্রামে মরিচ-মসল্লা, কাপড় ও সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতির কয়েকটি দোকান আছে। আধুনিক সভ্যদেশজাত নানাবিধ সৌখীন খেলনা ও সিগারেট প্রভৃতি এবং কেশ-বর্দ্ধিনী কুন্তলরঞ্জিনী প্রভৃতি তেলের বিজ্ঞাপন ও তৈলাদি আমদানী হইয়াছে।

বর্ত্তমান পাইকোড়

বীরনগর ও পাইকোড় প্রভৃতি গ্রাম সম্বন্ধীয় কাহিনীগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এই সমস্ত প্রবাদপরম্পরা আলোচনা করিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিলে নানা সংশয় মুখরিত হইয়া উঠে। অতীতের অন্ধ যবনিকা উত্তোলন করিয়া এই সমস্ত প্রবাদের ক্ষীণালোকে রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাসের মহনীয় চিত্রাবলি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে বাসনা হয়। কিন্তু সংগৃহীত তথ্য অতি সামান্য। সুতরাং ইহার উপর ভরসা করিতেও প্রবৃত্তি হইতেছে না। তবে যদি কিছু পাওয়া যায়, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই উল্লিখিত প্রবাদাবলির সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধনির্ণয়ে অগ্রসর হইলাম।

ইতিহাস ও পাইকোড়ের প্রবাদ

বীরনগরে সেনরাজগণের রাজত্বসম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং পাইকোড়ে বিজয়সেনের শিলালিপির আবিষ্কার প্রভৃতি নানা কারণে আমাদের অনুমান হয়, রাঢ়ে সেন-রাজগণের রাজধানী বীরনগরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেনরাজগণের মধ্যে বিজয় সেনই প্রথম রাজা। (১১) তিনি উত্তর রাঢ় হইতে রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে ক্রমে বরেন্দ্র ভূমি ও বঙ্গ এবং আসাম প্রভৃতি প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনে (৩য় চতুর্থ শ্লোক) উল্লিখিত হইয়াছে,—

রাঢ়ে সেন-রাজধানী বীরনগর

"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা নিরূঢ়ি,
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিত চরৈঃ ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ,
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ॥
তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভটপৃতনাম্ভোধিকল্পান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয় কুমুদবনোল্লাস-লীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপাধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ॥"

বল্লালের সীতাহাটী শাসন

(১১) "তদনু বিজয়সেনো প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্ত বীরধ্বজত্বং" (দানসাগর উপক্রম)

সেই (চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধ বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা বিশ্ব-বাসিগণকে সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া বদান্য পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, এবং শুভ্র কীর্ত্তিতরঙ্গে আকাশতলকে স্নাত করাইয়াছিলেন, যাঁহারা সদাচারচর্য্যার খ্যাতি-গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ়দেশকে অপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বংশে প্রবল প্রতাপ, শক্রসেনাসাগরের প্রলয়তপন, কীর্ত্তি জ্যোৎস্নায় উজ্জল শ্রীসম্পন্ন, প্রিয়জনগণরূপ কুমুদবনের উল্লাসলীলাসম্পাদক মৃগাঙ্কস্বরূপ, আজন্মপ্রণয়ানুরাগী-জনের মনোরাজ্যে সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠার হিমাচল সদৃশ, সত্যশীল, অকপট, করুণাধার সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। (এই সামন্তসেনের বংশেই বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।) তাম্রশাসনোক্ত এই শ্লোক হইতে মনে হয় রাঢ় দেশেই সেনবংশ প্রথম অভ্যুদয় লাভ করেন, এই বংশে বহু রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা রাঢ়দেশেই জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রবাদ-প্রসঙ্গ হইতে বীরনগরে এবং তাহার উপকণ্ঠে চন্দ্রপাহাড়ী ও ভাঁটরা প্রভৃতি স্থানে, আমরা বীরসেন, চন্দ্রসেন, ভদ্রসেন প্রভৃতি বহু রাজার নাম প্রাপ্ত হই। প্রবা-দোক্ত উড়িষ্যাবিজয়ী রাজাকে আমরা বিজয়সেন বলিয়া মনে করি। বিজয়-সেনের দেবপাড়া-প্রশস্তিতে লিখিত আছে—

সেনরাজগণের তাম্রশাসনে রাঢ়ের কথা

প্রবাদের উড়িষ্যা বিজয়ী রাজাই বিজয়সেন

"গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসাং জিগায়"।

ইহা হইতে বিজয়সেনের গৌড়, কামরূপ, এবং কলিঙ্গজয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে কলিঙ্গ ও উড়িষ্যা এক রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাইকোড়ে বিজয়সেনের ও পাহিদত্তের যে শিলালিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহাশয় এবং রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন, উক্ত উভয় লিপি সমসাময়িক বলিয়া একরূপ অভ্রান্তরূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আমাদের অনুমান হয় 'মণ্ডলপাত্র পাহিদত্ত' বিজয়সেনেরই মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিজয়-সেনেরই আদেশে নির্ব্বাসিত হন, এবং ছদ্মবেশে উড়িষ্যাযুদ্ধে কৃতিত্বপ্রদর্শন করিয়া, ভদ্রেশ্বরে আসিয়া রাজার প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন। মহাবল শব্দে সেকালে সৈনিককে বুঝাইত। সেনাপতির উপাধি ছিল মহাবলাধ্যক্ষ। সুতরাং পাইকোড়ের "মহাবলের বাগান" (ছদ্ম সৈনিক) পাহিদত্তই পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। "পাইকের কোট" হইতে পাইকোড় নাম হওয়া অপেক্ষা "পাহির কোট" হইতেই "পাহিকোট" অপভ্রংশে "পাইকোড়" নাম হওয়া স্বাভাবিক। প্রবাদে আছে,

বিজয়সেনের মন্ত্রী মণ্ডলপাত্র পাহিদত্ত

ননগড়ে মহীপাল দীঘি।

বীরভূম-বিবরণ ১১ পৃষ্ঠা

ননগড় মিত্রপুরের জোড়-বাঙ্গলা।

পাইক পুরাতন দুর্গের নিকটে নিজ নামে একটি দুর্গ স্থাপন করেন। পুরাতন দুর্গ হিয়াৎ-নগরের নিকটে ছিল। তথাকার কোটের ডাঙ্গা, কোটের পুকুর প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পাহিদত্তের শিলালিপি বর্ত্তমান পাইকোড়েই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এই পাহিদত্তই যে সেই সৈনিক তাহা বোধ হয় নিশ্চিতরূপেই বলিতে পারা যায়। "মণ্ডল" শব্দের অর্থ "বিশ্বপ্রকাশে" লিখিত আছে—"স্যান্মণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে চ"। প্রথমাবস্থায় বিজয়সেনের 'মণ্ডল' উপাধিগ্রহণই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তাই পাহিদত্ত 'মণ্ডলপাত্র' আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। পাইকোড়ের নিকটস্থ বিলাসপুর গ্রাম, গ্রামের মধ্যস্থিত দীঘির রাণীদীঘি নাম, দীঘির প্রান্তে পরিখার ক্ষীণ চিহ্ন পরিবেষ্টিত ধ্বংসস্তূপ, আমাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক করে। বিজয়সেনের মহিষীর নাম ছিল 'বিলাসদেবী'। (১২) তিনি শূরবংশের কন্যা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে শূরবংশ দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। বিজয়সেনের মহিষীর নামানুসারেই বিলাসপুর গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল কি না কে বলিবে।

পাহিদত্তের নামেই পাইকোড়

বিলাসপুর ও রাজ্ঞী বিলাসদেবী

ননগড়ে যে "রাজা মহীপালের দীঘি" নামে একটি দীঘি রহিয়াছে, আমরা তাহাকে পালবংশীয় প্রথম মহীপালের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি। কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট ২য় বিগ্রহপালের পুত্র (অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য) ১ম মহীপালদেব উত্তররাঢ়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। নলহাটী আজিমগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের বারালা ষ্টেশন হইতে ভাগীরথীতীরস্থিত গয়সাবাদ (মুর্শিদাবাদ জেলা) পর্য্যন্ত প্রায় আট মাইল-ব্যাপী প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ও তন্মধ্যবর্ত্তী 'মহীপাল' নামক স্থান মহীপালের প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ঐ স্থান ননগড় হইতে অধিক দূরে নহে। দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী রাজা রাজেন্দ্রচোল,—দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া, বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রকে রণভূমি ত্যাগে বাধ্য করিয়া, দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করিয়া, উত্তররাঢ়ে অভিযান করেন এবং বোধ হয় (এই মহীপালের নিকট পরাস্ত হইয়া) গঙ্গাতীর হইতেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। (১৩) আর্য্যক্ষেমীশ্বর বিরচিত চণ্ডকৌশিক নামক নাটকে প্রথম মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের

রাঢ়ে পাল-রাজত্ব ও প্রথম মহীপাল

(১২) "অভবৎ বিলাসীদেবী শূরকুলাম্ভোধি কৌমুদী তস্য।
নরনয়ন মধু খঞ্জন বিহার কেলী স্থলী মহিষী॥" (বাঙ্গলার ইতিহাস ২৯২ পৃষ্ঠা)

(১৩) রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় গিরিলিপি।

সহিত, এবং কর্ণাটগণ নবনন্দের সহিত উপমিত হইয়াছেন। (১৪) (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় নেপাল হইতে চণ্ডকৌশিক নাটকের (১৩৩১ খৃঃ নকল করা) একখানি পুঁথি আনয়ন করেন। উক্ত নাটক হইতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।) দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোল এবং তাঁহার সৈন্যগণই চণ্ডকৌশিক নাটকে নবনন্দরূপে অভিহিত হইয়াছেন, ইহাই আমাদের অনুমান। এই রাজেন্দ্রচোলের সময়েই তাম্রশাসনাদিতে পরিচিত সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সেনবংশধর সামন্তসেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন "পালাধিকার কালে মালব, হূণ, খস, কুলিক, লাট প্রভৃতি জাতির সঙ্গে কর্ণাটগণও গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।" সেনরাজগণ "দাক্ষিণাত্য কর্ণাটকক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত" বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্রচোলের আগমনের বহু পূর্ব্বেই সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাটক্ষত্রিয়গণ রাঢ়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমানের কারণ—আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়সেন স্বর্গারোহণ করেন। রাজেন্দ্রচোল রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন ১০২৪ খৃঃ অঃ, সুতরাং সামন্তসেন, হেমন্তসেন ও বিজয়সেন এই তিন পুরুষে (গড়ে পঁচিশ বৎসর হিসাবে) পঁচাত্তর বৎসর ধরিলেও রাজেন্দ্রচোলের সমকালে সামন্তসেনের অভ্যুদয় কল্পনা করিতে হয়। রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির স্থিত শিলালিপিতে লিখিত আছে—

চণ্ডকৌশিক নাটকে মহীপাল

সামন্তসেনের অভ্যুদয়-কাল

"দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদনমদনোত্তাদৃক্ একাঙ্গবীরঃ
যস্মাদদ্যাপবিহত বসামানা মিদ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্তজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥"

১ম মহীপাল ও সামন্তসেন

এই যে কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণের দমন করিয়া "একাঙ্গবীর" নামে খ্যাতিলাভ, ইহা হইতে অনুমান হয়, যে হয়তো নবনন্দত্ব প্রাপ্ত কর্ণাটগণের পক্ষে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সদৃশ রাজা ১ম মহীপালের সহিত সামন্তসেনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের

(১৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893 pt. I, P. 250.

উদ্ধারকর্ত্তা প্রবলপ্রতাপ মহীপালের সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া একাঙ্গবীর-রূপে পরিচিত হওয়া যে তত সহজ ব্যাপার ছিল না, একথা না বলিলেও চলে। তবে সে সময় বৈদেশিক আক্রমণে রাঢ়ভূমি বারম্বার উপক্রুত হইতেছিল, এই জন্যই পাল-নরপতিগণ রাজ্য-সীমান্তের এই সমস্ত খণ্ড-যুদ্ধ বা লুণ্ঠন-ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বোধ হয় বিশেষ অবসর পান নাই। ১০০২ খৃঃ অঃ ধঙ্গদেব রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পরে প্রথম—মহীপালকে "গৌড়ধ্বজ-গাঙ্গেয়দেবের" সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় নেপাল হইতে একখানি রামায়ণ-গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার পুষ্পিকা হইতে জানিতে পারা যায় ১০৭৬ বিক্রমাব্দে (১০১৯ খৃঃ অঃ) গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয়দেব তীরভুক্তির অধীশ্বর ছিলেন। সুতরাং অনুমান করিতে হয় তৎপূর্ব্বেই গৌড় আক্রমণ করিয়া তিনি গৌড়ধ্বজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গাঙ্গেয়দেবের পর রাঢ়ে আগমন করেন রাজেন্দ্রচোল, (১০২৪ খৃঃ অঃ)। এই সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণের অবকাশ সময়ে ১ম মহীপালদেবকে বঙ্গ সমতটাদি জয় করিতে ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যেই সামন্তসেন বোধ হয় 'একাঙ্গবীর' খ্যাতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। বাস্তবিকই রাঢ়ে বৈদেশিক আক্রমণই সেন রাজগণের সৌভাগ্য-পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গলার পশ্চিম-প্রান্তে শেষ-সীমান্ত-প্রদেশ ছিল রাঢ়ভূমি (কতকটা বর্ত্তমান বীরভূমি)। বীরনগরের চতুষ্পার্শ্বেই পাহাড় জঙ্গল ও জলা-ভূমির আধিক্য, স্থানটীকে একপ্রকার দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক, পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যমণ্ডলের (পাল-সামন্তচক্রের) সহিত কখনও সদ্ভাব, কখনও বিরোধ করিয়া, বৈদেশিক আক্রমণকারীগণের সহায়তায়, রাঢ়ে সেন-রাজবংশ অভ্যুত্থান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই আমাদের অনুমান।

রাঢ়ে বৈদেশিক আক্রমণ

সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তির নবম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে—"যে স্থান আজ্যধূম-গন্ধে আমোদিত হইত, যথায় মৃগশিশুগণ বৈখানস (বাণপ্রস্থাশ্রমাবলম্বী তাপস) রমণীগণের স্তন্যক্ষীর পান করিত, পরিচিত বেদ-ধ্বনি শুক-পক্ষীগণে এবং ভব-ভয়-ভীত-সজ্জনগণে পরিপূর্ণ গঙ্গার সেই পুলিন-পরিসর-স্থিত আশ্রমারণ্যে" তিনি (সামন্তসেন) শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই গঙ্গাতীর,—বীরনগর

সামন্তসেনের গঙ্গাবাস ও তাহার আনুমানিক স্থান-নির্ণয়

হইতে বেশী দূরে ছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গঙ্গা-স্রোত এক সময় সীতাপাহাড়ীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। পূর্ব্বোক্ত তপস্বী-বিল যে গঙ্গা ছিল, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। অনুমান হয়, এই তপস্বী-তীরেই পূর্ব্বে বাণপ্রস্থাশ্রমাবলম্বী ব্যক্তিগণ আসিয়া বাস করিতেন। এই সমস্ত স্থান মৃগ-পক্ষীগণে পরিপূর্ণ ছিল। অন্যান্য জীবজন্তুও যথেষ্ট থাকিত। বীরনগরের নিকটস্থ একটি স্থানের নাম 'হরিণ-ডোবা'। পাকুড়-ষ্টেশনের সন্নিহিত স্থানের নাম হরিণ-ডাঙ্গা। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই দেখিয়াছে, ঐ সমস্ত স্থানে শশক, মৃগ, মহিষ (এমন কি স্থানে স্থানে ব্যাঘ্রাদি) জন্তুগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। (১৫)

রাঢ়ে চোড়গঙ্গদেব

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনও রাঢ়েই জীবনাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেনই পরাক্রান্ত হইয়া, রাঢ়-রাজধানী-বীরনগর পরিত্যাগ করিয়া গৌড়-সিংহাসন গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, রাজ্যবিস্তার কার্য্যে বিজয়সেন কলিঙ্গপতি চোড়গঙ্গদেবের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উৎকল-রাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়—চোড়গঙ্গদেব—

"গৃহ্নাতিস্ম করং ভূমের্গঙ্গা গোতম-গঙ্গয়োঃ।
মধ্যে পশ্যৎসু বীরেষু প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢ় স্ত্রিয় ইব" ॥

(১৫) ঐ অঞ্চলে 'শ্যামরুল', "কীর্ত্তিপুর", 'আটগলি', "নসীপুর", "নবীনগর" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে নসীপুর কীর্ত্তিপুর ও আটগলিতে এখন সাঁওতাল বাস করিতেছে। আটগলিতে পুষ্করিণী-সংখ্যা খুব বেশী। একটি হর-গৌরীর ভগ্নমূর্ত্তি একটি পাথরের চৌকাঠ (নটগড়ে', কালীতলা, গোকুলা প্রভৃতি পুষ্করিণীর নাম) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় স্থানটি এক সময় বেশ সমৃদ্ধ ছিল। পানিচাটা পুকুরে বাঁধা-ঘাটের চিহ্ন রহিয়াছে। কালীতলা-পুষ্করিণীর তীরে (হর-গৌরীর যুগল-মূর্ত্তি আছে) ক্ষীরোত্তরী দেবীর পূজা হয়। আষাঢ় মাসে শুভদিন দেখিয়া পূজা করিয়া ক্ষীরের ভোগ দিতে হয়, কীর্ত্তি পুরে একটি পুষ্করিণী আছে, নাম 'কলাধর'। সীতাপাহাড়ীর দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কাদম-সহর গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, এ প্রবাদ বহু প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অদূর-বর্ত্তী নপাড়া গ্রামের বিলে একটি বাঁধা-ঘাটের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। এখন অনেক লোক সেই ঘাটে নামিয়া স্নান করে। প্রাচীনগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, উহা গঙ্গার বাঁধা-ঘাটেরই শেষ চিহ্ন। আনুমানিক প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে (কেহ কেহ বলেন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে) গঙ্গার স্রোত এই পথে প্রবাহিত হইত। (ন্যূনাধিক প্রায় দুইশত বৎসর হইবে গঙ্গা বর্ত্তমান পথে প্রবাহিত হইতেছেন।)

এই তাম্রশাসনের অপর এক স্থানে লিখিত আছে—

আরম্যা নগরাং কলিঙ্গজ-বল প্রত্যুগ্র ভগ্নাবৃতি—
প্রাকারায়ত-তোরণ প্রভৃতিতো গঙ্গাতট-স্থাত্তত:।
পার্থাস্ত্রৈঃ যুধি-জর্জ্জরীকৃত-নমন্নাধেয়-গাত্রাকৃতি
র্মন্দারাধিপতি র্গতো রণভুবো গঙ্গেশ্বরাদুদ্রুত:”॥

চোড়গঙ্গ বিজিত মন্দার দুর্গ

এই সমস্ত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়, চোড়গঙ্গদেব গঙ্গা তীরবর্ত্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গা-তীরবর্ত্তী মন্দার-দুর্গ জয় করিয়া মন্দারপতিকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের কলিঙ্গ-অধিকার, আর কলিঙ্গপতির গঙ্গা-তীরবর্ত্তী (রাঢ়) ভূভাগ অধিকার, ইহার সামঞ্জস্য করিতে হইলে অনুমান করিতে হয়, যে (কলিঙ্গ-যুদ্ধে বিজয়সেনের সহিত অথবা গৌড়পতির বিরুদ্ধে রাঢ়াগত চোড়গঙ্গের সহিত) চোড়গঙ্গ ও বিজয়সেন সৌখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মন্দার-দুর্গটিকে আমরা রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি। কারণ রাম-চরিতের অপর-মন্দার (গড়মন্দারণ) ও ভাগলপুর জেলার "মধুসূদনের" মন্দার, কোনটাই গঙ্গা-তীরে অবস্থিত নহে। (১৬) বীরভূমের থানা লাভপুর হইতে কিয়দ্দূরে, উত্তর-পূর্ব্বে মন্দার নামে একটি স্থান আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মন্দার হইতে পূর্ব্বদিকে অনতিদূরেই গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন। (পূর্ব্বে এই স্রোতোধারা আরো নিকটে বহিত) মন্দারের নিকটেই মানসারা নামে একখানি গ্রাম আছে। মন্দারের এক অংশ আজিও পরিখা-পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই অংশটির চলিত নাম "জীবন-কৃষ্ণপুর"। জীবন-কৃষ্ণপুরের দক্ষিণে আগড়ভাঙ্গা নামে এক বিপুলায়তন ধ্বংসস্তূপ দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করে। চতুর্দ্দিকের বিশাল পরিখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে যে অংশটুকু বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলেই পরিখার পূর্ব্ব-বিশালতা অনুভব করিতে আর কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয়

বিজয়সেন ও চোড়গঙ্গদেব

মন্দার দুর্গের স্থান নির্ণয়

(১৬) রাম-চরিতে "শূর ইতি অপর-মন্দার-মধুসূদন সমস্তাটবীক-সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি লক্ষ্মী শূরঃ" বলিয়া এক নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়সেন শূর-বংশের দুহিতা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রামপালের রাজত্বের অব্যবহিত পরেই চোড়গঙ্গদেব গৌড় আক্রমণ করেন। দক্ষিণবঙ্গের নৌযুদ্ধ বোধ হয় এই উপলক্ষেই সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখি, পাল-বংশের বিপন্নের বন্ধু, অথবা বিজয়সেনের শ্বশুর সম্পর্কীয় অপর-মন্দারের কোনো শূর নরপতি চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন নাই। দক্ষিণ-বঙ্গের নৌযুদ্ধে বৈদ্যদেবই জয় লাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে আমাদের অনুমান হয় চোড়গঙ্গ-বিজিত মন্দার রাঢ়েই অবস্থিত ছিল।

না। পশ্চিমের পরিখাটি "গড়খাই" নামে দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় শতাধিক হস্ত ব্যাপিয়া জলপূর্ণ রহিয়াছে। লোকে বলে "সেখানে আগড় (উগ্র-ক্ষত্রিয় জাতীয়) রাজার বাড়ী ছিল। কোনো বিদেশী-রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি রাজ্য হারাইয়া ছিলেন"। আমরা এই "মন্দার" ও তাহার 'অধিপতিকে' চোড়-গঙ্গবিজিত বলিয়াই অনুমান করি। বলা বাহুল্য যে বিজয়সেনের অভ্যুদয় কালে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় এইরূপ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং বিজয়সেন সেই সমস্ত খণ্ড রাজ্য জয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, যে বিজয়সেনের প্রথমাভ্যুদয় কালে মণ্ডল উপাধি গ্রহণই স্বাভাবিক, এবং পাহিদত্ত তাঁহারই 'পাত্র' ছিলেন"। (১৭)

চেদীরাজ কর্ণদেব

পাইকোড়ে চেদীরাজ কর্ণদেবের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। নর্ম্মদা-নদীর তীরে ত্রিপুরী-নগর ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইনি ১০৪২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই পরাক্রান্ত নরপতি জীবনের সুদীর্ঘ ষষ্ঠি-বর্ষব্যাপী রাজ্য কাল কেবল যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর পিতা গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয় দেবও একজন দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ ছিলেন। কর্ণদেব প্রায় সমস্ত ভারত বর্ষ জয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, "তাঁহার শত বর্ষব্যাপী-জীবন, পশ্চিমে হূণ-রাজ্য হইতে পূর্ব্বে বঙ্গ-রাজ্য পর্য্যন্ত, এবং উত্তরে কাণ্যকুব্জ হইতে, দক্ষিণে কেরল-দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-রাজগণের সহিত বিবাদে অতি-বাহিত হইয়াছিল"। (১৮)

গৌড়েশ্বর নয়পাল ও কর্ণদেব

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য ও তাঁহার জীবনী-লেখক বুস্তন লিখিয়া গিয়াছেন—(১৯) "শ্রীজ্ঞান যৎকালে বজ্রাসনে অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে পশ্চিম দেশের কর্ণরাজের সহিত মগধাধিপতি নয়পালের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। মগধনগরী জয় করিতে না পারিয়া

(১৭) "রাজ্যে শ্রীবিজয়সেন" শিলালিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ লিপিতে "প্রবর্দ্ধ-মান বিজয় রাজ্যে" কি এই রকম ধরণের একটা কিছু পাঠ থাকে। প্রাগুক্ত লিপির পূর্ব্বাংশেও বোধ হয় ঐরূপ কিছু ছিল। লিপিতে রাজ্যের তদানীন্তন রাজার রাজ্যকালের অতীত বা চলিতাব্দও লিখিত থাকে। সম্ভবতঃ যিনি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, লিপির পর অংশে তাঁহার পরিচয় ছিল। পাহিদত্তের লিপিতে "মাধস্ত" অংশ দেখিয়া মনে হয় তৎপূর্ব্বে সন ও তারিখ ক্ষোদিত ছিল। পাহির শিলালিপি একটি স্তম্ভে ক্ষোদিত। তাহাতে কোনো মূর্ত্তি আদি ছিল না। এই জন্যই আমরা অনুমান করিয়াছি, ইহাই "পাহির" নূতন কোট প্রতিষ্ঠার স্মারক-স্তম্ভ।

(১৮) বাঙ্গলার ইতিহাস ২১৩ পৃঃ।

(১৯) রাজতরঙ্গিণী ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮৫ পৃঃ।

কর্ণরাজের সৈন্যগণ কতকগুলি পবিত্র বৌদ্ধ-বিহার ধ্বংস করে এবং পাঁচ জন বৌদ্ধকে নিহত করে। * * * অবশেষে নয়পালই জয় লাভ করেন। মগধবাহিনীর হস্তে কর্ণরাজের সৈন্যদল অধিকাংশই বিনষ্ট হয়। কর্ণরাজও স-দলবলে অতীশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতীশের মধ্যস্থতায় উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। খাদ্য-দ্রব্য ভিন্ন যুদ্ধকালে যে সকল সামগ্রী নষ্ট হইয়া যায়, এবং যে সকল দ্রব্য উভয় পক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহা পরস্পরে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন অথবা প্রত্যর্পণ করেন।

কর্ণদেব ও নয়পাল

১ম মহীপালদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নয়পাল গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধযুদ্ধের পর পুনরায় রাঢ়ভূমে কর্ণদেবের সহিত নয়পালের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে ননগড় ও মিত্রপুরের উল্লেখ করিয়াছি। (ননগড়ে রাজা মহীপালের দীঘি বর্ত্তমান রহিয়াছে)। আমাদের মনে হয় ননগড়ের প্রকৃত নাম "নয়গড়", কালক্রমে অপভ্রংশে ননগড়ে পরিণত হইয়াছে। নয়পালের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধে কর্ণদেব রাঢ়ে (পাইকোড়) প্রাচীকোটে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন এবং নয়পাল নয়গড়ে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রবাদাদি আলোচনা করিয়া এইরূপই মনে হয়। যে কোনো কারণেই হউক চেদীরাজ-কর্ণদেব যে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও পাইকোড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা, তাঁহার শিলালিপি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। অনুমান হয় এই স্থানেই নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত কর্ণদেব-দুহিতা যৌবনশ্রীর পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। (২০) মগধের সন্ধিতে এইরূপ কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বুস্তন তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। (২১) কর্ণদেব যৎকালে রাঢ়দেশ আক্রমণ করেন, তৎকালে সেন বংশে বোধ হয় সামন্তসেন কি (তৎপুত্র) হেমন্তসেন বর্ত্তমান ছিলেন। মালব-রাজ উদয়াদিত্য ও তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, "কর্ণাটগণ চেদীবংশীয় গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণদেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন"। সুতরাং কর্ণাটক-ক্ষত্রিয় সেন-বংশকে কর্ণদেব হয়তো প্রীতির চক্ষেই নিরীক্ষণ করিতেন। শেষ জীবনে কর্ণদেব বোধ হয় দাক্ষিণাত্য-রাজগণের সহিত যুদ্ধ

হেমন্তসেন

(২০) রামচরিত ১ম পরিচ্ছেদের ৮ম ও ৯ম শ্লোকে বিগ্রহপালের যৌবনশ্রী-লাভকাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে।

(২১) কর্ণদেবের অপর কন্যার নাম বীরশ্রী। বঙ্গাধিপতি জাতবর্ম্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং ইতি মধ্যে গৌড়ে ধীরে ধীরে পাল-প্রতাব খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপালের সময় দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়, কৈবর্ত্ত-পতি দিব্বোক বিদ্রোহী হন। বহু কষ্টে সামন্ত রাজ-গণের সহায়তায় রামপাল 'জনকভূ' (পিতৃরাজ্য) পুনরুদ্ধারে সাফল্য লাভ করেন। রামপালের পুত্র কুমারপাল এবং তৎপুত্র তৃতীয় গোপাল অত্যল্প দিন মধ্যেই গতায়ু হইলে; রামপালের অপর পুত্র মদনপাল পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তখন সুবিস্তীর্ণ পাল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়েই (রামপালের পুত্রগণের রাজত্ব-কালে) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর-রাঢ়ে বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। উত্তর-রাঢ়ের বীরনগর হইতেই তিনি বরেন্দ্রী প্রভৃতি স্থানে স্বাধিকার বিস্তার করেন। (২২)

পালপ্রভাবহ্রাস ও বিজয়সেনের অভ্যুদয়

(২২) মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচগ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে, এই গ্রামে "লক্ষ্মণসেনের" গড় ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। গ্রামের 'লহবর' দীঘি, 'লস্কর' দীঘি, 'জোআর' দীঘি, 'সমুদ্র' দীঘি, প্রভৃতি বড় বড় পুষ্করিণীগুলি অতীত-সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পরিখার লুপ্তাবশেষ এখন 'ছোট আগড়' ও "বড় আগড়" নামে খ্যাত। একটি উচ্চ স্তূপকে লোকে 'লক্ষ্মণসেনের' রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই গ্রামের 'শরমতী' বা "শর্ম্মতী" পুষ্করিণীর সংস্কারকালে একটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, মূর্ত্তিটির চিত্র প্রদত্ত হইল। কালিকা-পুরাণের ধ্যানের সঙ্গে এই ব্রহ্মার প্রতিরূপের যেন অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার ধ্যান—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধর শ্চতুর্বক্ত্র শ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্ত কমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্ত গৌরাঙ্গ প্রাংশু স্তুঙ্গাঙ্গ উন্নত।
কমণ্ডলুং বাম করে স্রুচং হস্তে চ দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালাং বামাধশ্চ তথাস্রুবং।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে দেবাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেবং বিচিন্তনং॥

(কালিকা-পুরাণ অশিতিতম অধ্যায়)

কিন্তু এই মূর্ত্তির বামে সাবিত্রী ও দক্ষিণে সরস্বতী দেবীর কোনো প্রতিমূর্ত্তি নাই। দ্বিতীয় কোনো প্রস্তরখণ্ডে সে মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল কি না কে জানে। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এ দেশে ব্রহ্মা-পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। এখনো প্রায় প্রতি হিন্দু-প্রধান গ্রামে বৎসরান্তে একবার অগ্নিভয়াদি নিবারণের জন্য চতুর্ম্মুখের পূজা হয়। পূজান্তে হোম এবং ভোগাদি নিবেদিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার মূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক বিশেষ ধুমধামের সহিত পূজা করিয়া, এখনো অনেক স্থানেই বারইয়ারি

মুর্শিদাবাদ জেলা—পাঁচগ্রামে প্রাপ্ত ব্রহ্মা-মূর্ত্তি।

দেউলীর সাবিত্রী-মূর্ত্তি।

পাইকোড়ে প্রচলিত 'মাঘীষষ্ঠীর ব্রত' বীরভূমের আর কোথাও প্রচলিত নাই। শ্রীপঞ্চমীর দিনে 'শিবের গাজন' বাঙ্গলার অন্য কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হয় কি না, আমরা অবগত নহি। মাঘের শুক্লাষষ্ঠী শীতলাষষ্ঠী নামে খ্যাত। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনের কৃষ্ণাষষ্ঠীকে (দোলপূর্ণিমার পরের কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী) স্কন্দ ষষ্ঠী বলে। কিন্তু এই মাঘী (শীতলা) ষষ্ঠীর ব্রতের পাঁচালীতে আছে—"এস হে

উৎসব নির্ব্বাহিত হয়। গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্যে ইনি গণনীয় নহেন। জানি না, পাঁচগ্রাম নামের সঙ্গেশব্রহ্মার কোনো সম্বন্ধ আছে কি না? মূর্ত্তিটি পুরাতন বলিয়া মনে হয়।

(বীরভূম জেলায়) অজয়নদের তীরে 'দেউলী' নামে একখানি গ্রামে একটি দশভুজ শিব, একটি দশভুজা দেবীমূর্ত্তি এবং অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনীর একটি বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। এই সমস্ত মূর্ত্তি সেন-রাজগণের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। সেন-রাজগণ নিঃশঙ্ক শঙ্কর, 'বৃষভ শঙ্কর 'মদনশঙ্কর' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। ঐতিহাসিকগণের মতে তাঁহারা শিব-শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনের শিরোদেশে দশভুজ শিবমূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকিত। সুতরাং দেউলির প্রবাদ পরম্পরার মধ্যে হয়তো কিছু সত্য নিহিত থাকিতে পারে। পঞ্চানন দশহস্ত শিবের একটি ধ্যান এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

পঞ্চবক্ত্রং মহাকায়ং জটাজুট বিভূষিতম্।
চারু চন্দ্র কলাযুক্তং মূর্দ্ধ্নি বালৌঘ ভূষিতম্॥
বাহুভির্দশভির্যুক্তং ব্যাঘ্র চর্ম্ম বরাম্বরম্।
কালকূট ধরং কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতম্॥
কিরীট বন্ধনং বাহু ভূষণঞ্চ ভুজঙ্গমান।
বিভ্রতং সর্ব্বগাত্রেষু জ্যোৎস্নার্পিত সুরোচিষম্॥
ভূতি সংলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ মেকৈকত্র ত্রিভি স্ত্রিভিঃ।
নেত্রৈস্তু পঞ্চদশভি র্জ্যোতিস্মদ্ভি র্বিরাজিতম্॥
বৃষভোপরিসংস্থন্তু গজ কৃত্তি পরিচ্ছদম্॥
* * * * * *
* * * * * *
শক্তি ত্রিশূল খট্টাঙ্গ বরদাভয়দং শিবম্।
দক্ষিণেষথ হস্তেষু বামেষপি ততঃ শুভম্॥
অক্ষসূত্রং বীজ পূর ভুজগং ডমরূৎপলম্।
অষ্টৈশ্বর্য্য সমাযুক্তং ধ্যায়েত্তু হৃদগতং শিবম্।

কলিকা-পুরাণ ৫১ অধ্যায়।

দশভুজা দেবীমূর্ত্তির বামদিকের এক হস্তে কমণ্ডলু এবং দক্ষিণের এক হস্তে অক্ষমালা দেখিয়া সাবিত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। মূর্ত্তিটি রাঢ়ীয়-ভাস্কর্য্যের—তক্ষণ শিল্পের—সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থল। নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য দেখিয়া শিল্পির অমর-আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া

পাইকোড়ের ব্রত-পূজাদির অপূর্ব্বতা ও তাহার আলোচনা

কার্ত্তিক তাম্বুল খাও, মাঘীমঙ্গীর ব্রত ক'রে যাও"। (তুলসীমঞ্জরী দিয়া শিবপূজাও বোধ হয় সম্পূর্ণ নূতন। তবে "জয়-স্তম্ভ" ও "স্মারক-স্তম্ভ"গুলি দেবতা-পদবী প্রাপ্ত হইয়া পাইকোড়ে যেরূপ পূজা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে 'গদাধর' (যিনি নদী-নীরেই অবস্থিতি করেন এবং তুলসীমঞ্জরী দিয়া যাঁহার পূজা করা হয়।) যে কি ছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। ফলতঃ এই

আইসে। অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটি প্রায় চারিহস্ত উচ্চ। একখণ্ড পাষাণে—মহিষ, অসুর, সিংহ এবং দেবী-মূর্ত্তি নির্ম্মিত। পূর্ব্বের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় অধুনা একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে তাঁহার পূজা হইতেছে। মন্দির এতই অল্প পরিসর যে, মূর্ত্তির আলোক-চিত্র গ্রহণের কোনো উপায় নাই। দেবীর নাসিকা কর্ত্তিত। প্রবাদ, কালাপাহাড় কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। লোকে দেবীকে খ্যাঁদাপার্ব্বতী বলিয়া অভিহিত করে। দেউলীতে একটি শিবমন্দির আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে এক দুর্য্যোগের রাত্রে প্রবল বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাতাড়ণে পূর্ব্বের সুবিশাল মন্দির ভূপতিত হয়। দেউলী হইতে প্রায় আট দশ মাইল দূরবর্ত্তী, 'সুরুল' নামক গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী নীলকুঠীর, তদানীন্তন দেওয়ান সেই শব্দ শুনিতে পান, এবং রজনী-প্রভাতে হস্তী আরোহণে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেউলীতে আসিয়া উপস্থিত হন। বর্ত্তমান মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। দ্বারদেশে "১৭৪০ শকাব্দা" এবং "শ্রীতিলকচন্দ্র বসাক" ক্ষোদিত আছে। মন্দির ইষ্টক-নির্ম্মিত। শিবের নাম "দেউলীশ্বর"। মন্দির-সন্নিধানে একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে। প্রবাদ, "বৈষ্ণব-কবি লোচন দাস মধ্যে মধ্যে দেউলীতে আসিয়া, ঐ প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করিতেন। দেউলীর নিকবর্ত্তী কাঁকুটীয়া গ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয় ছিল। কাঁকুটীয়ার বৈদ্যদের বাটিতে লোচনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ ও নিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তির আজিও পূজা হইতেছে।

অজয়-নদের দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী সেনপাহাড়ী, বা শ্যামারূপার গড়ে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের অবস্থিতির বিষয়ে প্রবাদ প্রচলিত আছে। বোলপুর হইতে ইলামবাজার আসিবার পথে "দ্বারন্দা" নামে একখানি গ্রামে "লক্ষ্মণদীঘি" নামে একটি বিস্তৃত জলাশয়, লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রবাদ, বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী 'লক্ষ্মণনগর' বা 'লখণোর' (আধুনিক নগর বা রাজনগর) বল্লালসেনের স্থাপিত। "আইনইআক্‌বরী" গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। সেনরাজবংশের অধঃপতন সময়ে (তবকাৎ ই নাসিরীর মতে) মহম্মদ ই বখ্‌তিয়ারের সেনাপতি মহম্মদ শেরাণ লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) হইতে আসিয়া এই (নগর) 'লখণোর' জয় করেন। কাহার নিকট হইতে ইহা বিজিত হয়, মুসলমান ইতিহাস-গ্রন্থে তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হয় "সেন-বংশীয় কেশবসেন কিছুদিন লখণোরে থাকিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কেশবসেন বা তাঁহাদেরই অপর কোনো প্রতিনিধির হস্ত হইতেই মহম্মদ শেরাণ লখণোর অধিকার করেন"। "লখণোর-কাহিনীতে" এই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। রাঢ়ে (বীরভূমে) সেন-রাজগণের স্মৃতি-বিজড়িত বহু প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

১৯ নং দেউলার দশভূজ-মহাদেব।
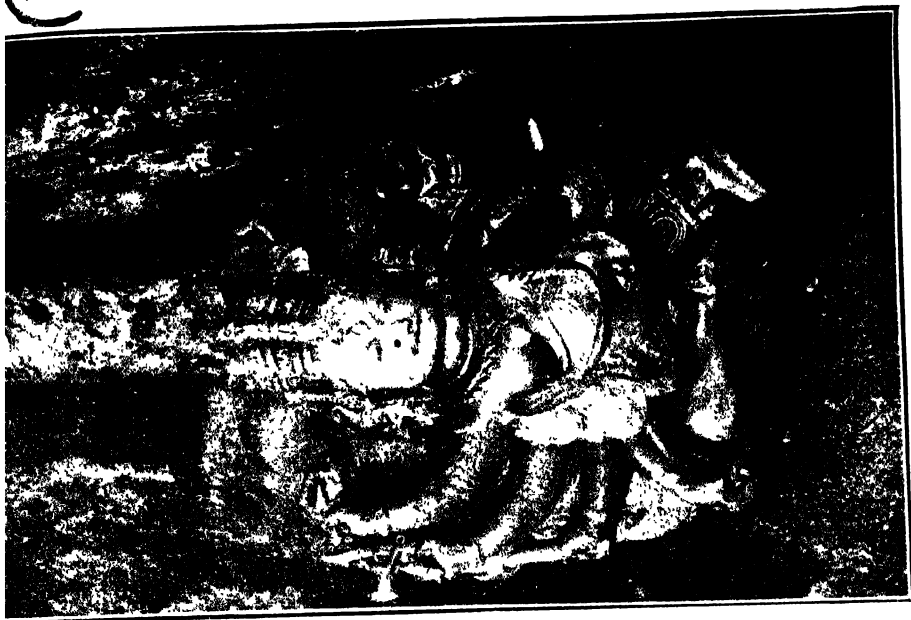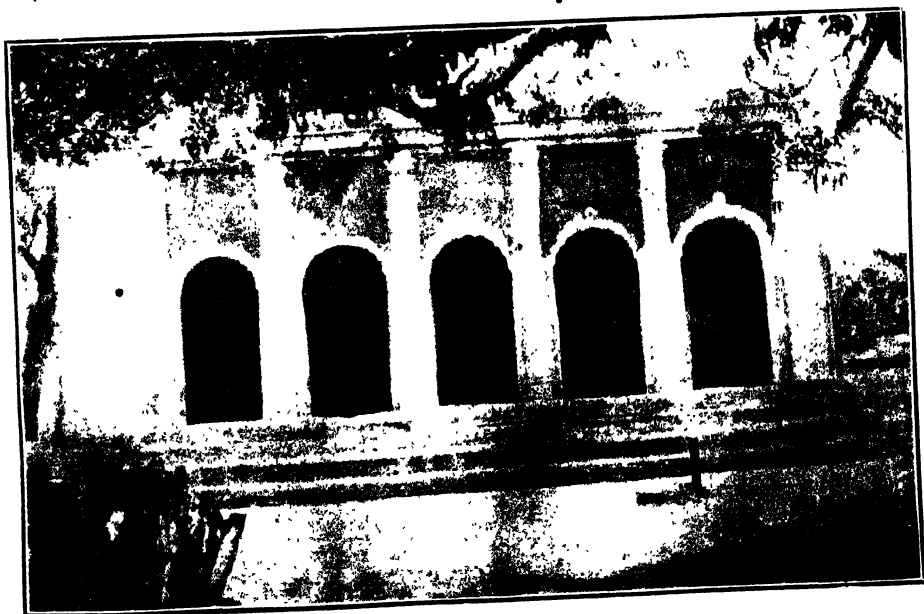
২০ নং কনকপুরের অপরাজিতার মন্দির

অনুষ্ঠানটি, কোনো তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত লোকাচারের সংমিশ্রণে একরূপ দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশে যখন পাল-রাজগণের প্রভাব প্রবল ছিল,—তখন যে এ দেশের কতকগুলি লোক বৌদ্ধ আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষ পাইকোড়ের শিয়রে আসিয়া ১ম মহীপাল যখন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তখনকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পাইকোড় আবার ছিল রাঢ়ের গর্ব্ব-গৌরব সদাচারপরায়ণ সেন-রাজকুমারগণের প্রধান লীলাভূমি। পাইকোড়ে দেব-দ্বিজ-গুরু-বৈষ্ণবভক্ত চেদীরাজের প্রভাবও বড় কম কাজ করে নাই। আর পাল-রাজগণের সময়েও দেশে, যে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। সুতরাং জোর করিয়া নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না। তবে দুইটি প্রবল মত দেশে পাশাপাশি ভাবে প্রচলিত থাকিলে, একটির আচার-ব্যবহার যে, অপরটির সহিত কোনো না কোনো আকারে কিছু কিছু মিশিয়া যাইবে, ইহাও একরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। এদিকে, মুসলমানগণের প্রথমাভ্যুদয় কালে এই সমস্ত পল্লীর অবস্থা যে অতি শোচনীয়রূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই 'সহিদ পীরের আস্তানা' তাহার প্রমাণ। সেই সময় এবং পরবর্ত্তী সময়ের আরো নানা বিপ্লব উপপ্লবে অনেক আচার-অনুষ্ঠান লোপ পাইয়া গিয়াছে, অনেকগুলি কবন্ধে পরিণত হইয়াছে, এবং সংস্কারকগণ কবন্ধের স্কন্ধে গজমুণ্ড কাটিয়া আনিয়া জোড়া লাগাইয়া দেওয়ায় এক কিম্ভূত কিমাকার লোকাচাররূপ 'গণদেব' জন্মলাভ করিয়াছে। এতদঞ্চলে তান্ত্রিক প্রভাবের অপর এক নিদর্শন, পাইকোড়ে—"গোপালের মৎস্য-মাংসের ভোগ"! কালিকা-পুরাণে দেখিতে পাই (৭৪ অধ্যায়) মহাদেব বলিতেছেন—আমার ভৈরব-মূর্ত্তির মন্ত্র ও রূপ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূজনক্রম ত্রিপুরভৈরবীর ন্যায়ই জানিবে। * * * এই আমার ভৈরব মূর্ত্তি— "যথেষ্টমদ্যমাংসাদি ভোজনার্থং ময়া ধৃতঃ"

শিব, বিরিঞ্চী ও বিষ্ণুর বামমূর্ত্তি

ব্রহ্মার ও মদ্য-মাংসাদি ভোজননিরত একটি বামদেহ আছে, তাহার নাম মহামোহ; মহামোহ হইতেই চার্ব্বাকাদি মতের উৎপত্তি। বিষ্ণুর বাম মূর্ত্তি নরসিংহ; পণ্ডিত বাম-দক্ষিণ দুইভাবেই এই মূর্ত্তির পূজা করিতে পারে। বিষ্ণুর অপর এক বাম মূর্ত্তি আছে,—

কালিকাপুরাণের মৎস্য-মাংস-ভোজী বালগোপাল

"তথৈব বালগোপালমূর্ত্তি র্জরায়ুবেষ্টিতঃ।
মদ্যমাংসাশনো ভোগী লোলুপঃ স্ত্রীষু সর্ব্বদা"।

বলা বাহুল্য তান্ত্রিক ভিন্ন অপর কেহই এই মূর্ত্তির এইরূপ উপচারে পূজা করেন না। কালিকা-পুরাণের মত, যে এক সময় এতদঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আমরা তারাপুর-কাহিনীর আলোচনায় সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। পাইকোড়ে এই বাল-গোপাল পূজাও তাহার অন্যতম প্রমাণ।

পাইকোড়ে সূর্য্যমূর্ত্তি

পাইকোড়ে বুড়া শিবের মন্দিরে যে কয়েকটি মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে পাদুকা পরিহিত, পদ্মাসনে দণ্ডায়মান, পদ্মহস্ত দ্বিভুজ, একটি সূর্য্য-মূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব ইহাতে সপ্তাশ্ব বাহন ও অরুণ সারথী নাই। পার্শ্বস্থিত দুইটি মূর্ত্তি চিনিবার উপায় নাই। সম্রাট্ লক্ষ্মণসেন, তাঁহার পুত্রগণের তাম্রশাসনে "পরম-সৌর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপসেনও আপনাদিগকে 'পরম-সৌর' পরিচয়ে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। পাল-রাজগণের সময়েও এ দেশে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। আমাদের অনুমান হয়, প্রাগুক্ত মূর্ত্তিটি পাল-রাজগণের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (২৩)

পাইকোড়ের অপরাপর মূর্ত্তি

এই সূর্য্য-মূর্ত্তির সঙ্গে একত্রে আরো দুই একটি মূর্ত্তির আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। সূর্য্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্ত অক্ষসূত্রে, অধোহস্ত বরমুদ্রায় শোভিত। অপর দুইটি হস্ত ভগ্ন। সূর্য্যের বাম পার্শ্বের মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে তরবারি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর হস্তগুলি এবং মূর্ত্তির পাদপীঠ হইতে কটী পর্য্যন্ত অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই মূর্ত্তি দুইটির পরিচয় লাভের কোনো উপায় নাই। 'কালিকা-পুরাণে' অক্ষমালা, পুস্তক ও বরাভয়শোভিত হস্ত, অথবা তরবারি বা ছুরিকা ও পুস্তক-হস্ত কয়েকটি মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। কালিকা-পুরাণে পুস্তক-হস্ত বিষ্ণুর এবং শক্তি-মূর্ত্তির ধ্যান বিবৃত হইয়াছে। আমাদের উদ্দিষ্ট সূর্য্য-মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি দুইটি, কালিকা-পুরাণোক্ত কোনো তান্ত্রিক দেবী-মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়।

বুড়া-শিবের মন্দিরস্থিত বাসুদেব মূর্ত্তিগুলি সেন-রাজগণের সময়ে নির্ম্মিত

(২৩) বীরভূমে তিন প্রকারের সূর্য্য-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম, এই অশ্ব সারথিহীন দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দ্বিতীয়, অশ্বসারথিযুক্ত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। তৃতীয়, অশ্ব সারথিযুক্ত রথোপবিষ্ট মূর্ত্তি। দ্বিতীয় প্রকারের মূর্ত্তি বীরভূমের বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যথা "বারা", "ঢেকা", "দক্ষিণগ্রাম", "নারায়ণপুর" প্রভৃতি গ্রামে। তন্মধ্যে দুই একটির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। (লোহাপুর ও ঢেকা-কাহিনী দ্রষ্টব্য) তৃতীয় প্রকারের মূর্ত্তি কেবলমাত্র "তারাপুরে" আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হইয়াছিল, মূর্ত্তির গঠন-প্রণালী দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। নারায়ণ-চন্দ্রের নরসিংহ-মূর্ত্তিটিও সমসাময়িক বলিয়াই অনুমিত হয়। চেদীরাজ কর্ণদেবের সময়ে পাইকোড়ে যে দেবী-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সময়ে অপরাপর আনুসঙ্গিক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হওয়াও স্বাভাবিক। অবশ্য তাহার পরে যে আর কোনো মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই, এমন-কথা বলিতেছি না। বিশেষ—পাল ও সেনরাজগণের সময়ের রাঢ়ীয় শিল্প-নৈপুণ্যের বৈশিষ্টদ্যোতক তক্ষণ ও ভাস্কর্য্য-প্রণালী, বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশে অনুস্যূত ছিল, সুতরাং জোর করিয়া কোনো কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে এ কথাও ঠিক, যে শ্রীচৈতন্যের পর এদেশে বাসুদেব-মূর্ত্তির পূজা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। বুড়া-শিবের মন্দিরের বাসুদেব-মূর্ত্তির পাদপীঠে যে লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে, সেই লিপির পণ্ডিত "বিশ্বরূপ" কে, তাঁহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাইকোড়ের বাসুদেব-মূর্ত্তি

প্রবাদ কাহিনী শুনিয়া, পুরাতন দেবমূর্ত্তি ও ধ্বংসস্তূপাদি দেখিয়া, বীরনগর, ভাঁটরা, ভাদীশ্বর, পাইকোড় প্রভৃতি স্থান যে বহু প্রাচীন, শৌর্য্যে পরাক্রমে, বিদ্যায় জ্ঞানে, স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে, আচারে ব্যবহারে—এই সমস্ত স্থান যে এক সময় রাঢ়ের—তথা গৌড়-বঙ্গের—পরিচয়-গৌরব ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চিরদিন কখনো সমান যায় না। তাই বীরনগরের ধ্বংস-স্তূপে আজ সাঁওতাল বাস করিতেছে, ভদ্রকালীর মন্দির-প্রাঙ্গণ শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, আর পাইকোড়ের অতীতের যোগসূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে পারম্পর্য্য প্রবাহ, অতীতের সেই স্বর্ণদী-বিমলা ভাব-প্রবাহের মধুময়ী ধারা কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে! পাইকোড়ে তাহার ক্ষীণ চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

কনকপুর-কাহিনী

রেলওয়ে ষ্টেশন মুরারইয়ের পূর্ব্বে অনতিদূরে কনকপুর গ্রাম, (বীরভূমের রামপুরহাট সাবডিভিজনের অন্তর্গত)। এই গ্রামে প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মাত্মা রামনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের নিবাস ছিল। তাঁহার বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ আজিও ভাদুড়ী রাজার বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রামে রাস্তা, এবং পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া—তাহার ঘাট বাঁধাইয়া দিয়া, ইনি কনকপুরের সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; আজিও সেই সব কীর্ত্তিরাজির শেষ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। "ভাদুড়ীর" প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডীর-বনের প্রকাণ্ড শিবমন্দির, আজিও দর্শক-হৃদয়ের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধাধারায় অভিষিক্ত হইয়া, তাঁহার অমর-আত্মার অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করিতেছে। ভাদুড়ী মহাশয় মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়,—তদানীন্তন নগরাধিপতি (প্রাচীন লখণোরের রাজা) আসাদ উজ্জমান খাঁএর দেয় রাজস্ব বাকী পড়ায়, মুর্শিদাবাদ দরবার হইতে ভাদুড়ী মহাশয় সেই বাকী কর আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। ভাণ্ডীরবনে ভাণ্ডেশ্বর-শিব দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তিনি শিবসেবার জন্য প্রথমতঃ দৈনিক চারি আনা মূল্যের ভোগের বরাদ্দ করিয়া দেন। ভাণ্ডীরবনের শ্রীগোপাল-বিগ্রহ তখন নোয়াডিহিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোপালের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়া যান। গোপালেরও ঐরূপ দৈনিক ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, ভাদুড়ী মহাশয় রাজনগররাজের সহিত রাজস্ব সম্বন্ধীয় গোলযোগের মীমাংসার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সুপারিশে নগরাধিপতি, রাজকরের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার প্রদানে উদ্যত হন। পরমার্থপরায়ণ ত্যাগশীল ব্রাহ্মণ অর্থগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া, লাট হুকমাপুর ১৮৮ নং তৌজীভুক্ত ভাণ্ডীর-বন, বীরসিংহপুর, আড়াইপুর ও রাইপুর এই চারিখানি মৌজা দেবোত্তর স্বরূপে পুরস্কার প্রার্থনা করেন। রাজা সাহেব উক্ত মৌজা কয়খানি লাখেরাজ প্রদান করিলে, তিনি ঐ সম্পত্তি গোপালদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া, তাহার আয় হইতে (ভাণ্ডীর-বনের) গোপালদেব, ভাণ্ডেশ্বর মহাদেব, ও বীরসিংহপুরের কালিকা দেবীর পূজা ও ভোগাদির

কনকপুর গ্রামের ভাদুড়ীরাজার বাড়ী, রামনাথ

রামনাথভাদুড়ী কর্ত্তৃক ভাণ্ডীরবনে মন্দির-প্রতিষ্ঠা

সুব্যবস্থা করিয়া দেন। (১) গোপালদেবের ও মহাদেবের বর্ত্তমান মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ভাণ্ডেশ্বর-শিবমন্দিরের দ্বার ঊর্দ্ধে যে শিলালিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে, (২) তাহার প্রথম দুইটী শ্লোক –

'রসাব্ধিষোড়শশকে সংখ্যকে শাস্ত্রসম্মতে
রামনাথদ্বিজঃ কশ্চিৎ ভাদুড়ীকুলসম্ভবঃ'—

* * * *

ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় ১৬৭৬ শকাব্দে, খৃষ্টাব্দ ১৭৫৪ সালে ভাণ্ডীরবনের শিব-মন্দির নির্ম্মিত হয়। কনকপুর এক সময় রাজা উদয়নারায়ণের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত যুদ্ধে উদয়নারায়ণ পরাজিত ও বন্দীকৃত হন,—১৭১৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়,—উদয়নারায়ণের পর ভাদুড়ী মহাশয়ের অভ্যুদয় হয়। বোধ হয় উদয়নারায়ণের জমিদারী নাটোরের রঘুনন্দনের হস্তগত হইলে তাঁহারই সংশ্রেণী এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, মুর্শিদাবাদে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বীরভূমে আগমন করেন, এবং কনকপুরে সপরিবারে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। বীরভূমে বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি কেহ কেহ কর্ম্ম-সূত্রে আসিয়া বাস করিয়াছেন। সুতরাং ভাদুড়ী মহাশয় যে বরেন্দ্র-অঞ্চল হইতে আসিয়া বীরভূমে বাস করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি কেহ ছিলেন কি না, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার কোনো উপায় নাই। কনকপুরে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে,—ভাদুড়ী মহাশয় সপরিবারে নৌকারোহণে জল নিমজ্জনে আত্মহত্যা করেন। যে পুষ্করিণীতে এই শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সেই "না ডুবী" পুকুর আজিও কনকপুরে বর্ত্তমান। শুনিতে পাওয়া যায়, ভাদুড়ী মহাশয় "বর্গির-ভয়ে" এইরূপে আত্মনাশে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভাদুড়ী মহাশয় নবাব আলিবর্দ্দির কর্ম্মচারী ছিলেন। সে সময় বর্গির হাঙ্গামায় বীরভূমের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। সুতরাং "বর্গির ভয়ে ভাদুড়ী রাজার আত্মহত্যার" কাহিনী সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

ভাদুড়ী মহাশয়ের কাল-নির্ণয়

রামনাথ ভাদুড়ীর আত্মহত্যা।

কনকপুরের অপরাজিতা-দেবীর নাম এতদঞ্চলে চির-প্রসিদ্ধ। কত কাল

(১) ভাদুড়ী মহাশয় বীরভূমে এইরূপ বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নলহাটীর পার্ব্বতী-দেবীর নামে তিনি বহু সম্পত্তি দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতেই এখন দেবীর বর্ত্তমান সেবার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে।

(২) বীরভূম-বিবরণ ১ম খণ্ড ১৫১ পৃঃ।

হইতে তিনি কনকপুরের অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন, কেহই বলিতে পারেন না। দেবীর মুখমণ্ডল মাত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; দেহের অপরাংশ একটি নাত্যুচ্চ বেদীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, (ইহাই প্রবাদ)। অনেকেই সন্দেহ করেন, কোনো অত্যাচারী কর্ত্তৃক দেহের অপর সমস্ত অংশ নষ্ট হইয়া গেলে, অবশিষ্ট মুখমণ্ডলটি বেদীর সহিত গাঁথিয়া দিয়া পূজা করা হইতেছে। সে যাহাই হউক, দেবীর কমলানন যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। কৃষ্ণপাষাণ ভেদ করিয়া, সেই হাস্য-প্রফুল্ল, করুণা-মণ্ডিত, সৌম্য-প্রশান্ত বদন-মণ্ডল হইতে যেন অমিয়-নির্ঝর ক্ষরিত হইতেছে। দেখিলেই হৃদয় ভরিয়া যায়, সেই আজন্ম-পরিচিত-ব্যাকুল-সুখ, সেই আশৈশব-অভ্যস্ত 'মা-মা-বোল', যেন আবার নূতন করিয়া প্রাণকে বেদনাতুর করিয়া তোলে। জানি না কোন্ মাতৃহারা হৃদয়ের আকুল আবেগ—এই পাষাণের মুখে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে! দেবীর আদি অধিষ্ঠানভূমি ছিল, নিকটবর্ত্তী 'বামড়ী' কাঁতারের (কান্দারের) পূর্ব্বপার্শ্বে বর্ত্তমান বালিয়াঘাটি শ্মশান। তৎপরে গ্রামের পশ্চিমে দুর্গাতরী-পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে এক প্রস্তরময় মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন্। সে মন্দিরের ভগ্না-বশেষ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দির বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা উদয়নারায়ণ সেই মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।(৩) সে মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে দেবীকে আনিয়া রামনাথ ভাদুড়ীর শিবমন্দিরে স্থাপন করা হয়। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর গত হইল, কনকপুরের জমিদার হরবংশী বর্ম্মন্ মহাশয় অপরাজিতা-দেবীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করা-ইয়া দিয়াছেন। এই বর্ম্ম বংশ, পশ্চিম হইতে ব্যবসায় উপলক্ষে এতদঞ্চলে আসিয়া, জমিদারী ক্রয় করিয়া, কনকপুরে স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। ইহা-দের বাটীতেও কয়েকটি বিগ্রহ-মূর্ত্তি এবং শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কনকপুরে অপরাজিতাদেবী

অপরাজিতা দেবীর পূর্ব্ব-অধিষ্ঠানভূমি ও মন্দির

কনকপুরের জমিদার কর্ত্তৃক মন্দির-প্রতিষ্ঠা

কনকপুর গ্রামের উত্তরে মল্লাইপুর (মলয়পুর ? না মল্লপুর ?) গ্রাম। গ্রাম-পার্শ্বে একটি কাঁতার (কান্দার) আছে। স্থানীয় লোকে তাহাকে মলাই নদী (!) বলে। গ্রামের পশ্চিমে ও পূর্ব্বে (পরিখার মত) নিম্ন জলাভূমি, যথাক্রমে মল্লদহ

(৩) রাজা উদয়নারায়ণ দেবীর সেবা-পূজাদির সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—দেবসেবার বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। শুনিয়াছি, দেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক আছে। তথাপি এরূপ দুরবস্থার কারণ কি—বুঝিলাম না। কনকপুর নসীপুর ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। দেবসেবার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে,—নসীপুর রাজষ্টেট, না দেবীর পূজারী ও সেবক-বৃন্দ ?

২১ নং জগন্নাথপুরের গড়।
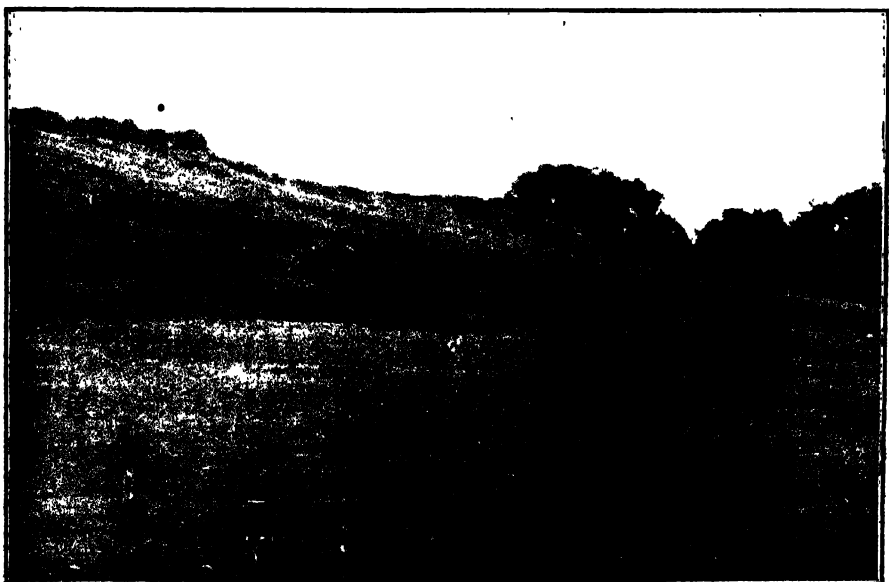
২২ নং নলহাটীর পাহাড় ও দেবীর মন্দির

বা মলয়াদহ ও ময়নাকুণ্ড বা ময়নাকুঁড় নামে খ্যাত। মলয়দহের উপরিস্থিত (দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী) একটি ধ্বংসস্তূপকে লোকে "মল্লেশ্বরী" দেবীর ভগ্নমন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মন্দিরের দক্ষিণে 'হাদারী (হাজারী?) গড়ে' নামে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। একটি সুড়ঙ্গের দ্বারা মলয়াদহ ও হাজারীগড়ে পরস্পর সংযুক্ত ছিল, এবং সেই সুড়ঙ্গ-পথে নাকি যাতায়াত চলিত, এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এখনো অনেকেই সেই সুড়ঙ্গের স্থান নির্ণয় করিয়া থাকে। গ্রামের উত্তরপশ্চিম কোণে 'দামোদরা' নামে পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি অনতিক্ষুদ্র ধ্বংসস্তূপে, একটি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও কয়েকটি শিবলিঙ্গ পতিত রহিয়াছে। ভগ্ন মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে পরশু হস্তে গণেশ ও বাম পার্শ্বে একটি দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এতদ্ভিন্ন তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারদেশের কয়েকটি ভগ্নাংশ (পাথরের চৌকাঠ?) এবং অপর দুই একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি অশ্বত্থ-মূলে 'বসন্তবৈরী' দেবীর পূজা হয়। দেবীর কোনো মূর্ত্তি নাই। এই স্থানে একটি হর-গৌরীর ভগ্ন মূর্ত্তি এবং দহের নিকটে একটি "গোলা ঢালা ছাঁচ পাঁথর" দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্ত-বৈরী—বোধ হয় শীতলা দেবী। গ্রাম খানি প্রাচীন; এই সমস্ত কীর্ত্তি-নিদর্শ-নের সহিত রাজা উদয়নারায়ণের কোনো সম্বন্ধ নাই। তবে ইহা কি মল্লারপুরের মল্লরাজের রাজ্যসীমান্ত ছিল?

মল্লাইপুর বা মল্লারপুরের পরিচয়

মলয়পুরের দেবদেবী

কনকপুরের পশ্চিমে 'মুণ্ডমালার মাঠ' বা "মুড়মুড়ে ডাঙ্গা" নামক বিস্তৃত প্রান্তর। এই স্থানেই রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতি গোলাম মহম্মদ ও কালুয়ার সহিত, মুর্শিদকুলিখাঁর প্রেরিত সেনাপতি মহম্মদজান ও লহরীমালের যুদ্ধ হইয়াছিল: এই পার্ব্বত্য-প্রান্তরের পূর্ব্বে জগন্নাথপুর গড়। এই গড়ের মধ্যে এখন একটি আস্তানা আছে, নাম 'সামন্দিন সাহেবের দরগা'। উদয়নারায়ণ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে পর, সামন্দিন ফকির সাহেব এই পরিখা-প্রাকার পরিবেষ্টিত গড়ে আসিয়া আস্তানা স্থাপন করেন। এই ফকির মুর্শিদের সমসাময়িক, এবং তিনি ইহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। জগন্নাথপুর গড়ের পরিখাদির চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগন্নাথপুর গড়ের পশ্চিমে বীরকিটী বা বীরখ্যাতির গড়, এবং তাহার পশ্চিমে দেবীনগর। এই তিনটি গড়ই রাজা উদয়নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত। দেবীনগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তথায় একটি পুষ্করিণীমধ্যে তাঁহার জোড়া 'বাঙ্গালা' নামক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং 'হংস-সরোবর' নামে একটি সরোবর আছে। হংস-সরোবরের অদূরে একটি স্নানাগার

মুণ্ডমালার মাঠ (রণভূমি)

জগন্নাথপুরের গড় পীরের দরগা

বীরকিটী ও দেবীনগরের পরিচয়

রহিয়াছে, দেখিতে বড় ইন্দারার মত। শুনিতে পাওয়া যায়, হংস-সরোবর হইতে নহরের মধ্য দিয়া জল আসিয়া ঐ স্নানাগারে পড়িত; এবং সিঁড়ি বাহিয়া অবতরণ করিয়া উদয়ের অন্তঃপুরচারিণীগণ তথায় স্নান সমাপন করিতেন। বীর-কিটীর গড়-বাড়ী একটি অনতি উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাহাড়ের নীচে পরিখা খনন করাইয়া উদয়নারায়ণ এই ক্ষুদ্র দুর্গটিকে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ অনেক সময় দেবী-নগরেই অব-স্থিতি করিতেন। কতক সৈন্যসহ তাঁহার সেনাপতি গোলাম মহম্মদ ও কালুয়া বীরকিটীর গড়েই অবস্থান করিত। অধিকাংশ সৈন্য জগন্নাথপুরের গড়েই থাকিত। যুদ্ধের সময়ে রাজা আসিয়া বীরকিটীর গড়ে বাস করেন, এবং নবাব-সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য সেনাপতিদ্বয়কে অধিকাংশ সৈন্যসহ জগন্নাথপুরের গড়ে প্রেরণ করেন।

রাজা উদয়নারায়ণের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়

আমরা সংক্ষেপে রাজা উদয়নারায়ণের পরিচয়-কাহিনী বিবৃত করিতেছি।(৪) "লালা উপাধিধারী শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ অনেক দিন হইতে রাজ-সাহীর জমিদারী ভোগ করিতেন। তাঁহারা রায় উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। এই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে রাজা উদয়নারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। (মুর্শিদাবাদ) বড় নগরের নিকটস্থ বিনোদ নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজা উদয়নারায়ণের সময় বড়নগর রাজধানীর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত গণকর গ্রামবাসী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ঘনশ্যাম রায়ের কন্যা 'শ্রীমতীর' পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে উদয়নারায়ণের সাহেবরাম নামে একটি পুত্রের জন্ম হয়। যে সময়ে মুর্শিদকুলী বাঙ্গালার দেওয়ান ও নবাবরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় উদয়নারায়ণ একজন উপযুক্ত জমিদাররূপে বিখ্যাত হন। যুদ্ধ-বিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ পার-দর্শিতা ছিল। মুর্শিদকুলীখাঁ রাজসাহীর পূর্ব্ব আয়তন বৃদ্ধি করিয়া রাজা উদয়-নারায়ণের প্রতিই তাহার রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন। রাজার সাহায্যের জন্য কুলীখাঁ, গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদারের অধীন দুই শত অশ্বারোহী সৈন্যও প্রদান করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ তাহাদের সাহায্যে আপনার জমিদারীর মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজস্বসংগ্রহের কার্য্য উত্তমরূপেই পরিচালনা করিতেছিলেন। এই সময়ে মুর্শিদকুলী নাজিমী পদ প্রাপ্ত হইয়া

(৪) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

যখন জমিদারী বন্দোবস্তে কঠোরতা প্রকাশ আরম্ভ করেন, তখন উদয়নারায়ণের সহিত ক্রমশঃ তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। উদয়নারায়ণ নবাবের কঠোর নীতির অনুমোদনে প্রস্তুত ছিলেন না। তৎকালে রাজসাহী সমস্ত জমিদারীর প্রধান থাকায়, এবং উদয়নারায়ণ তাহার উপযুক্ত জমিদার হওয়ায় মুর্শিদকুলী সহজে তাঁহাকে বশে আনিতে পারিলেন না। সহসা এক সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করায়, গোলাম মহম্মদ রাজা উদয়নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণ অনেক দিন হইতে বেতন প্রাপ্ত না হওয়ায়, প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। উদয়নারায়ণ তাহার প্রতিকার করিতে না পারাতে সে কথা নবাবের কর্ণগোচর হইল, এবং সেই সময় রাজসাহী প্রদেশের রাজস্ব অনাদায় থাকায় নবাব উদয়নারায়ণের দমনের ইচ্ছায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার শাসনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিলে জমিদারী বন্দোবস্তের কঠোরতা তাঁহাকে পদে পদে ভোগ করিতে হইবে। এরূপস্থলে নবাবের অধীনতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সীতারামের নির্য্যাতন হইয়াছিল, তথাপি নবাবের কঠোরতা অসহ্য বোধ করিয়া উদয়নারায়ণ স্বাধীন হইতে ইচ্ছুক হইলেন। বাঙ্গলা ১১২১ সালের প্রথমে বা ১৭১৪ খৃঃ অঃ বড়নগর ত্যাগ করিয়া তিনি স্বীয় জমিদারী মধ্যস্থ সুলতানাবাদ পরগণার বীরকিটী নামক স্থানের গড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সুলতানাবাদ পরগণার চারিদিকে পর্ব্বত ও জঙ্গল থাকায় তাহা দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার বীরকিটী ও দেবীনগরে রাজা আপনার বাসভবন স্থাপন করেন। * * * রাজা উদয়নারায়ণ জগন্নাথপুরের গড়ে সৈন্য স্থাপন করিয়া নিজে সপরিবারে বীরকিটীর রাজবাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদার সেই সময় অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জগন্নাথপুরের গড়ে অবস্থিতি করিতেছিল। নবাবের সেনাপতি মহম্মদজান ও লহরীমাল সৈন্য লইয়া অনেক কষ্টে জঙ্গল ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া জগন্নাথপুরের গড়ের নিকটে উপস্থিত হয়। তাহাদের সঙ্গে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম ও নাটোরের রঘুনন্দনও আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। রঘুরামের পিতা রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে

উদয়নারায়ণের বড়নগর-ত্যাগ ও রণসজ্জা

মুর্শিদের সৈন্য-প্রেরণ

৫

অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। পুত্র রঘুরামও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। যোদ্ধা বলিয়া রঘুরামের খ্যাতি থাকায়—সাধারণে তাঁহাকে রঘুবীর বলিত। রঘুরাম নবাবের আদেশে লহরীমালের অনুবর্ত্তী হন, রঘুনন্দনও নবাব-সৈন্যের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। জগন্নাথপুরগড়ের সমীপে একটি উচ্চ প্রশস্ত পার্ব্বত্য-প্রান্তরের নিকট নবাব-সৈন্যেরা শিবির সন্নিবেশ করে। নবাব-সৈন্যের আগমন শুনিয়া গোলাম মহম্মদ সসৈন্যে দুর্গ হইতে বহির্গত হয়, এবং লহরীমালও নবাব-সৈন্যের অগ্রণী হইয়া শিবির সম্মুখস্থ প্রান্তরে গোলাম মহম্মদের সম্মুখীন হয়। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। সেই যুদ্ধে গোলাম মহম্মদকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। রাজা উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেবরামও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন। * * ,উদয়নারায়ণ ও সাহেব-রাম সপরিবারে বীরকিটী হইতে পলায়ন করিয়া মহেশপুর, উদয়নগর, পাথরিয়া ও পরিশেষে দেবীনগরের বাস-ভবনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব-সৈন্যেরা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, অবশেষে তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে লইয়া যায়। তথায় অনেক দিন তাঁহাদিগকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর সাহেবরাম সুলতানাবাদ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পকাল পরে তাহাও তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়। উদয়নারায়ণ ও তদ্বংশীয়দিগকে রাজসাহী-জমিদারী হইতে বঞ্চিত করিয়া অবশেষে তাহা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনকে প্রদান করা হইয়াছিল। তদবধি নাটোরবংশ রাজসাহীর রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ক্রমে সুলতানাবাদ পরগণাও তাঁহাদের হস্তগত হয়। উদয়নারায়ণ একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জক, পরহিত-রত ও স্বধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি অনেক সৎকীর্ত্তি তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বীরকিটীর রাধাগোবিন্দ, বন নওগাঁ গ্রামের গিরিধারী প্রভৃতি মূর্ত্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই স্থাপিত মদনগোপাল-মূর্ত্তি অদ্যাপি বড়নগরে নাটোর-রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। বীরভূম জেলায় রামপুরহাট উপবিভাগের অন্তর্গত কনকপুর গ্রামে অপরাজিতা নামে যে প্রাচীন দেবতা আছেন, রাজা উদয়নারায়ণ তাঁহার মন্দিরাদি সংস্কার করিয়া দেবীর সেবার সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অপরাজিতা ঐ অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ দেবতা"।

রাজা উদয়নারায়ণ ও নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সৈন্যগণের সম্মুখ-যুদ্ধ

সপরিবারে রাজা উদয়নারায়ণের বন্দীত্ব, সাহেবরামের মুক্তি, জমিদারী-প্রাপ্তি, ও পুনর্নিগ্রহ-ভোগ

নাটোরের রাজসাহী-প্রাপ্তি

উদয়নারায়ণের গুণাবলী ও তাঁহার সৎকীর্ত্তি-সমূহ

মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর পরিশিষ্টে উদয়নারায়ণের শ্যালক-পুত্র রাজারামশর্ম্মার যে ভাবোত্তর খানি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার এক স্থানে আছে "তদনন্তর সমাচার

কয়েক বৎসর পরে সন ১১২০ সালের আখেরি সন ১১২১ একইশ সালের প্রথম লালা উদয়নারায়ণ রায় জাফর খাঁ সুবা সহিত পাতসাহীতে কমরবন্দি করিয়া গলিম হইলা"। নিখিলবাবু তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "বাঙ্গলা ১১২১ সালের প্রথমে বা ১৭১৪ খৃঃ বড়নগর পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যস্থ সুলতানাবাদ পরগণায় বীরকিটী নামক স্থানের গড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।" ১১২১ সালের প্রথমেই যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধেই উদয়নারায়ণ বন্দী হন। সুতরাং ১১২১ সালের প্রথমেই তাঁহার বীরকিটীতে আগমন কল্পনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদকুলীর স্বভাব তিনি জানিতেন, এবং তাঁহার কার্য্যপদ্ধতিও যে তিনি তীব্র-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, ইহা অনুমান না করিয়াও বলা যাইতে পারে। সুতরাং মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী বড়নগরে-বাস যখন রাজার পক্ষে নিরাপদ ছিল না, তখন তিনি যে বহু পূর্ব্ব হইতে স্বপ্রতিষ্ঠিত দুর্গম দুর্গ দেবীনগরে উঠিয়া আসিয়া বাস করিতেছিলেন, ইহাই স্বাভাবিক। তারপর দেবীনগর হইতে তিনি বীরকিটীতে আসিয়া বাস করেন। কারণ বীরকিটী, জগন্নাথপুরগড় ও দেবীনগরের মধ্যবর্ত্তী। আমরা প্রবাদ-পরম্পরা হইতে অবগত হই—সেনাপতি কালিয়া বা কালুয়া জগন্নাথ-পুরের যুদ্ধে নিহত হয়। তার পর বীরকিটীতে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে সেনাপতি গোলাম মহম্মদের মৃত্যু হয় এবং রাজকুমার সাহেবরাম পরাজিত হন। অতঃপর দেবীনগর, অবশেষে গুমা-পাহাড়ের যুদ্ধে উদয়নারায়ণ বন্দী হন। দেবীনগরের জোড়বাঙ্গলা পুষ্করিণীতে রাজকুমার সাহেবরাম আত্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। আমাদের অনুমান হয়,—২য় বার সুলতানাবাদের জমিদারী স্বত্ব পাইয়া পুনরায় যখন তিনি মুর্শিদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন, এবং তাহার ফলে সুলতানাবাদের অধিকার তাঁহার হস্তচ্যুত হয়—সেই সময় পূর্ব্ব-নিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া, আবার অপমানিত হইবার আশঙ্কায় তিনি প্রাগুক্ত শোচনীয় মৃত্যুর কবলগত হইয়াছিলেন। কনকপুর অঞ্চলে প্রবাদ "রঘুনন্দনের চক্রান্তই রাজকুমারের সুলতানাবাদের অধিকারচ্যুতির প্রধান কারণ। রাজসাহী হস্তগত করিয়া পার্শ্বস্থিত সুলতানাবাদের উপর তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হয়, এবং মুর্শিদের সোহাগের সুযোগ পাইয়া তিনি এইরূপে একটি ব্রাহ্মণ-রাজবংশ লোপের হেতুভূত হন।" উত্তরকালে বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীকে রঘুনন্দনের কৃত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ তাহার উপলক্ষ্য হইয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণের বীরকীটী বা দেবীনগরে আগমনকাল-নির্ণয়

যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবাদ

সাহেবরামের আত্মহত্যা

রঘুনন্দনের চক্রান্ত

নাথপাহাড়ে গোবর্দ্ধনধারী

নলহাটীর প্রায় ৮।১০ মাইল পশ্চিমে নাথ-পাহাড় নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এক সময় নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীগণ এই পাহাড়ে বাস করিতেন। তাঁহাদেরই নামানুসারে পাহাড়ের নাম "নাথ-পাহাড়" হয়। রাজা উদয়নারায়ণ এই পাহাড়ে গিরিধারী বা গোবর্দ্ধনধারী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, তদবধি এই পাহাড় গোবর্দ্ধন-পাহাড় নামেও আখ্যাত হয়। পাহাড়ের উপর বিগ্রহের ভগ্ন মন্দিরাদি পতিত রহিয়াছে। বিগ্রহের নামে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, বলা বাহুল্য তাহা রাজা উদয়নারায়ণের প্রদত্ত। রাজবংশ বিলোপের পর, বন-নব গ্রামের সেবাইতগণ বিগ্রহকে আপনাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্থাপন করিয়াছেন। বন-নবগ্রাম নাথপাহাড়ের অনতি পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমান—বীরভূমের অনেকাংশ রাজা উদয়নারায়ণের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। বীরভূমের কতকাংশ লইয়া রাজসাহী নামক পরগণা এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাজা উদয়-নারায়ণের দানপত্র

রাজার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর আদি নিষ্কর সম্পত্তি এখনো বীরভূমের বহু ব্রাহ্মণ ভোগ করিতেছেন। আমরা একখানি 'তায়দাদ' (ছাড়পত্র)এর নকল এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। (৫) ইহাতে তিন জন জমিদারের নাম পাওয়া যায়। এই তিন জন জমিদারই বহু সৎকীর্ত্তির জন্য বীরভূমে আজিও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁরা আনুমানিক কুড়ি পঁচিশবৎসর অগ্রপশ্চাতে বর্ত্তমান ছিলেন। জমিদারগণের নাম, ১ম লালা উদয়নারায়ণ রায়, ২য় রাজা রামজীবন রায়, ৩য় রামরায় চৌধুরী। রাজা রামজীবন রায় ঢেকার জমিদার ছিলেন, রামরায় চৌধুরী গয়তার জমিদার ছিলেন। উভয় স্থানই বীরভূমের অন্তর্গত। যথাস্থানে ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

---

(৫) বীরভূম বাড়টিয়া নিবাসি শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সনন্দখানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

নকল মোতাবেক আসল মোকাবিলা শুদ—
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মিত্র সিরিস্তাদার আমিন নবিশ।

(১) ইয়াদ দাস্ত কৈফিয়ত জমি লাখেরাজ ব্রহ্মত্তর মতালকে জিলা মরসিদাবাদ সন ১২০৮ সাল তারিখ

কিপ্রকারের সনন্দ	কাহার হাতে সনন্দ পাইয়াছ তাহার কি হক ছিল	সনন্দ কিম্বা দানের সন তারিখ	কোন * * দান হইয়াছে তাহার মিয়াদ মুদ্দত কি	ভূমিগৃহিতার নাম		কি প্রকারের ভূমিতে দখল পাইয়াছ কি সম্পর্ক রাখি, এবং দখলের সন তারিখ	যে যে মৌজে যে যে মৌজের সামিল জমিন থাকে তাহার নাম বকেয় পরগণা
ব্রহ্মত্তর	লালা উদয়-নারায়ণ রায় জমিদার	অনেক দিনের বিষয় ইহার সন তারিখ জ্ঞাত নহি	পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ব্রহ্মত্তর দিয়াছেন	* *	* *	ভূমিগৃহিতা আমার পিতা সনন্দ পাইয়া দখল ভোগ করিয়া সন ১১৭১ সালে মাহ ফাল্গুন তাঁহার ৺প্রাপ্তি হইলে আমি দখল করি	পরগণে ধাওয়া মোঃ হরিওকা
আয়োজন	রাজা রামজীবন রায় জমিদার	তস্য	তস্য	* *	* *	ভূমি গৃহিতা আমার মাতামহ * * * ১১৫৮ সাল আমায় ব্রহ্মত্তর দিয়াছেন	পরগণে নওয়া-নগর। মোঃ চাঠরা
আয়োজন	রায় রায় রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার	তস্য	তস্য	* *	* *	ভূমিগৃহিতা আমার মাতুল * * * ১১৬৮সালে আমাকে ব্রহ্মত্তর দিয়াছেন।	পরগণে সাহাজাদ-পুর। মোঃ বাউটে

(১) এই তালাজের প্রয়োজনীয় অংশমাত্র উদ্ধৃত হইল।

নলহাটী-কাহিনী

"নলাহট্টাং নলাপাতো যোগেশো নাম ভৈরবঃ।
কালিকা দেবতা তত্র, তত্র সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ" ॥
(পীঠমালা মহাতন্ত্র)

নলহাটী পরিচয়

নলহাটী রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি ষ্টেশন স্থাপিত হওয়ায়, এই স্থান এখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে নলহাটীর বাজার। রেলপথ স্থাপিত হওয়ার পর কতকগুলি পশ্চিম দেশীয় (ভকত) বণিক্ এবং কতকগুলি এ দেশীয় ব্যবসায়ী ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে বাস করায় এই বাজারের সৃষ্টি হইয়াছে। নলহাটী গ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে। গ্রামের দক্ষিণে কতকগুলি মুসলমান, মাল, লেট, ও ভূঁইমালী প্রভৃতি জাতির বাস। মধ্যভাগে পুলিশ থানা, সাবরেজেষ্টারী অফিস, ডাক-বাঙ্গলা, নলহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও নূতন বাজার প্রভৃতি। গ্রামের পশ্চিমাংশে ক্ষুদ্র পাহাড়, পাহাড়ের উপর পার্ব্বতীদেবীর মন্দির। উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি কর্ম্মকার (ইহারা কাঁসার বাসন প্রস্তুত করে), নুনিয়া-বণিক্ ও লেট্ প্রভৃতি জাতি বাস করে।

নলহাটী পাহাড়

পাহাড়ের অগ্নিকোণে দেবীর মন্দির। দেবী-মন্দিরের অনতিদূরে (পাহাড়ের উপরে) একটি মসজিদ ও তাহার নিকটে 'আনা সহিদ' পীরের সমাধির স্থান। শেষ পশ্চিম ভাগে একটি ক্ষুদ্র দুর্গের বিলুপ্তাবশেষ বর্ত্তমান। এখনো দুর্গের পরিখা ও প্রাচীরের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গ-নিম্নে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে (পাহাড়ের নীচে) একটি ঝরণা আছে। ঝরণার অবিশ্রান্ত প্রবাহিত জলরাশি পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী নিম্ন ভূমিখণ্ডকে প্লাবিত করিতেছে। এই ঝরণার জল পূর্ব্বে সুপেয় এবং অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল। বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট আহমদ সাহেব মহাশয় ঝরণার চতুর্দ্দিক গোলাকার ইষ্টক-প্রাচীরে এবং উপরিভাগ লৌহ-জালে আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়ায় এখন নাকি তাহার পূর্ব্বগুণ বিনষ্ট হইয়াছে। যে কারণেই হউক সম্প্রতি ঐ ঝরণার জল কেহ ব্যবহার করে না।

তন্ত্রে উল্লিখিত আছে, বিষ্ণুচক্র-কর্ত্তিত সতী-দেহাংশ নলা (নলো, কনুইয়ের নিম্নভাগ) পতিত হওয়ায় নলহাটীতে দেবী কালিকা এবং ভৈরব যোগেশ অধিষ্ঠান করেন। কেহ কেহ বলেন, এখানে দেবীর 'ললাট' পতিত হইয়াছিল, তাই দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। আমাদের মনে হয় "নলহাট্টেশ্বরী" হইতে অপভ্রংশে "ললাটেশ্বরী" নাম প্রচলিত হইয়াছে, কারণ তন্ত্রে নলাপাতের কথাই উল্লিখিত আছে। পাহাড়ে (পর্ব্বতে) অধিষ্ঠিতা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী নামেও পরিচিতা হইয়াছেন। পাহাড়ের উপরে দেবীর মন্দির, দৃশ্যটি বড় সুন্দর ! মন্দিরে কোনো মূর্ত্তি নাই, একটি স্বভাবসম্ভূত পাষাণখণ্ডের আধারে দেবীর পূজা হয়। কনকপুরের স্বর্গীয় রামনাথ ভাদুড়ী মহাশয় দেবীর নামে কয়েক শত বিঘা ভূমি দান করিয়া সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে পূজক, চণ্ডীপাঠক, পরিচারক, পাচক, মন্দিরমার্জ্জনকারী, পুষ্প-সংগ্রাহক, পাইক, কাষ্ঠ-আহরণকারী, দুগ্ধ ও মৎস্যের জোগানদার প্রভৃতি কতকাংশ "চাকরাণ" ভোগ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চাকরাণ ভিন্ন প্রায় শতাধিক বিঘা জমি দেবীর ভোগের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে ; ভোগের নিয়ম— মধ্যাহ্নে পাঁচসের আতপের অন্ন ও তদুপযুক্ত ব্যঞ্জনাদি, এবং সন্ধ্যায় পাঁচ পোয়া ময়দার লুচি ও মিষ্টান্ন, প্রত্যহ দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাহ্নে আতপের নৈবেদ্য দিয়া দেবীর পূজা হয়। (১) ভোগে নিত্য আমিষের (মৎস্যের) প্রয়োজন। শারদীয়া মহাপূজার সময় দেবীর বিশেষ পূজা হয়। দেবীর

নলহাট্টেশ্বরী দেবী

দেবোত্তর সম্পত্তি ও দেবসেবা

(১) মধ্যে একবার দেবসেবার অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। সুকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন কার্য্যোপলক্ষে নলহাটীতে বাস করেন, সেই সময় এই বিষয়টি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি জানিতে পারেন যে অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি পাণ্ডারা পৈতৃক লাখেরাজ বলিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, এবং বাকী সম্পত্তির আয় দেবতাকে ফাঁকি দিয়া নিজেরা ভোগ করিতেছে। কিয়দ্দিবস অনুসন্ধান করিয়া বহু চেষ্টার পর তিনি পঞ্চাশ বিঘা আন্দাজ জমি উদ্ধার করেন, এবং পৃথক্ জোতদার বন্দোবস্ত করিয়া দেবতার নামোল্লেখে কবুলতি গ্রহণ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় নসীপুর রাজষ্টেট হইতে মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হয়। নবীন বাবুর তত্ত্বাবধানে দেবসেবার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পরে নসীপুর রাজষ্টেটের সহিত মনোমালিন্য ফলে তিনি এই কার্য্যের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি নসীপুরের নিয়োজিত একজন কর্ম্মচারী দেবসেবার তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু সেবাকার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নলহাটী গিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া দুঃখিত চিত্তেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

সম্মুখে ছাগ, মেষ আদি বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। নলহাটী অঞ্চলের হিন্দু জনসাধারণ, স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তন-কামনায় নলহাটীতে আগত (হিন্দু) স্বাস্থ্যান্বেষী ও তীর্থদর্শনার্থীগণ প্রায়ই সময়ে সময়ে সমারোহের সহিত দেবীর পূজা দিয়া থাকেন।

নলহাটীতে মসজিদ ও মুসলমানের বাস

মসজিদটি প্রায় ত্রিশ চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। পাহাড়ের উপরে সমাহিত আনা সহিদ পীরের কাহিনী কেহ বলিতে পারে না। কতদিন হইল মুসলমানগণ এখানে বাস করিয়াছে, তাহাও কেহ অবগত নহে। অনেকের অনুমান, বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ব্বে এখানে মুসলমানের বাস ছিল না। হাঙ্গামার সময় লুঠ-তরাজের লোভে, এই পাহাড়-অঞ্চল নিরাপদ স্থান ভাবিয়া নলহাটীর বর্ত্তমান অধিবাসী মুসলমান-কৃষকগণের পূর্ব্বপুরুষেরা এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই নলহাটী যে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং স্থানটিতে দস্যু-তস্করের আড্ডা হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। (২) নলহাটীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান গ্রামগুলি এখনো প্রায় হিন্দুপ্রধান। সুতরাং এখানে মুসলমানের বাস যে অধিক দিনের নহে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

নলহাটীতে বর্গী

বর্গীর হাঙ্গামার সময় বীরভূম বর্গীগণের একটী প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। বীরভূমের বহুস্থানে বর্গীর গড় বর্ত্তমান আছে। বর্গীর ভয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ ও জমিদারগুণের আত্মহত্যাকাহিনী বীরভূমের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। বর্গীরা বীরভূমের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে, বর্গীর অত্যাচারে বীরভূমের বহু ধন-জন বিনষ্ট হইয়াছে। বর্গীর দলে মীরহবীবের নেতৃত্বে বহু মুসলমান যোগদান করিয়াছিল। লুণ্ঠনে, অত্যাচারে কেহই কম ছিল না। যেমন বর্গী, তেমনই তাহাদের দলভুক্ত মুসলমান,—উভয়েই সমান! লুণ্ঠনরত হিন্দু-বর্গীগণ গ্রামসমূহকে অগ্নিমুখে, এবং বাল-বৃদ্ধ-যুবা নির্ব্বিশেষে নরনারী সমূহকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইত; মুসলমান বর্গীগণ ঐ সমস্ত করিয়া, উপরন্তু হিন্দু দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরাদি ধ্বংস করিত। আমাদের শ্লাঘার কথা একজন মুসলমান নবাব, হিন্দু-মুসলমান এই উভয় বর্গীকেই দূরীভূত করিয়াছিলেন। নলহাটীতে

(২) নলহাটীতে দুইটি পুষ্করিণী আছে, একটির নাম ডাকাতে' আর একটীর নাম খুন কেলা। প্রবাদ, ডাকাইত, বা ডাকাতে পুকুরে ডাকাইতগণ চোরাই মাল ডুবাইয়া রাখিত, এবং পুকুরের নিকট কালীপূজা করিত। লুণ্ঠন করিতে গিয়া তাহারা যে সমস্ত হতভাগ্যগণকে নিহত করিত, তাহাদের শবদেহ ঐ খুন-কেলা পুকুরে সমাহিত হইত।

নবাব-সৈন্যের সঙ্গে বর্গীর একটি খণ্ডযুদ্ধের প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নলহাটীর পাহাড়ের উপরে যে গড়ের কথা বলিয়াছি, সেই গড়ে বর্গীদের একটা থানা ছিল। গড়টি বহুদিনের পুরাতন। সেটীকে কোনোরূপে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়া, বর্গীগণ তথায় বহু দিন বাস করিয়াছিল। বোধ হয় নবাব-সৈন্যের তাড়া খাইয়া তাহারা পাহাড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে স্থানীয় অনেক লাঠিয়ালও বর্গীদের বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। অনেকেই বলেন, পাহাড়ের উপরে যে পীরের সমাধি আছে, তিনি বর্গীদের বিপক্ষেই যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

নলহাটীর প্রাচীন পরিচয় ও নলরাজার কথা

নলহাটীর দক্ষিণাংশে (মুসলমান-পল্লীতে) প্রায় পঞ্চাশ বিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটি ধ্বংসস্তূপের উপরেই সম্প্রতি মুসলমানগণ বাস করিতেছে। এইস্থানে প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহভিত্তি আদির বহুল চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিখার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধ্বংসস্তূপ "নলরাজার বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাহাড়ের উপরে যে গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান আছে, যে গড় বর্গীরা সংস্কার করিয়া লইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই গড়ও নলরাজার গড় নামেই বিখ্যাত। প্রাচীন কাগজপত্র হইতে নলহাটীর নিম্নলিখিত পুরাতন অংশগুলির নাম পাওয়া যায়। যথা—কালিন্দীপুর, বিধুপাড়া, নরসিংহপুর, বিদ্যাভূষণবাটী, গোপীনাথপুর, রামকৃষ্ণবাটী, জ্যোতিনিধি, মনোহরপুর, ভবানন্দবাটী ইত্যাদি। প্রাচীন পুষ্করিণীগুলির নাম—শিলী-পুষ্করিণী, গণকর, দীঘি, বীরশর্ম্মা, বা বীর-শর্ম্মা, নলপুকুর, বলিহার, হাজরা, ডাকাতে', খুন ফেলা, চমরী দাস, মুকুলা, নিছনী, সাহানা, বাঘাজুলি, গোপ্তা ইত্যাদি। এই সমস্ত নামের মধ্যে অনেক-গুলি নাম প্রাচীনকালের বলিয়া মনে হয়। নল-পুষ্করিণীটি নলরাজার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

নলহাটী নামের ব্যুৎপত্তি

আমাদের অনুমান হয় নলরাজার নামানু-সারেই 'নলহাটী' নাম হইয়াছে। দেবীর দেহাংশ পতিত হওয়ায় এই স্থানের নাম নলহাটী হইলে, তন্ত্রে "নলহট্টাং নলা পাতো" লিখিত হইত না। ইহার পূর্ব্বনাম কিছু থাকিলে তন্ত্রে তাহারই উল্লেখ থাকিত। নলরাজগণের পূর্ব্বে এই স্থান কোন্ নামে অভিহিত হইত, জানিবার কোনো উপায় নাই।

সন্ধিগড় বাজারে নলরাজা

থানা মৌড়েশ্বরের অধীন 'সন্ধিগড় বাজার' নামে একখানি অনতিবৃহৎ গ্রাম আছে। বীরভূমের মানচিত্রে এই গ্রাম 'সিন্ধুগড়' নামে উল্লিখিত হই-য়াছে। এই গ্রামে নলরাজার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে। প্রবাদ —এই স্থানে নলরাজার রাজবাটী ছিল। গ্রামে 'নলপুষ্করিণী' নামে একটি

পুষ্করিণী আছে; সেইটি রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর-সংলগ্ন পুষ্করিণী। রাজার ধনাগার এখন ধনগাছীর মাঠ নামে খ্যাত। এখন যথায় 'দেউড়ী' নামে পুষ্করিণী রহিয়াছে, সেই স্থানেই রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার ছিল, এবং তথায় প্রতিহারীগণ বাস করিত। রাজার সেনাপতির নাম ছিল 'কোচাইমল্ল'। সেনাপতির নামানুসারেও গ্রামে 'কোচাইমল্ল' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। গ্রামে গড়ের অস্তিত্বজ্ঞাপক পরিখা-চিহ্নাদিরও অভাব নাই। গ্রামের প্রান্তে একটি বিস্তৃত স্থান এখনো 'কোট্‌শাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়—এই স্থানে পূর্ব্বে অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। বর্গীর হাঙ্গামার সময় কর্ম্মকারগণ সন্ধিগড় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তাহাদের বংশধরগণ নাকি এখন (বীরভূমের) মোলপুর গ্রামে বাস করিতেছে। মোলপুরের কর্ম্মকারগণ সন্ধিগড় বা নলরাজার সম্বন্ধে কোনো প্রাচীন তথ্য অবগত নহে। এই গ্রামে দেব-দেবীর বহু ভগ্নমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ভগ্ন বাসুদেবমূর্ত্তি, একটি ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ গণেশমূর্ত্তি, ও তিন চারিটি হর-গৌরী মূর্ত্তি দেখিলে চিনিতে পারা যায়। একটি হর-গৌরীর যুগলমূর্ত্তির বাহন দুইটির (বৃষভ ও সিংহ) মধ্যে একটি দ্বিভুজ-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এরূপ মূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধিগড়-বাজার গ্রাম খানি হিন্দু প্রধান।

বীরভূমে নলরাজ-বংশ

'গৌড়ের ইতিহাস'-প্রণেতা স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ডে (১৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন "খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নলরাজগণ বীরভূম-অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন"। কিন্তু তিনি ইহার সমর্থক কোনো প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে নলপুরে (রাজপুতনার অন্তর্গত বর্ত্তমান নরবার বা নরওয়ার অঞ্চলে) নলবংশীয় রাজগণ বর্ত্তমান ছিলেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া-পাহাড়ে যে চন্দ্রবর্ম্মা নরপতির শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার বাস ছিল রাজপুতনার পুষ্করণা (পোকর্ণ) নামক স্থানে। সুতরাং রাজপুতনা হইতে নল-রাজগণের দিগ্বিজয়ার্থ এতদঞ্চলে আগমন অসম্ভব ব্যাপার নহে। হইতে পারে দিগ্বিজয়ে আগমন করিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ রাঢ়ে স্থায়ীভাবে বাস-স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উক্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রেমিক-কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুরেও নলরাজ-সম্বন্ধীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানেও 'নলগড়ে' পুষ্করিণী, বিস্তৃত গড়খাই পরিবেষ্টিত গড়ের চিহ্ন প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহাই সম্ভব, যে

প্রাচীনকালে নলবংশীয় রাজগণ বীরভূম-অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন; বীরভূমের নলহাটী, সন্ধিগড়-বাজার, ও নাম্নূর প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, অথবা একই সময়ে এই তিন স্থানে তাঁহাদের শাসন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

নলহাটীর উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়

নলহাটীর উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে "হরিপ্রসাদ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়"এর নাম করিতে পারা যায়। এই বিদ্যালয়টি ইং ১৯১৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপুরহাটের ভূতপূর্ব্ব (মহকুমা) ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের উদ্যোগে এবং নলহাটীর নিকটবর্ত্তী বানিয়র-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাস মহাশয়ের অর্থে এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দাস মহাশয় এই কার্য্যে প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ায় নলহাটী-অঞ্চলের জনসাধারণ বিশেষ-রূপে উপকৃত হইয়াছেন।

বানিয়রগ্রাম

নলহাটীর উত্তর-পশ্চিমে বানিয়র গ্রাম। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, ভট্ট, কায়স্থ, সৎগোপ, তাঁতি, বারুই, গন্ধবণিক্, নাপিত, কুড়োল, কলু, জেলে, ধোপা, মাল, হাড়ি, ডোম, চামার, প্রভৃতি প্রায় ছয়শত লোকের বাস। বানিয়রের ব্রাহ্মণ-জমিদারগণের আদিপুরুষ স্বর্গীয় দুর্গামোহন চৌধুরী, কায়স্থ-জমিদারগণের আদিপুরুষ স্বর্গীয় রতন রায় চৌধুরী, এবং সদ্গোপগণের আদিপুরুষ স্বর্গীয় যাদব মণ্ডলের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। অন্নদানে মুক্তহস্ত যাদব মণ্ডলকে জানিত না, নলহাটী-অঞ্চলে সেকালে এমন লোক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মণ্ডল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কোনো পথিকের অমনি চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না,—কিছু না কিছু আহার করিয়া যাইতে হইত। বিবাহের বর-যাত্রী, তীর্থযাত্রী, যাত্রাওয়ালা, কীর্ত্তনীয়া—এমন কি শব-বাহকগণ পর্য্যন্তও (তা এই সমস্ত দলে যতই কেন লোক থাকুক না) গ্রামে আসিলে, যাদব মণ্ডল অন্ততঃ একবেলার জন্যও তাঁহাদের আতিথেয়তা করিতেন। এখনকার দিনে এরূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কবিহারী দাস এই গ্রামে চারিপুরুষ অবধি বাস কবিতেছেন।

বানিয়র গ্রামের যাদবমণ্ডল

বঙ্কবিহারি দাস

বঙ্কবিহারীর প্রপিতামহ রামদাস দাস নিকটবর্ত্তী সংকেতপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া বানিয়রে বাস করেন। জাতিতে ইহারা তন্তুবায়। রামদাস, পুত্র নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মালদহে রেশমগুটী চালান দিতেন। কার্য্যোপলক্ষে নন্দকুমারকে মালদহে রাখিয়া দেশে ফিরিবার সময়, গঙ্গা ও পদ্মার বিয়োগস্থলে

রামদাস দস্যুহস্তে হত হন। অর্থাদিও লুণ্ঠিত হয়। নন্দকুমার দস্যুভয়ে যাতায়াতের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য পুত্র হরিপ্রসাদের শিবগঞ্জে (মালদহ) বিবাহ দিয়া তাহাকে সেই স্থানেই কিছুদিন রাখিয়া দেন। হরিপ্রসাদ প্রায় দশবৎসর শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া রেশমের কারবারে বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। হরিপ্রসাদের সময় হইতেই দাস-বংশের উন্নতি আরম্ভ হয়। হরিপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র বঙ্কবিহারী। ইনি নলহাটী হইতে বানিয়র পর্য্যন্ত রাস্তা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। মহালে এবং নিজ গ্রামে পুষ্করিণী খনন করাইয়া জল-কষ্ট-নিবারণে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বঙ্কবিহারীর খুল্লতাত-পুত্র শ্রীরাজকৃষ্ণ দাসও গ্রামের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি। ইনিও পুষ্করিণী-খনন, শিব-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দবিগ্রহ-মূর্ত্তি এবং শালগ্রাম-শিলা প্রতিষ্ঠাদি বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্ষাকালে গ্রামের পথে চলিতে হইলে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হয়। পথ-মধ্যবর্ত্তী কোনো কোনো স্থান বহুদিন পর্য্যন্ত আ-জঙ্ঘা গভীর গাঢ়-কর্দ্দমে পরিপূর্ণ থাকে। দাস-পরিবারের কেহ কি গ্রাম-পথে পদার্পণ করেন না, না এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই!

দাসপরিবারের সৎকীর্ত্তি ও গ্রামের দুরবস্থা

নলহাটীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রায় দুই মাইল দূরে পাইক-পাড়া, বা পাক'-পাড়া গ্রাম। এই গ্রামে সেকালে নবাবের দেশীয়-সৈন্যের একটি ছাউনী ছিল বলিয়া গ্রামের নাম পাইক-পাড়া হইয়াছে। সেই সমস্ত দেশীয়-সৈন্যের বংশধর মল্ল বা মাল (বাগদি-জাতি) গণ এখনো পাইক-পাড়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে দেখিয়া এখন আর চিনিবার উপায় নাই যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কখনো যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সংবাদ রাখিত। দেশের বর্ত্তমান আইন, দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়া এই ত্রিদোষ-জনিত ভীষণ-ব্যাধি বীরভূমের এই পুরাতন বীর-জাতিকে উৎসন্ন করিয়াছে। মল্লদের সে স্বাস্থ্য, সে বীরত্ব, সে উদার-নির্ভীক-সারল্য সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে! স্বর্গীয় অনন্তলাল দাস এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। দাস মহাশয় জাতিতে কায়স্থ, তিনি মুর্শিদাবাদ-নবাব-দরবারে চাকুরি করিতেন, এবং কাটোয়া-অঞ্চল হইতে আসিয়া পাইক-পাড়ায় বাস করেন। তাঁহার আমলেও নবাবী পাইকদল (মল্ল বা মালগণ) যুদ্ধের সময় পাইক-পাড়া হইতে গিয়া নবাবের পতাকাতলে উপস্থিত হইত। দাস মহাশয় এই পাইকদলের রসদ সরবরাহ করিতেন। দাস মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষের বারে একটু গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রথমপক্ষ ছিলেন সবর্ণা,

পাইকপাড়া গ্রাম নবাবের দেশীয় সৈন্য মল্লজাতি

অনন্তলাল দাস

অর্থাৎ তাঁহারই সম-শ্রেণীর কোনো সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-বংশ-সম্ভূতা। আর দ্বিতীয়-পক্ষ ছিলেন অসবর্ণা—অর্থাৎ সুবর্ণবণিক্ জাতীয়া। শুনিতে পাওয়া যায়, দাস মহাশয় দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন রূপ-মোহে! এই রূপসী-সুন্দরীর পিত্রালয় ছিল, পাইক-পাড়ার অদূরবর্ত্তী উত্তরে—কোনো একটি পল্লীগ্রামে। নবাব-দরবার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে দাস মহাশয় তাহার রূপ-জালে জড়িত হইয়া, কন্যাপক্ষকে প্রচুর অর্থ-দানে বশীভূত করিয়া, সুন্দরীকে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। দাস মহাশয়ের ঔরসে, তাঁহার সবর্ণা, অসবর্ণা, উভয়পত্নীর গর্ভেই পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে। একে নবাবের কর্ম্মচারী, তাহার উপর অর্থশালী, আবার দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্, ক্রিয়াবান্; অতএব দাস মহাশয় স্বজাতি, পরজাতি—এতদঞ্চলের প্রায় সকলেরই নিকট "প্রবল-প্রতাপেষু" বলিয়াই অভিহিত হইতেন। সুতরাং 'সমাজে চলিতে' তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হয় নাই। তাঁহার উভয়-পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ সকলেই কায়স্থ-সমাজের কন্যাদায়গ্রস্ত-পিতার 'গৌরীদান' গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। দাস মহাশয়ের বংশধরগণ পাইক-পাড়া এবং বানিয়র এই উভয় গ্রামে বাস করিতেছেন। এখন আর কোনো গোলযোগ নাই। তবে মাঝে মাঝে কথা উঠিয়া থাকে;—পাইকপাড়ার কায়স্থগণ বলেন, "আমরাই পিতার সবর্ণা-পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, এবং বানিয়রের কায়স্থগণ সেই অসবর্ণা-দাসীর পুত্র", আবার বানিয়রের কায়স্থগণ বলেন—"আমরাই পিতার সবর্ণা-পত্নীর গর্ভজাত সন্তান, ঐ পাইক-পাড়ার কায়স্থগণই সেই অসবর্ণা-দাসীর * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।" সুখের বিষয় এইরূপ কথাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। অনুমান হয় অনন্ত দাস প্রায় দেড়শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পাইকপাড়ায় অনেকগুলি কায়স্থের বাস, বলা বাহুল্য ইঁহাদের সকলেই অনন্ত দাসের বংশধর নহেন। গ্রামে কয়েকঘর শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোক বাস করেন; কিন্তু গ্রামের রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থা দেখিলে, সে ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ম্যালেরিয়া বিতাড়ন, বিশুদ্ধ পানীয়-জলসংস্থান, গ্রাম্য-পথের সংস্কার প্রভৃতি কয়েকটি—অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমরা গ্রামবাসীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দাস মহাশয়ের অসবর্ণা বিবাহ

সমাজ ও দাস মহাশয়ের বংশধরগণ

গ্রামের দুরবস্থা

মলহাটীর পশ্চিমে অনতিদূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, বীরভূমির সীমান্ত প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে নাথ-পাহাড়ীর উল্লেখ করিয়াছি। (৩)

(৩) কনকপুর কাহিনী।

নাথ-পাহাড়ীর দক্ষিণে "চন্দ্রময়ী-পাহাড়"। প্রকৃতির অযত্ন-বিন্যস্ত অনতি-বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড মিলিয়া এই পাহাড়-শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। কোথাও পাশা-পাশিভাবে, কোথাও উচ্চাবচক্রমে—শৃঙ্খলাহীন স্তর-সন্নিবিষ্ট পাষাণের ধূসর-তরঙ্গ,—স্বচ্ছন্দ-বনজাত তরু-তৃণ-গুল্ম-লতার নিবিড়-সমারোহে নিত্য শ্যামায়-মান হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়,—যেন বন-বিহঙ্গের মধু সঙ্গীতে আকুল হইয়া, ধূসর পাষাণ এই শ্যাম সৌন্দর্য্যের বিপুল পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়ে "চন্দ্রময়ী" নামে এক দেবী আছেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি প্রস্তর-খণ্ডে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই দেবীর নামে কতক-গুলি—দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। দেবীর নিত্য পূজা হয়। পাহাড়ের উত্তরে চন্দ্রা-দিঘী নামে একটি অনতি-বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই চন্দ্রময়ী দেবীর প্রতি-ষ্ঠাতা কে, কে তাঁহার নামে দেবোত্তর-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, চন্দ্রাদীঘি কাহার প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার এখন আর কোনো উপায় নাই। নাম-সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান হয়, বীরনগরের চন্দ্র-পাহাড়ীর চন্দ্রসেন রাজার সঙ্গে এই চন্দ্রময়ী-দেবী ও চন্দ্রা-দীঘির হয়তো কোনো সম্বন্ধ ছিল। পাহাড়ের পাদদেশে (পূর্ব্বদিকে) ভবানন্দপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। পাহাড়ের নাম চন্দ্রময়ী আর গ্রামের নাম ভবানন্দপুর,—অনুসন্ধানে ইহাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

ময়ী-পাহাড়

চন্দ্রময়ী দেবী ও চন্দ্রাদীঘি

ভবানন্দপুর গ্রাম

নলহাটী হইতে ভবানন্দপুর যাইবার পথে 'কানসাল' 'বাউটে' প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র-পল্লী পার হইতে হয়। বাউটে গ্রামে "পুষ্প-নাপিত" (ফুল নাপিত) নামে নাপিত জাতির একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বাস করে। কৃষিকার্য্যই ইহাদের প্রধান জীবিকা। ইহারা ক্ষৌর-ব্যবসায় করে না। শুনিতে পাওয়া যায়—ইহাদেরই স্বজাতীয়গণ অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ-অঞ্চলে 'মোদকের ব্যবসায়ে' জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ইহারা বলে আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ, সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক-মুণ্ডনাদি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হস্তার্পণ করার পর, আর সাধারণ-মানবের ক্ষৌর-কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, মহাপ্রভুর বরে তাহার বংশধরগণ কৃষি বা মোদকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নবশাখগণের মধ্যে সম্মানিত-পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে"। ইতিপূর্ব্বে তীবর বা তীওর, রাজবংশী, কুড়োল প্রভৃতি কয়েকটি জাতির উল্লেখ করিয়াছি। তীবর বা তীওর, ইহারা জেলে-জাতি, মৎস্য-ব্যবসায়ী। পূর্ব্বে যখন সীতাপাহাড়ী প্রভৃতির নিকট দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত, তখন এই

পুষ্পনাপিত-জাতি

জাতি নৌকাজীবি ছিল। নৌকা-চালনায় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অসাধারণ পটুতার অজস্র কাহিনী আজিও প্রবাদের মত লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। (৪) রাজবংশী জাতিও তীবরের সম-শ্রেণী। হিন্দুসমাজে এখন ইহারা মাল, বাগ্‌দী প্রভৃতি অপেক্ষা একটু উন্নত-পর্য্যায়ে অবস্থান করিতেছে। কুড়োল-জাতি সৎগোপ অপেক্ষা একটু নিম্নশ্রেণীর। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ইহাদের রমণীগণ কৃষিজাত-দ্রব্যাদি হাটে-বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, এই কারণেই নাকি সৎগোপ-জাতির সঙ্গে ইহাদের সামাজিক আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ ইহারা 'জল-অনাচরণীয়"-জাতি মধ্যে গণ্য। তবে কচিৎ কোথাও ইহাদিগকে 'জলচল' রূপেও দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূমের ইলামবাজার, দুবরাজপুর, ও সাহাপুর-থানার অন্তর্গত বহুগ্রামে এমন অনেক সৎগোপ আছে, যাহাদের পুরুষেরা কৃষিকার্য্য করে, এবং রমণীগণ সেই সমস্ত কৃষিজাত-দ্রব্যাদি হাটে-বাজারে লইয়া বিক্রয় করিয়া আইসে। ইহারা কিন্তু নবশাখ-শ্রেণীভুক্ত এবং জল-আচরণীয় জাতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বীরভূমের প্রান্তসীমায় মুর্শিদাবাদ জেলার—কদমসহর, ঝিকরহাটি প্রভৃতি গ্রামে 'ধানুকী' নামে জাতি বাস করে। এই জাতি পশ্চিম হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা এখন কৃষিজীবি, হিন্দু-সমাজে ইহাদের জল চলে না।

তীবর বা তীওর রাজবংশী ও কুড়োল জাতি

ধানুকী জাতি

(৪) প্রবাদ শুনিয়া, বীরনগর হইতে পাকুড় পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান দেখিয়া আসিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, যে এক সময় গঙ্গা সীতাপাহাড়ীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। তীবর জাতির কাহিনী এই বিশ্বাসের সমর্থন করিতেছে। এই বিশ্বাসের আরো একটি কারণ, রাজগাঁ ষ্টেশনের অনতিদূরে 'বুহিতাল' গ্রামের অবস্থিতি। রামানন্দ শর্ম্মার পত্রখানিতে এই বুহিতাল গ্রামের নাম আছে। প্রাচীন কাব্যাদিতে বুহিতাল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বুহিতাল অর্থে 'পোত-স্বামি'। 'কবিকঙ্কণচণ্ডী' হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

'বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন বুহিতাল' (ধনপতির স্বদেশযাত্রা)
'আজ্ঞা দিল বুহিতাল, কামারে পাতিল শাল' (ধনপতির বাণিজ্য-গমনোদ্যোগ)
"নৃপস্থিরে বুহিতাল মাগিল মেলানী"
'এ সাতপুরুষ মোর গেল বুহিতালে' (রাজ-সমীপে ধনপতির বিনয়)

বুহিতালে অর্থাৎ নৌ-বাণিজ্যে। বহিত্র শব্দ হইতে (বুহিত—আল') বোধ হয় ইহার উৎপত্তি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—নৌকার সম্বন্ধ লইয়াই বুহিতাল গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং বুহিতাল নাম নদী-প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতেছে। বুহিতাল হয়তো পূর্ব্বে গঙ্গাতীর-স্থিত ক্ষুদ্র বন্দর ছিল।

কনকপুর-কাহিনীতে লালা উদয়নারায়ণের সনন্দ-সম্বন্ধীয় কথা-প্রসঙ্গে বাউটে গ্রামের শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইহাঁর নিকট হইতে কয়েকখানি পুরাতন পত্র ও কয়েকখানি বিক্রয়-কোবালা আদি পাওয়া গিয়াছে। পত্রখানির তারিখ আছে, সন নাই। কিন্তু সাম্বৎসরিক একোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধ-বাসর নির্ণয়ের জন্য, ইহাঁরা পুরুষানুক্রমে পূর্ব্ব-পুরুষগণের মৃত্যুর যে সন তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় পত্র-লেখক বঙ্গাব্দ ১২০৩ সালের মাহ-ফাল্গুন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। (লেখকের চাকুরী-স্থান হইতে এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।) সুতরাং অনুমান করিতে হয়, পত্রখানি প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন। পত্র-লেখক রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রপিতামহ লক্ষ্মণচন্দ্রের যমজ-ভ্রাতা ছিলেন। বিক্রয়-কোবালা ও দান-পত্রাদিতে সন তারিখ লিখিত আছে। আমরা একখানি পত্র ও একখানি বিক্রয়-কোবালার অবিকল নকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পত্র। (৫)

৺ঠাকুর মহাসয়।

১ সেবকঃ শ্রীরামানন্দ সর্ম্মণ—দণ্ডবৎ প্রণামা কোটী সতং নিবেদনঞ্চ—আগে আপুনকার চরনাসির্ব্বাদে সেবক জনের প্রাণ গতিক কুসল বিশেষ পত্র পাঞা সমাচার জ্ঞাত হইলাম। বন্দাবন্দের বিসয় যে লিখিঞা ছিলাম তাহার বিএরা* কোনা সংবাদ পাইলাম না। কেবল মুখজবানি এক কথা লিখিয়া পাঠাইঞাছেন একথার মুল্যি কি। আপনি কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী দাদাকে কহিঞা একবার ছিটাসপুর পাঠাইবেন। পনাপনের দফা সেএায় ঘটকালি হস্ত পচস্তর টাকা কবুল করেন। তবে এ কথার সার উদ্ধার করিয়া সিগ্র সমাচার লিখিবেন। জমি দুই বিঘা করিঞা ছিলেন তাহার দফা নিচিন্ত হইঞাছেন।

প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন একখানি পত্রের নমুনা

(৫) শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পত্র ও দলিলের অনুলিপি প্রকাশের অনুমতি দান করিয়াছেন। এজন্ত আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা পত্র ও দলিলের বানান-আদির কোনো পরিবর্ত্তন করি নাই। তবে পাঠকের বোধ-সৌকর্য্যার্থে মাঝে মাঝে মাত্র পুর্ণচ্ছেদ-চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। মূল পত্রখানিতে স্থানে স্থানে '/' এইরূপ বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পত্র-লেখক ও (পরে প্রকাশিত) দলিলের গৃহীতা উভয়েই এক ব্যক্তি।

* বিএরা অর্থাৎ ব্যাওরা, বোধ হয় বিস্তারিত সংবাদ।

বুহিতাল একবার এইসময়ে শ্রীযুত লক্ষনকে অবস্য অবস্য পাঠাইবেন। খরচ সিক্কা ৮৲ আট টাকা শ্রীযুত বৈদ্দনাথ সর্ম্মার মারফত পাঠাই লইতে আজ্ঞা হইবেক চাল্ল কিম্বা ধান্য এই মাসে দুই এক স্থানে তত্ত তলাস করিঞা যাহাতে কিফাইত হয় জেখানে সস্তামিলে সেইস্থানে দসটাকার চাল্ল খরিদ করিবেন। নতুবা ধান্যে কোনো কিফাইত বুঝেন তবে ধান্য খরিদ করিবেন তাহাতে গাফিল নহিবেন। এবৎস্যর কার দফা বুঝিতেছেন। তাহার পর আমি আশীন মাসে পূজাতে বাটী পহচিতে কায্যানুসারে পারিএ নাই তাহাতে আপুনি বড়ই অনুজোগ করিঞাছেন। সাধ্য কি আমি পরের চাকর বিনা বিদাএ কিমত পহচি। ৺করেন অবসর মতে বাটী পহচিঞা চরণ দরশন করিব। আপনকার ওসধ কারন কাগজী নেমু সামার মারফৎ পোনে তেরগণ্ডা পাঠাইঞাছি পহচিঞা থাকিবেক। যাহাতে আপুনি সরির গতিক শাস্তি হন তাহা করিবেন। কবিরাজকে একটাকরা দিবেন জেন জেঞা এইসে ওসধ দেয় ইহা অবস্য ২ করিবেন। লিখিতেছেন শ্রী শ্রী এথা আসীবেন তাহা আমি একটা প্রনামি পুর্ব্বিব পহচিঞাছি এবং আর একটাকা কলিকাতা জাবার কালে রাহাখরচ দিঞাছি। এখন আমার আর সাধ্য কি আমার মুরাদ সকল জানিতেছেন অধিক কি লিখিব ইহা শ্রীচরনে নিবেদন করিল ইতী তারিখ ২ অগ্রহায়ণ।

বিক্রয় কোবালা

শ্রীশ্রীহরি।

শ্রীরামলোচন সর্ম্মা
সাং—বেলুন

প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন একখানি দলিলের নমুনা

ইআদি কীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় খরদীগীকারক শ্রীরামানন্দ চক্রবর্ত্তী সচ্চরিত্রেষু খরদীগীদাদে বৃত্ত স্বামী শ্রীরামলোচন শর্ম্মরায় খরদিগী পত্রমিদং লিখনং কার্জ্যঞ্চ আগে আমার ব্রহ্মত্তর পরগনে সাহজাদপুরের তরফ গয়তার বাটীর মাট গাছকাটা গড়্যার দক্ষিন এককীত্তা ১৴ একবিঘা তোমার স্থানে সেৎসা পূর্ব্বক বিক্রয় করিল অস্য পত্রন স্বাগে দত্ত বদত্ত ফি বিস্তে ৫৲ পাচটাকা সীক্কা লইয়া তোমাকে দিল। জোত আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগকরহ। আমী এবং আমার ওয়ারিশাণ সহিত কস্মিন কালে দত্তা নাস্তী। এতদর্থে খরদিগী পত্র দিল। ইতি সন ১১৯১ সাল তারিখ ৪ আশাড়।

কনকপুর-কাহিনীতে—জমিদার রাম রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখ করিয়াছি। নলহাটী থানার অন্তর্গত গয়তা নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। পূর্ণ নাম রামচন্দ্র রায় চৌধুরী। রামরায় প্রদত্ত সনন্দে তাঁহার নামের সঙ্গে রাজচন্দ্র রায় চৌধুরীর নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। অনেকেই অনুমান করেন রাজচন্দ্র, রাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইহাঁদের কোনো বংশধর বর্ত্তমান নাই। গয়তা অঞ্চলে 'রাজা রামরায়ের' নাম এখনো বহু লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। দেশের লোকের নিকট রামরায় চৌধুরী 'রাজা' রামরায় রূপেই পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে রাম রায়ের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। গয়তায় তাঁহার বিস্তীর্ণ বাসভূমির শেষচিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় তাঁহার পুর-প্রাসাদ পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। রামরায়ের ভবানী-মন্দিরের প্রস্তরসৌধ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মন্দিরদ্বারের ভগ্নাংশ—একটি প্রস্তরখণ্ড আজিও গয়তায় পড়িয়া আছে। প্রস্তরখণ্ডে ক্ষোদিত রহিয়াছে—

গয়তায় রামরায চৌধবী

"৭ শাকে পক্ষৈকষট্ চন্দ্রে মহাষ্টম্যাং মেষে কুজে।
অকারি রামরায়েণ প্রাসাদস্থার্পণং শিবে"॥

রামরায়ের শিলালিপি ও তাঁহার অভ্যুদয় কাল

ইহা হইতে জানিতে পারা যায়—১৬১২ শকাব্দায় বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার মহাষ্টমী-তিথিতে রামরায় জগজ্জননী শঙ্করীর উদ্দেশে একটি মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রামরায়ের অভ্যুদয় সম্বন্ধে গয়তায় প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—

"রামরায় কায়স্থ-সন্তান। তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাল্যে তাঁহার শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ঘটে নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায় প্রথম যৌবনে জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে বহুস্থান পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানে অন্নসংস্থানের উপায় না দেখিয়া,—হতাশ হইয়া অবশেষে তিনি রাজনগরে (লখণোরে) গিয়া উপস্থিত হন। রাজনগর তখন বীরভূমের রাজধানী ছিল। রামরায় সিপাই-সান্ত্রী লোক জনের ভিড় দেখিয়া দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবান্‌গণের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া বসেন। শুনিতে পাই রায় মহাশয় সুপুরুষ এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রথম যৌবনের পূর্ণায়ত-মূর্ত্তি প্রতিহারী-পুঞ্জের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ

রামরায়ের পরিচয়-প্রবাদ

করিয়াছিল। দ্বারে প্রহরীর পর প্রহরী পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, রাম রায় প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দ্বারপ্রান্তে একই ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, প্রহরীগণ সিংহদ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিল, রামরায় বলিলেন, একজন বাহিরের লোক, কিন্তু এখনো প্রাসাদ-অভ্যন্তরে রহিয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কথা ক্রমে প্রধান-দ্বারপালের কাণে উঠিল, তিনি অন্তঃপুর-রক্ষক—প্রধান-খোজাকে ডাকাইয়া অনুসন্ধান করিতে বলিলেন, অনেক অনুসন্ধানের পর শেষে শুধু যে একজন লোক-ই বাহির হইয়া পড়িল তাহা নহে, সেই মহিলা-মন্দির বস্ত্রাভ্যন্তরে বহুযত্নে লুক্কায়িত একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরাও আবিষ্কৃত হইয়া গেল! তখন তাহার উদ্দেশ্য বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না, সুতরাং রাত্রের মত যথোপযুক্ত প্রহারাদির পর বন্দী করিয়া রাখিয়া পরদিন তাহাকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল, দরবার তাহার সুবিচারপূর্ব্বক কোনো কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। বিচার-প্রসঙ্গে রামরায়ের কথা উঠিলে, দরবার তাঁহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, ও প্রখর-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে থাকিয়া কর্ম্ম গ্রহণে অনুরোধ জানাইলেন; রাম রায় সে অনুরোধে সম্মত না হওয়ায়—শেষে জমিদারী সনন্দ লাভ করেন। জমিদারী প্রাপ্তি-সম্বন্ধে কথিত আছে, যে তিনি এক নিঃশ্বাসে যতগুলি গ্রামের নাম করিতে পারিবেন, সেই সমস্ত গ্রামগুলি তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে; দরবার হইতে নাকি—পুরস্কার দানের এইরূপ পদ্ধতিই প্রকাশিত হইয়াছিল। নিরক্ষর যুবক তদনুসারে ভাগ্য-দেবীর কৃপায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতগুলি নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ততগুলি গ্রামের জমিদারী-স্বত্বই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

রামরায়ের পরিচয়-প্রবাদ

প্রবাদ-কাহিনীর বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন নাই। মোটের উপর অন্ততঃ এটুকুও সত্য হইতে পারে, যে রামরায় প্রথমজীবনে লক্ষ্মীর এবং বিদ্যালয়ের সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত ছিলেন। পরে নিজ-ভুজবলেই হউক, বা বুদ্ধিবলেই হউক, অথবা কাহারো অনুগ্রহেই হউক তিনি জমিদার হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, জমিদার হওয়ার পর তাঁহার বর্ণ-জ্ঞান-হীনতার পরিচয়-মূলক কোনো জনশ্রুতি কিন্তু প্রচলিত নাই। প্রবাদের সহস্র-রসনা তাঁহাকে প্রজাবৎসল, দয়ালু, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্রিয়াবান্ ও সামাজিক জমিদার বলিয়াই ঘোষণা করিয়া থাকে। তাঁহার জমিদারীতে তিনি বহু সম্পত্তি দেবোত্তর, পীরোত্তর, ও ব্রহ্মোত্তরাদিরূপে দান করিয়াছিলেন, নলহাটী-অঞ্চলে তাহার প্রামাণ্য পরিচয়ের অভাব নাই। তাঁহার অবনতিরও একটি কাহিনী আছে। শুনিতে পাওয়া যায় "ব্রহ্মাণী-নদীর

রামরায়ের চরিত্র-চিত্র

স্রোত পরিবর্ত্তন" করিয়া দেওয়ার সময় হইতেই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। ব্রহ্মাণী তাঁহার জমিদারীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রায় প্রতিবর্ষেই প্রজাগণের অনিষ্ট সাধন করিত। প্রজাবৎসল জমিদার তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই, সেই জন্য বহু অর্থব্যয়ে ব্রহ্মাণীর স্রোত, তিনি ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়া দেন। রাম রায় নাই, ব্রহ্মাণী তাঁহার নিয়তি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের গতি পরিবর্ত্তনে সমর্থা হন নাই। এই নদীটি আজিও রাম রায়ের নির্দ্দিষ্ট পথেই প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের অনুমান হয়, এই নদী-স্রোত পরিবর্ত্তনের ফলে, জমিদারীর সীমানা লইয়া—উদয়নারায়ণের, অথবা নবাব মুর্শিদ-কুলিখাঁর সঙ্গে রামরায়ের হয়তো মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকিবে, এবং তাহাই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। রাম রায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পরে খৃঃ ১৭০৩ অব্দে মুর্শিদ-কুলিখাঁ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। তিনিই রাজা উদয়নারায়ণকে রাজসাহী পরগণার জমিদারী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে প্রায় নলহাটীর কাছা-কাছি পর্য্যন্ত স্থান উদয়নারায়ণের অধিকারভুক্ত হয়। সুতরাং উদয়নারায়ণের সহিত রাম রায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া বিশেষ বিচিত্র নহে। তবে উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও অত্যন্ত ন্যায়বান্ ছিলেন বলিয়াই যা একটু সন্দেহ হয়। নবাবের মুর্শিদাবাদ আগমনের দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই উদয়নারায়ণের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয় এবং নাটোরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে। এই সময় নবাব অত্যন্ত কঠোর হস্তেই বঙ্গের জমিদারী বন্দোবস্ত-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। অব্যাহতি পাইয়াছিলেন মাত্র দুইজন—রাজনগরের (বীরভূম) রাজা আসাদুল্লা খাঁ এবং বিষ্ণুপুরের (মল্লভূম) রাজা দুর্জ্জয় সিংহ। অসম্ভব নহে যে এই সময়েই রাম রায়ের 'কপাল ভাঙ্গিয়াছিল'। অবশ্য এ সমস্ত অনুমান মাত্র। রাম রায়ের—অবনতি-কাহিনী বিস্মৃতির-রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। অনেকে অনুমান করেন বীরভূমের রাজা খাজা কমল খাঁর নিকট হইতেই রাম রায় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামরায়ের অবনতির প্রবাদ

প্রবাদ-সম্বন্ধে অনুমান

বীরভূমরাজ ও রামরায়

নলহাটীর 'লৌহসার' বিখ্যাত; লৌহসারের জন্য নলহাটীর নামটাও যেন একটু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। একজন 'কবি'—এই ঔষধের আবিষ্কারপূর্ব্বক, একসময় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক দায় হইতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। লৌহসার—না জন্মিলে তাঁহার জীবনের গতি যে কোন্ পথে পরিবর্ত্তিত হইত, এতদিনের পরেও আজ তাহা কল্পনা করিতে ক্লেশ পাইতে হয়। আমরা সুকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি;

লৌহসার ও কবি

বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি বীরভূমে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিয়াছেন। সুতরাং এখন আর তিনি প্রবাসী নহেন,—বীরভূম-বাসী। এই জন্যই আমরা সংক্ষেপে এই কবির বৈচিত্রময় জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। কবি এখনো জীবিত। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

"ভুবনমোহিনী প্রতিভার" কবি নবীনচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী

'ভুবনমোহিনী-প্রতিভার' কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় ১২৬১ সালের ২২শে আষাঢ় বর্দ্ধমান জেলার 'বুড়ার গ্রামে' জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম বর্দ্ধমানের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় পাঁচ-ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পিতার নাম ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম দুঃখহারিণী দেবী। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবদ্বীপের তৎকাল-প্রসিদ্ধ ধনকুবের গুরুদাস দাস মহাশয়ের সংসারে—মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন। বিষয়ী লোক হইলেও নদীয়ার তদানীন্তন বিশ্রুত-নামা পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং সংস্কৃত-সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষাদির আলোচনায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। ফলে পরলোকগমনের সময় কয়েক বিঘা-মাত্র লাখেরাজ ভিন্ন পত্নীপুত্রাদির জন্য আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃ-বিয়োগের সময় নবীনচন্দ্রের বয়স ছিল সাত বৎসর। ইহার অল্পদিন পরেই ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালদাস অষ্টাদশবর্ষ বয়সে অকালে লোকান্তরিত হন। নবীনচন্দ্রের তিনটি ভগিনী ছিলেন, ঠাকুরদাস তাঁহাদিগকে পাত্রস্থা করিয়া যান। এখন উপর্য্যুপরি দুইটি প্রচণ্ড আঘাতে—নিদারুণ পতি-পুত্র-শোকে বিধবা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, সাত বৎসরের পুত্র নবীন ও চারি বৎসরের শিশু বৃন্দাবনকে লইয়া দুঃখহারিণী দেবী অকূল-পাথারে ভাসিলেন। এই সময়ে আবার—(বর্দ্ধমান জেলার) মন্ত্রেশ্বর ও মণ্ডল-গ্রামস্থিত লাখেরাজ-সম্পত্তিগুলি জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। যাহা হউক সুখে-দুঃখে কোনো রকমে দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে নবীনচন্দ্রের শিক্ষার বয়স অতীত হইতে চলিল, বৃন্দাবনের শিক্ষালাভের সময় হইয়া আসিল, কিন্তু অভিভাবকহীন সংসারে যেমন হয়,—শোক-কাতরা স্নেহময়ী-জননীর সর্ব্বদাই আশঙ্কা, 'ইহাদের কি আর ভরসা আছে'? দুঃখহারিণী দেবী মনে মনে স্থির করিলেন—'ছেলেই আগে বাঁচুক, তাহার পর লেখা-পড়া শিখিবে'। সুতরাং স্নেহের প্রশ্রয়ে সর্ব্ববিধ শাসন-শূন্য নবীনচন্দ্র দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয়কে তাঁহার দ্বারা দুই একবার বিশেষ অসুবিধা-ভোগ করিতে হইয়াছিল। বহুদিন হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য

নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গ্রাম-সম্পর্কে তিনি ঠাকুরদাসের খুড়া হইতেন। ঠাকুরদাস জীবিত থাকিতে এই ব্রাহ্মণ কখনো নবদ্বীপে কখনো বুড়ার গ্রামে থাকিতেন। ইহাঁর আপনার বলিতে এ সংসারে আর কেহ ছিলনা। এই দেবপ্রকৃতি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুর্দ্দান্ত নবীনচন্দ্রের বড়-মিল ছিল। ভট্টাচায্য তাঁহাকে কোলে পিঠে করিয়া ফিরিতেন, নবীনচন্দ্রের 'হাতে খড়ি' তিনিই দেন। তাঁহার নিকটে—'কৃত্তিবাস' 'কাশীদাস' 'কবিকঙ্কন' 'ঘনরাম' 'দাসুরায়' প্রভৃতির পয়ার পাঁচালী আদি তিনি মুখে মুখে শিক্ষা করিতেন। বুড়ারগ্রামে তখন একটি ধর্ম্মমঙ্গল-গানের সম্প্রদায় ছিল, গায়কের নাম ছিল ভগবতী-চরণ ঘোষাল। ভট্টাচার্য্য তাহার আখড়াই শুনিয়া আসিয়া—প্রত্যহ রাত্রে শুইবার সময় নবীনচন্দ্রকে শুনাইতেন। এইরূপে শিক্ষাগুরু ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে নবীনচন্দ্র বর্ণ-পরিচয় হইতে ক্রমে ক্রমে রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময় তাহার বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে। এই বয়সেই নবীনচন্দ্র দাসুরায়ের অনুকরণে ছড়া, পাঁচালী-আদি রচনা করিতেন, শ্রোতা ছিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তিনিই তাহাকে বিশেষরূপে উৎসাহ দিতেন। একদিন এক বিবাহ-বাড়ীতে গ্রামের কতকগুলি আমোদ-প্রিয় লোকের ও ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে নবীনচন্দ্র স্বরচিত ছড়া ও গান শুনাইতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে এক সুরসিক বরযাত্রী বলিয়া উঠেন, "এই গ্রামে তো অনেক বাঁশবন দেখিতেছি, শুনিয়াছি এ-বনে কুমীর থাকে, তা ইহার এই সব ছড়া-গান শুনিয়া সেই কুমীরগুলি ইহাকে গিলিয়া ফেলে না?" সেই দিন হইতে নবীনচন্দ্র ঐরূপ "ছড়া-গান রচনা" ছাড়িয়া দিলেন। এই ঘটনার সপ্তাহ পরে—নবদ্বীপের গুরুদাস বাবুর লোক আসিয়া নবীনচন্দ্রকে নবদ্বীপ লইয়া যান। উদ্দেশ্য নবীনচন্দ্রের কোনো একটা ব্যবস্থা করা। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঋণ-স্মরণ করিয়া গুরুদাস বাবুর তখনকার প্রধান কর্ম্মচারী রতনমণি কুণ্ডু এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নবদ্বীপে লইয়া গিয়া তিনি তাঁহাকে কোলের-গঞ্জ নামক স্থানে বাবুদের মহাজন গদিতে খাতা-পত্র লিখিবার শিক্ষানবিশীতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র সেখানে স্থায়ী হইতে পারিলেন না। তিনি জমা-খরচের খচমচ ও রাশি-রাশি বাঁধানো খাতার ভিড় হইতে পলায়ন করিয়া কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল বালকের সঙ্গে দল বাঁধিয়া সাঁতার-কাটা, বাইচ-খেলা, ঘোড়ায়-চড়া, পাসিদের (যাহারা খেজুর-গাছ হইতে রস নামাইয়া গুড় তৈরী করে) আবাদী-গাছ হইতে রসের কলসী

নবীনচন্দ্রের ছড়া রচনা ও বরযাত্রী-সভায় কুমীরের ভয়

নবদ্বীপে নবীনচন্দ্র ও কৈশোর লীলা

চুরি করা ইত্যাদি কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। নবদ্বীপের দুই একটি কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ভূমিশূন্য রাজা

নদীয়ায় 'মহাশয়' উপাধি-ধারী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি কথায় কথায় বলিতেন আমি কৃষ্ণনগরের মহারাজের আত্মীয়, নদীয়ার লোক আমার প্রজা। 'ভাটের ঘোড়া'র মত নদীয়ার পথে স্বচ্ছন্দ-বিহারী তাহার তিন চারিটি ঘোড়া ছিল। নবীনচন্দ্রের দল সেই অশ্বচতুষ্টয়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ফিরিতেন এবং আরো নানা প্রকারে উৎপাত করিতেন বলিয়া মহাশয় তাহাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় তাহারা গঙ্গার চড়ায় নীলের মাঠে ঘোড়া ধরিতে গিয়াছেন, এমন সময় এক ষ্টীমার আসিয়া চড়ায় ভিড়িল। বালকের দল 'ধোঁয়া কলের জাহাজ' দেখিতে ছুটিল, কিন্তু গিয়া দেখিল (দেশীয়) সিপাহীতে জাহাজ পরিপূর্ণ,—আবার তাহারা চড়ায় অবতরণ করিতেছে! বালকেরা পলাইতে উদ্যত হইল, এমন সময় একজন বয়স্ক সিপাহী আধা-হিন্দী আধা-বাঙ্গালায় আশ্বাসের স্বরে তাহাদের ডাকিল. বালকেরা দাঁড়াইল, সিপাহী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল এই স্থানের জমিদার কোথায় থাকে, তাহাকে দেখাইয়া দিতে পার? আমরা কোম্পানীর সিপাহী, তাহার নিকট রসদ আদায় করিয়া লইব। নিমেষের মধ্যে বালকদল পরামর্শ স্থির করিয়া ফেলিল, বলিল জমিদার এই স্থানেই থাকেন, আইস দেখাইয়া দিতেছি। বালকদল অগ্রবর্ত্তী হইল, হাবিলদার দশ পনের জন সিপাহী সঙ্গে একখানা ইংরেজী লিখিত পরওয়ানা-হস্তে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা দূর হইতে জমিদারকে দেখাইয়া দিল—"ঐ তিনি বাঁধা হুঁকায় তামাক খাইতেছেন।" অনুচর পরিবেষ্টিত হাবিলদার তাহার নিকট গিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি এই স্থানের জমিদার কিনা? ভদ্রলোক পার্শ্বোপবিষ্ট লোক-গুলির দিকে একবার সগর্ব্বদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তর দিলেন যে সিপাহী-দের অনুমান মিথ্যা নহে। সিপাহী তখন পরওয়ানাখানি প্রসারিত করিয়া সপ্রমাণ করিল তাহারা কোম্পানীর সিপাহী, এবং মুখে মুখে এক অনতিদীর্ঘ ফর্দ্দ ফাঁদিয়া জানাইয়া দিল যে তাহাদের জন্য যৎসামান্য কয়েক মন আটা, তদুপযুক্ত ঘৃত, ছোলা প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গেই ষ্টীমারে পাঠাইয়া দিতে হইবে। জমিদার তো অবাক্! ফর্দ্দ পূরণ করিতে হইলে যে অনেক টাকার প্রয়োজন। এত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন। তখন দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া আমতা-আমতা করিয়া অতি ধীরে ধীরে তিনি জানাইতে বাধ্য হইলেন,—যে এসব

কোম্পানির সিপাহী

কুটীর ফর্দ্দ

জিনিস তাঁহার ভিটা মাটি বিক্রয় করিলেও সংগৃহীত হইবার উপায় নাই এবং সত্য সত্যই তিনি জমিদার নহেন। কিন্তু সিপাহীরা তাহা শুনিবে কেন! ক্রমে যাহা হয় তাহাই হইল। ব্যাপার গড়াইতে লাগিল, সিপাহীদের ঘুঁষির চোটে জমিদার অস্থির হইয়া পড়িলেন, অবশেষে আর সহিতে না পারিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া অদূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র কুটীর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বেগে বাহিরে আসিয়া এক বৃদ্ধা রমণী সিপাহীদের পদতলে নিপতিতা হইলেন। তখন সিপাহীদের চৈতন্য হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল এই 'বুড্‌ঢিকা লেড়কা' কখনো জমিদার হইতে পাবে না, এবং বালকের দল তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। বালকগণকে আপ্যায়িত করিবার জন্য সিপাহীগণ বিশেষ যত্নে বহু অনুসন্ধান করিয়াছিল! কিন্তু সুবুদ্ধি বালকের দল তখন এমন ভাবে আত্মগোপন করিয়াছিল, যে ব্যর্থ-মনোরথ সিপাহীর দলকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত ষ্টীমারে ফিরিতে হইয়াছিল। বালকের দলই যে পূর্ব্বোক্ত মহাশয়কে জমিদার বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল, এ কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মহাশয়ের সহিত বালকগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বালকগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে মহাশয় অতঃপর জমিদার-রূপে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন কি না? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, জমিদার হইতে হইলে এরূপ বহু ঝঞ্ঝাট সহিতে হয়, অনেক মার খাইতে হয়, আমি জমিদার বলিয়াই না তাহারা আমার নিকট আসিয়াছিল, কই তুই * * * * দের বাপেদের নিকটে তো যায় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজার শাস্তি

রাজার ঝঞ্ঝাট

পাসিদের নিত্য নিত্য রস চুরি হইত, পাসিরা ক্রমে উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা একদিন রসের কলসীতে ধুতুরার বীজ বাটিয়া রাখিয়া দিল। নবীনচন্দ্রের দল নিত্যকার মত সেদিনও রস পান করিয়া আসিল। সঙ্গীরা যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কোলের গঞ্জের বাসায় আসিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নবীনচন্দ্র অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পাঁচ-দিন পাঁচ রাত্রি একভাবে কাটিল, ছয়-দিনের দিন তাঁহার চৈতন্য হয়। কিন্তু প্রায় পনের দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। ক্রমে সমস্ত কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইল, তাঁহারা নবীনচন্দ্রকে বুড়ার গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। বুড়ার গ্রামেও সমস্ত সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং নবীনচন্দ্রের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সকলেই একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। নবদ্বীপে নবীন প্রায় চারি বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের রসপান ও চৈতন্যহীনতা

নবীনচন্দ্রের ভগিনীপতি (বুড়ার গ্রামের নিকটস্থিত) বাকলা গ্রাম-নিবাসী রামতারণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্টেটে (পাতিলা-দহ পরগণাভুক্ত কোনো স্থানে) কার্য্য করিতেন। রামতারণের মামাতো ভাই বেণীমাধব রায় উক্ত ষ্টেটভুক্ত মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুর মহালের কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রসন্নকুমারের (মুঙ্গেরের) পীর-পাহাড়ের কুঠী ও পাহাড়-নিম্নস্থ সুরম্য উদ্যান ইঁহারই তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইত। নবীনচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় বেণী বাবু তাঁহাকে মুঙ্গেরে লইয়া যান। সেই সময় বুড়ার গ্রামের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডুল গ্রামনিবাসী কায়স্থ বংশীয় সূর্য্যকুমার ও নবকুমার রায় মুঙ্গেরে চাকুরী করিতেন। নবকুমার মুঙ্গের গভর্ণমেণ্ট-স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। ইঁহাদের একটি লাইব্রেরী ছিল, এই লাইব্রেরী হইতে এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, ও বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও মাসিক-পত্র এবং নানা প্রকার বাঙ্গালা পুস্তকাদি আনিয়া পাঠ করিতে করিতে নবীনচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভাণ্ডুলের একটি ছাত্র শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় নবকুমারের বাসায় থাকিয়া মুঙ্গের-স্কুলে পড়িতেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ-কৌমুদী অধ্যয়ন করেন। নবকুমার বাবুর অনুগ্রহে তিনি এই লাইব্রেরী হইতে শব্দকল্পলতিকা (অমর-কোষের অনুবাদ), বঙ্কিমের দুর্গেশ নন্দিনী, দীনবন্ধুর নবীন-তপস্বিনী, কালি-সিংহের মহাভারত প্রভৃতি বহু গ্রন্থ পাঠের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে নবীনচন্দ্রের মতি পরিবর্ত্তিত হয়, তথায় তিনি দেহ-মন উভয়েরই উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুঙ্গেরে নবীনচন্দ্র

মতি পরিবর্ত্তন

নবীনচন্দ্র প্রায় পীর-পাহাড়ের কুঠীতে থাকিতেন, এবং সকাল-সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন মুঙ্গেরের জেল হইতে পলায়িত এক কয়েদীকে কোনো নির্জ্জন উপত্যকায় প্রস্তরাঘাতে পায়ের বেড়ী ভাঙ্গিতে উদ্যত দেখিয়া কৌতূহল-বশে তাহার দিকে অগ্রসর হন। কয়েদী মনে করিল আগন্তুক তাহাকে ধরিতে আসিতেছে, সুতরাং সে প্রস্তর ছুড়িতে ছুড়িতে নবীনচন্দ্রকে আক্রমণ করিল, কালবিলম্ব না করিয়া নবীনচন্দ্রও তাহাকে আক্রমণ করিলেন। শেষে কয়েদীকে নীচে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, ঘটনাক্রমে কুঠীর-চৌকিদার রামজীবন দোসাদ সেইদিকে কোথায় যাইতেছিল, চীৎকার শুনিয়া সে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের চীৎকারে কুঠীর মালি ও অন্যান্য লোক আসিয়া কয়েদীকে তোলাতুলি করিয়া ধরিয়া কুঠীতে লইয়া

পলায়িত কয়েদী ও নবীনচন্দ্র

গেল। সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিল এবং পরে মোকদ্দমা রুজু হইল। নবীনচন্দ্র সাক্ষ্য দিলেন, কয়েদী 'পুনর্মূষিক' হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শুনিয়াছি, বিভাগীয় উচ্চতম পুলিশ-কর্ম্মচারী তাঁহাকে পুলিশ-বিভাগে কর্ম্মগ্রহণে অনুরোধ করায় তিনি স্বীকৃত হন নাই। রামজীবন দোসাদ কনেষ্টবলের পদ লাভ করিয়াছিল। এই ঘটনার দুই একমাস পরই নবীনচন্দ্রকে বিবাহের জন্য মুঙ্গের-ত্যাগ করিতে হয়। মুঙ্গেরেও তিনি প্রায় চারিবৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের বিবাহ

নবীনচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয় (বীরভূম) থানা মৌড়েশ্বরের অধীন দক্ষিণ-গ্রামে, দ্বিতীয় বিবাহ হয় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সিঙ্গী-গ্রামে। দুইটি বিবাহের মধ্যে ব্যবধান-কাল মাত্র এক বৎসর। শুনিতে পাওয়া যায় সিঙ্গির ২য়া পত্নী তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার শ্যালিকা। বার-ইয়ারী দেখিতে গিয়া বড় বধূঠাকুরাণীর কাতর-ক্রন্দনে নবীনচন্দ্র তাঁহার অরক্ষণীয়া ভগিনীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বিবাহের পর আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে তিনি কোনো অর্থকরী-বৃত্তি অবলম্বনে সচেষ্ট হন। এক বৎসর বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে মুর্শিদাবাদ-নসীপুরে—মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নসীপুরে গমন জগন্নাথ বাবুর সহিত পরিচয়

মথুরানাথ নসীপুর-রাজষ্টেটে কার্য্য করিতেন এবং সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের মাতুল হইতেন। মাতুলের সঙ্গে এক সভায় গিয়া, বক্তৃতা করিয়া তিনি জগন্নাথ বাবুর সঙ্গে পরিচিত হন। জগন্নাথ বাবু ছিলেন রাজা উদমন্ত সিংহের সহধর্ম্মিণী রাণী অন্নপূর্ণার পালিত-পুত্র। জগন্নাথ বাবুর অনুগ্রহে রাণী অন্নপূর্ণার স্নেহ-লাভ করিয়া তিনি আপনার ভরণপোষণের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। রাণী মহোদয়া তাঁহার মাতাকেও যথা-প্রয়োজনীয় অর্থাদি প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানেই নবীনচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবন আরম্ভ হয়, এই স্থানেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কবিতা রচনা ও মাসিক পত্রিকাপ্রকাশ

তাঁহার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতা 'পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী' আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে 'বিনোদিনী' মাসিক পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি কবিতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র ও অপরাপর বন্ধুবর্গের সহিত মিলিয়া জগন্নাথ বাবুই এই কাগজখানি প্রকাশ করেন। বিনোদিনী-সম্পাদিকা ছিলেন 'ভুবনমোহিনী দেবী'। ইনি নবীনচন্দ্রের এক আত্মীয় (পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর) রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী এবং 'রত্নবতী' (কবিতা) ও 'আমোদিনী' (উপন্যাস) গ্রন্থের লেখিকা। ভুবনমোহিনী দেবী নামমাত্র সম্পাদিকা ছিলেন।

নবীনবাবু বলেন স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ-বৃদ্ধির জন্যই সম্পাদিকারূপে তাঁহার নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মাতুলের পরামর্শক্রমে এই স্থান হইতে ছাত্রবৃত্তি (প্রাইভেট) পরীক্ষা দিয়া, জাফরগঞ্জের মোহান্তের প্রধান কর্ম্মচারী চন্দ্রনাথ ভৌমিকের নিকট আইন অধ্যয়ন করিয়া, বহরমপুরের জজসাহেবের সম্মতি লাভপূর্ব্বক কমিটীতে পরীক্ষা দিয়া—তিনি উকিল হন। কিন্তু পাঁচ-সাত দিনের বেশী আর আদালতে গমন করেন নাই। নানা কারণে তিনি ওকালতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। নসীপুরে তাঁহার স্থিতিকাল প্রায় পাঁচ বৎসর। অতঃপর অন্নপূর্ণা দেবী স্বর্গারোহণ করিলে, রাণীর তক্তি সমস্ত সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া, মোকদ্দমায় হারিয়া জগন্নাথবাবু কাশী-বাসী হইলেন, (সেখানে রাণীর স্ত্রী-ধনে-ক্রীত একটি বাড়ী ও কিছু সম্পত্তি ছিল) এবং নবীনচন্দ্র স্বগ্রামে ফিরিয়া কবিতালোচনা করিতে লাগিলেন। 'বিনোদিনী' মাত্র দুই বৎসর চলিয়াছিল।

উকীল নবীনচন্দ্র

নসীপুর ত্যাগ

বাড়ীতে আসিয়া কিছু দিন পরে তিনি তাঁহার 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভার' ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি সাহিত্য-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই দুইটি সংস্করণ বিক্রয় হওয়ায় নবীনবাবু অনেকগুলি টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার কতকগুলি খণ্ড কবিতা ও আর্য্য-সঙ্গীত দ্রৌপদী-নিগ্রহ কাব্য রচিত হয়। ভুবনমোহিনী-প্রতিভার প্রশংসা করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় এক কবিতা লিখিয়াছিলেন। পরে সেই কবিতা যখন তাঁহার অবকাশ-রঞ্জিনীতে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি পাদ-টীকায় লিখিয়াছিলেন -"শুনিয়াছি ভুবনমোহিনী-প্রতিভা জাল। হউক জাল, এখন আর ভুবনমোহিনী-প্রতিভার অভাব নাই।" বলাবাহুল্য এই ছদ্ম নামের জন্য নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার সাহিত্যিক-সমাজে একটু 'অপ্রস্তুত' হইতে হইয়াছিল। বুজার-গ্রামে অবস্থান কালে, এই সময় তিনি ডাক্তারী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। নিকটস্থ কুড়মুন-গ্রামের মুসলমান-বন্ধু ডাক্তার মুন্সি মহাম্মদ তকি তাঁহার ডাক্তারী শিক্ষার গুরু।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা প্রকাশ

ছদ্মনাম

ডাক্তার নবীনচন্দ্র

'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা' পাঠে প্রীত হইয়া স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, উড়িষ্যার তদানীন্তন জয়েন্ট-স্কুল-ইন্স্পেক্টর বাবু রাধানাথ রায় দ্বারা সরকারী অর্থে উক্ত পুস্তক চারিশত খণ্ড ক্রয় করাইয়া উড়িষ্যা-গড়-জাতের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে বিতরণ করাইয়াছিলেন। সে সংবাদ নবীনচন্দ্র জানিতেন, সুতরাং 'জ্যামিতি, পরিমিতির' ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে যখন পত্র লিখি-

স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর সাহায্য

লেন, যে—আপনি কোনো এক রবিবারে চুঁচুড়ায় আসিয়া ভূদেব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, তখন তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না,—অবিলম্বে চুঁচুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রনাথ বাবুও আসিলেন। ইনিই ভুবনমোহিনী-প্রতিভার প্রণেতা কি না সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়—তাঁহারা তথায় বসিয়া বসিয়া নবীনচন্দ্রকে একটি কবিতা রচনা করিতে বলেন। নবীনচন্দ্র কবিতা-রচনা করিলে, কবিতা-পাঠে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। (৬)

চুঁচুড়ায় নবীনচন্দ্র

(৬) কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

(১)

"নৈদাঘ সায়াহ্ন, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়—
চেয়ে দেখ হে ভাবুক! বিশ্ব-প্রকৃতি-মাধুরী,
নাই ঘোর ঘনঘটা বিকট বিদ্যুৎচ্ছটা
শৃঙ্গভেদী অশনি সম্পাত ঘোরতর,—
নাই—বাত্যা-বৃষ্টি-করকা করাল ঝড়ঝড়ি!

(২)

গগন-মণ্ডল স্থির প্রশান্ত নির্ম্মল,
নীলোজ্জ্বল দরশন—সব শান্তিময়, দেখি—
পশ্চিম আকাশ-কোলে কাল' সাগরের জলে—
রক্ত-রাগচ্ছটা ভানু ডুবিতেছে যেন,
দেখ—প্রাচীতে উদিত পুনঃ সন্ধ্যা সুধা-মুখী।

(৩)

কুসুম-যৌবনা-সন্ধ্যা সরলা-কুমারী—
কিবা শ্যামোজ্জ্বল দ্যুতি অতি অপূর্ব্ব মাধুরী
ছায়া সহচরী সঙ্গে দেববালা খেলে রঙ্গে,
ফুল-আভরণ অঙ্গে, ফুলের বসনে—
তনু—আবৃত, দুহাতে ফুল ছড়ায় সুন্দরী।

(৪)

স্বর্গীয় সুরভিরাশি বিতরিছে ধীরে ধীরে
ধীর গন্ধ-বহ, সন্ধ্যাদেবী শান্তিতরে;
সন্ধ্যা এল' এল' ব'লে বিহগেরা কুতূহলে
গাহিছে বন্দনা-গীতি করি কলধ্বনি,
বিশ্ব—হাসিছে-ভাসিছে যেন পুলক-সাগরে"!

ইহার কিছু দিন পরে ডাক্তারীতে চলনসই জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি পুনরায় ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অভিপ্রায়,—ভূদেব বাবু তাঁহাকে এমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, যেখানে বসিয়া তিনি বেশ মান-সম্ভ্রমের সহিত (চিকিৎসা) ব্যবসায় চালাইতে পারেন। প্রার্থনা শুনিয়া ভূদেব বাবু হাসিয়া বলেন যে, 'তুমি এইরূপ অশিক্ষিত-অবস্থায় মানুষ খুন করিবে, আর আমি তাহার সাহায্য করিয়া পাপভাগী হইব! তা'র চেয়ে চাকুরী করনা কেন,— আমি তোমাকে স্কুল-সাবইন্স্পেক্টর করিয়া দিতে পারি।" কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে নবীনচন্দ্রের ইচ্ছা হইল না। তিনি বাটী ফিরিয়া আসিলেন। ইহা সন ১২৮৮ সালের আষাঢ় মাসের কথা। কিছুদিন গত হইয়া গেল, একদিন ভূদেব বাবুর— বৈবাহিক, বীরভূম কীর্ণাহারের স্বনাম-ধন্য জমিদার স্বর্গীয় বাবু শিবচন্দ্র চৌধুরীর একখানি পত্র নবীনচন্দ্রের হস্তগত হইল। নানা কথার পর তাহাতে লেখা ছিল—"আপনি মৌরাক্ষী-নদীর দক্ষিণ তীরে সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বমুখে ন্যূনাধিক একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তিলপাড়া নামক গ্রামে আমার কাছারিতে আসিয়া পৌছিবেন। সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্ত্তা সুশেষ হইবে।" পত্র পাইয়া নবীনচন্দ্র তিলপাড়ায় উপস্থিত হইলেন,—দুই তিন দিন অবস্থিতি করিলেন, স্থির হইয়া গেল কলিকাতা হইতে ঔষধ ও যন্ত্রপাতি কিনিয়া আনিয়া নবীনচন্দ্র কীর্ণাহারে ডাক্তারি করিবেন। কীর্ণাহার অঞ্চলে তখন ম্যালেরিয়ার প্রভাব দ্রুত-গতিতে বাড়িয়া চলিতেছিল। নবীনচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, কিছু পরে কার্য্য-ব্যপদেশে শিবচন্দ্র বাবুও কলিকাতা গমন করিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি, তিলপাড়ায় থাকিতে কথা হইয়াছিল যে শিবচন্দ্র বাবু নবীন-চন্দ্রের প্রণীত আর্য্য-সঙ্গীত ১ম ভাগ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিবেন। প্রায় তিন শত টাকা ব্যয় হইবে, তন্মধ্যে পঞ্চাশ টাকা এককালীন দান করিবেন, এবং পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হইতে বাকী আড়াই শত টাকা ক্রমে আদায় করিয়া লইবেন। কলিকাতায় গিয়া শিবচন্দ্র বাবু প্রতিশ্রুতি-মত সমস্ত টাকা প্রদান করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে পুস্তক-মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। নবীনচন্দ্র সন ১২৮৮ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখে (বীরভূম) কীর্ণাহারে আগমন করিলেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটি কন্যা ও একটি পুত্র এবং কনিষ্ঠার গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও প্রার্থনা

ভূদেব বাবুর অনুরোধে বীরভূমের শিব

চন্দ্রবাবুর সাহায্য

শিবচন্দ্রের সাহায্যে আর্য্য সঙ্গীত-প্রকাশ

বীরভূম কীর্ণাহারে নবীনচন্দ্র

কীর্ণাহারে আসিয়া নবীনচন্দ্র শিবচন্দ্র বাবুর বাটীতেই ঔষধালয়-স্থাপন করিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আহারাদি শিবচন্দ্র বাবুর বাটীতেই

চলিতে লাগিল। চারি পাঁচ মাসের মধ্যেই তাঁহার হাত যশের কথা গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ক্রমে রোগী-সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া নবীনচন্দ্র 'লৌহসার' আবিষ্কার করিলেন;—"নবীন বাবুর লৌহসার বা কীর্ণাহারের আরক"! ম্যালেরিয়া প্রবল হইতে লাগিল, 'নবীন বাবুর লৌহসারের' কাটৃতী ও অপ্রত্যাশিতরূপে বাড়িতে আরম্ভ করিল। নবীন বাবু কীর্ণাহারে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি সন ১২৮৯ সালের আষাঢ় মাসে বোলপুরে এবং আশ্বিন মাসে **নলহাটীতে** ঔষধালয় স্থাপন করিলেন। নবীন বাবুর উপর দিয়া কিছুদিন ধরিয়া যেন অর্থবৃষ্টি হইয়া গেল। এখনো এই লৌহসার-বিক্রয়-লব্ধ আয়ের উপর তাঁহাকে বাৎসরিক কিছু কম প্রায় দুইশত টাকা আয়-কর প্রদান করিতে হয়।

অন্যান্য পুস্তক

কীর্ণাহারে আগমনের দুই বৎসর মধ্যে নবীন বাবু 'সিন্ধু-দূত' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং বোধ হয় প্রায় ৯।১০ বৎসর পরে তাঁহার 'আর্য্য-সঙ্গীত জাতীয়-নিগ্রহ মহাকাব্যের' ২য় ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ইহার পর তিনি আর্য্য সঙ্গীত তৃতীয়-ভাগ এবং কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি-মূলক জীবন সংগীত গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। পুস্তক দুই খানি এখনো প্রকাশিত হয় নাই।

কীর্ণাহারে অবস্থিতি ও অবস্থা

কীর্ণাহারে আসিয়া প্রায় দেড়বৎসর পরে তিনি আপনার পরিবারবর্গকে বুড়ার গ্রাম হইতে কীর্ণাহারে আনয়ন করেন। এখানে আসিয়া তিনবৎসর পরে নবীন বাবুর আশৈশব বন্ধু ও শিক্ষাগুরু ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন এবং প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পরে নবীন বাবু মাতৃ-হীন হন। ভগবৎ কৃপায় নবীন বাবু আট পুত্র এবং আট কন্যার জনক। এখন তাঁহার সাত পুত্র এবং ছয় কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম পক্ষের তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ভূষিত। জ্যেষ্ঠ, পুলিশের ডেপুটি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মধ্যম উকিল। দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ সুরথনাথ ও মধ্যম ইন্দ্রনাথ কোনো ডিগ্রীধারী নহেন। কিন্তু এই দুইটি পুত্রই বোধ হয় পৈতৃক ধারাটি বজায় রাখিয়াছেন। সুরথনাথ বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় যশস্বী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনিই স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের জীবনী এবং গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া প্রথম-স্থান অধিকারপূর্ব্বক কলিকাতা 'চৈতন্য-লাইব্রেরী' হইতে পদক পুরস্কার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ যেমন সুগায়ক—তেমনি সু-গীতি-রচক। ভরসা আছে সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাঁরা বীরভূমির মুখোজ্জ্বল করিবেন। ২য় পক্ষের চতুর্থ পুত্র বি-এ, এবং কোনো উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ৫ম পুত্র

আই, এ, পড়িতেছেন। নবীন বাবুর ভাষা গম্ভীর এবং ওজস্বী, ছন্দের গতি দর্পিত, কবিতা উদ্দীপনাময়ী ও ভাবময়ী, ভাব নিবহ মৌলিকতায় পরিপূর্ণ। (৭)

নলহাটীর কাহিনী শেষ হইল। উপসংহারে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নলহাটীর সৌন্দর্য্য-সম্পদ, নলহাটীর গৌরব—"নলহাটীর পাহাড়"। এ পাহাড়, হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির নিকটেই পরম পবিত্র, পুণ্যতীর্থ, সুতরাং সমান পূজার্হ। নলহাটেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং আনাসহিদ পীরের দরগা ও মসজিদ এই পাহাড়ের উপরেই অবস্থিত। কিন্তু এই পাহাড়টি বোধ হয় শীঘ্রই নলহাটী-পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইবে। যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, অদূর-ভবিষ্যতে এ পাহাড়ের আর চিহ্ন-মাত্রও থাকিবে না। নলহাটীর ভূম্যধিকারিগণ পাহাড় হইতে পাথর তুলিয়া ও এক রকমের রঙ্গিন মাটি তুলিয়া অর্থোপার্জ্জনে যেরূপ মনঃসংযোগ করিয়াছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের অবস্থা যারপর নাই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাহাড়ের সর্ব্ব-অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত! গর্ত্তগুলির মধ্যে আবার নানাবিধ আবর্জ্জনা জমিয়া, বর্ষার জলে পচিয়া, এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরক-কুণ্ডের সৃষ্টি হইতেছে। পাহাড়ের এই দুরবস্থা—পরকালের দরবারে, আমাদের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে যদি কোনো উচ্চবাচ্য না-ও করে, তথাপি নলহাটী-বাসিগণের ইহকাল নামক পদার্থটীকে যে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিবে, সে কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখি পাহাড়টীকে বজায় রাখাই একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, স্বর্গীয় রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর যখন বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—সে সময় পাহাড় হইতে পাথর তোলা ইত্যাদি তিনি জোর পূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। দেখিলাম—কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে পাহাড়ের অঙ্গচ্ছেদ আবার যথা-পূর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। নলহাটীর হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণের ইহ-পরকালের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া ভূম্যধিকারিগণ কি এই সামান্য অর্থলোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন না? (৮)

নলহাটীর পাহাড় ও ভূস্বামির ব্যবহার

---

(৭) নবীনচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৃন্দাবনচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্ মহাশয় বোলপুরে ওকালতি করিতেছেন। সাহিত্য-রসিক, সুবক্তা এবং দেশপ্রাণ-কর্ম্মী বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

(৮) নলহাটীতে ভৈরবের কোনো মূর্ত্তি নাই। অনাদি লিঙ্গ-মূর্ত্তিই ভৈরব-রূপে পূজিত হয়। নলহাটীতে একটি প্রতিষ্ঠিত শিব-লিঙ্গ ভৈরবরূপে পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন। শুনিয়াছি—রামপুরহাটের অন্তর্গত আয়স নামক গ্রামে যোগেশ ভৈরব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

বালা-নগর-কাহিনী

(কসবায়ে' 'বারা')

বালা-নগর ওরফে বারা, নলহাটী থানার অন্তর্গত। নলহাটী আজিমগঞ্জ শাখা রেলপথের লোহাপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে, উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তে বীরভূমের শেষ সীমায় অবস্থিত এই গ্রাম,—আঠারটি মহল্লায় (পাড়া) বিভক্ত। গ্রামে প্রায় হাজার ঘর লোকের বাস; অধিকাংশই মুসলমান, হিন্দুর সংখ্যা খুব কম। গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত গম্ভীরা নাম্নী একটি ক্ষুদ্র নদী কিছু দূরে গিয়া বশিয়ার বিল বা বশিষ্ঠ বিলে মিশিয়াছে। গম্ভীরার দক্ষিণে 'হেঁড়ে রূব' নামে একটি উৎস আছে। এই উৎস হইতে অবিশ্রান্ত উত্থিত শীতল জলধারা গম্ভীরায় গিয়া পড়িতেছে। প্রবাদ আছে, এই প্রস্রবণে পূর্ব্বে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। সুড়ঙ্গ-পথে নগরাভ্যন্তরস্থিত রাজ-প্রাসাদ মধ্যে যাতায়াত চলিত। সেই সুড়ঙ্গ ধ্বংস হইয়া এখন তাহারই মুখ হইতে এই জলরাশি উত্থিত হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে বারাগ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এক ব্রাহ্মণের শাপেই বারা ব্রাহ্মণ-হীন হইয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিলেও এখনো বারায় ব্রাহ্মণের বাস স্থায়ী হয় না।

বারা-পরিচয়

অভিশপ্ত বারা

লোহাপুর ষ্টেশনের উত্তর হইতে ক্রমান্বয়ে বারা, কুমারষাণ্ডা, নগরা, সাহাকার, বাণেশ্বর প্রভৃতি গ্রাম লইয়া বারার পূর্ব্ব-সীমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, বারা, নগরা, বাণেশ্বর, এই তিন গ্রাম একত্রে পূর্ব্বে 'বারণাবত' নগর নামে অভিহিত হইত। কেহ কেহ বারা ও তাহার আট দশক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত বুজুঙ্গ (ভুজঙ্গ নগর), এই দুই গ্রামের নাম একত্র করিয়া 'বারা বুজুঙ্গ' "একডাকের গ্রাম" বলিয়া পরিচয় দান করেন। কাহারো কাহারো মুখে শুনিয়াছি, এই স্থানে পূর্ব্বে বাণ-রাজার রাজধানী ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা বালা-রাজার রাজধানী, তাই ইহার নাম বালা-নগর। যাঁহারা বলেন এই স্থান বারণাবত নামে বিখ্যাত ছিল, তাঁহারা বারায় জতুগৃহ-দাহ করিয়া পাণ্ডবগণকে একচক্রায় (বীরভূমির বর্ত্তমান মৌড়েশ্বর ও বীরচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থান) লইয়া যান, এবং তথায় বক রাক্ষসের বধ-সাধন

ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ

করেন। ইঁহাদের কেহ কেহ বারার নিকটবর্ত্তী কুমারষাণ্ডায় (কুম্ভকার গৃহে) কুন্তী দেবীর পূর্ব্ব-অধিস্থিতি স্থান কল্পনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বারা-বুজুঙ্গ ডাকের গ্রাম বলেন, তাহারা কোনো কারণ নির্দ্দেশ করেন না। ইতিহাসের সহিত পরিচিত থাকিলে এই বালা-নগর ও ভুজঙ্গ-নগরকে তাঁহারা হয়তো "বালবলভী-ভুজঙ্গের" বাসস্থান বলিয়া দাবী করিতেন। কারণ বারা হইতে বুজুঙ্গের ব্যবধান-পথ মধ্যে একটি দেবগ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহা "দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ" হওয়ারও বিশেষ কোনো বাধা ছিল না। বাণ-রাজধানীর পরিচয়-দাতৃগণ বলেন, 'সহস্র বাহু' (!) বাণ নামক অসুররাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। রাজনন্দিনা উষা ও যাদব অনিরুদ্ধের কাহিনী তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। অতএব বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে মহাদেবের আগমন, ও মহাদেবের সহিত রফা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাণের সহস্র-বাহুচ্ছেদন, অবশেষে উষা অনিরুদ্ধের মধুর সম্মিলন, ইত্যাদি উপকরণের অভাবে এ প্রবাদটি তেমন ঘোরালো হইতে পায় নাই। শেষ পক্ষের বিবরণ হইতেছে, "প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে বীরেন্দ্রনাথ রায় নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব ছিলেন। একবার 'ব্রাহ্মণ-ভোজনের' জন্য তিনি বারার ব্রাহ্মণগণকে রাজ-ভবনে উপস্থিতির নিমিত্ত অনুরোধ করেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ 'রাজদ্বারে' উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার কোনো আয়োজন নাই, রাজবাড়ীতে উৎসবের কোনো চিহ্নও পরিলক্ষিত হইতেছে না। অপিচ কোনো কোনো রাজকর্ম্মচারী সমীপস্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সমস্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণগণের মানসিক-অবস্থা সম্বন্ধে সকরুণ-সন্দেহ-জ্ঞাপনপূর্ব্বক অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে স্থানত্যাগের আদেশ-দান করিলেন। উভয়পক্ষের বাদ-বিতণ্ডায় একটা মহা-হট্টগোল উপস্থিত হইল। এমন সময়ে রাজা ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রহরীগণের দ্বারা,—সেই ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণগণকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া এক ব্রাহ্মণ অভিশাপ প্রদান করেন,— "অবিলম্বে বারা রাক্ষসের দ্বারা আক্রান্ত হইবে, বারা ব্রাহ্মণহীন হইবে, আর এই ধর্ম্মভ্রষ্ট মূঢ় রাজা ম্লেচ্ছ হইবে।" তৎপর দিনই বারার সমস্ত ব্রাহ্মণ,—সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থগণও নগর ছাড়িয়া পলায়ন করেন। (বারার ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ এখন মুর্শিদাবাদ জেলার বারালা গ্রামে বাস করিতেছেন)। অনতিকাল-পরেই বারা রাক্ষস-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বীরেন্দ্র রায় তাহার
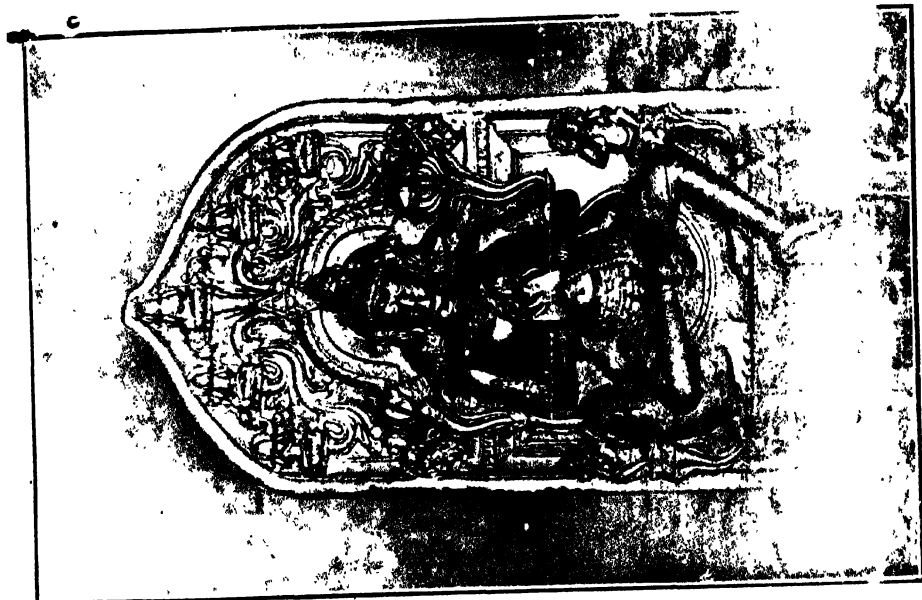
ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ

শেষ প্রবাদ

২৭ নং বারগ্রামের ভুবনেশ্বরী।

২৬ নং সাহাবর গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণজননী-মূর্ত্তি
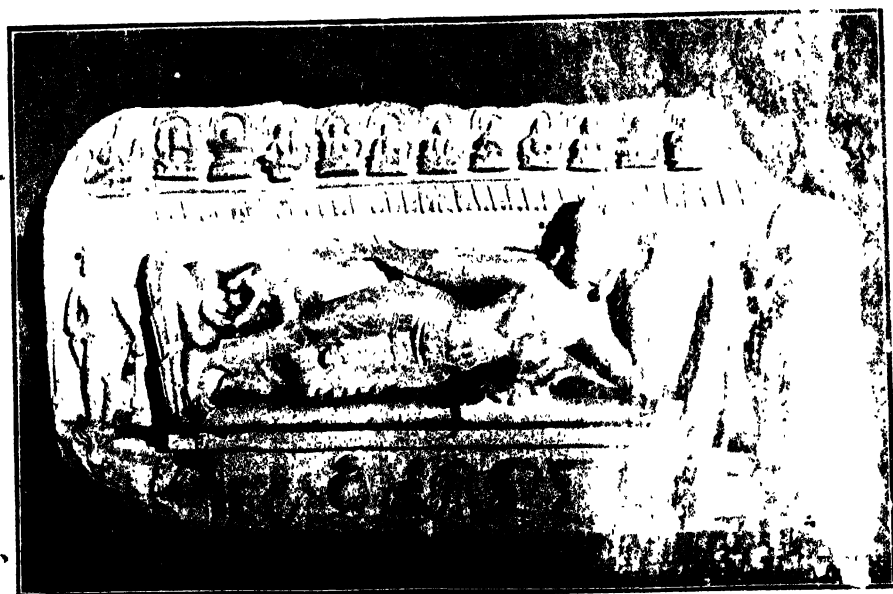
সহিত সন্ধি করেন যে, "রাক্ষস আপন আহার্য্য স্বরূপ বাবার প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ী হইতে নিত্য একটি করিয়া মনুষ্য নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত হইবেন।" নগর-প্রান্তে রাক্ষসের জন্য সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। তিনি নিত্য নিয়মিতভাবে একটি করিয়া মনুষ্যকে উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আনুমানিক ৮৯২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃঃ অঃ পশ্চিমের সমরকন্দ সহর হইতে মহাত্মা খোন্দকার লোহাজঙ্গ সাহেব এই নগরে শুভাগমন করিলেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে রাক্ষসটিকে বিনষ্ট করায় গ্রামবাসির নিকট তাঁহার প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। সকলের মুখেই খোন্দকার সাহেবের কথা। অবিলম্বেই রাজার কর্ণে সে কথা পৌঁছিল। রাজা পীরসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আলাপে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন পরে সপরিবারে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। বালা নগরের নাম হইল "কসবায়ে' বালা-নগর" (বালা নগর ক্রমে 'বারা'য় পরিণত হইয়াছে)। নগরনিবাসী অনেকেই রাজার দেখাদেখি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তদবধি বারা মুসলমানপ্রধান স্থান"।

শেষ প্রবাদ

লোহাপুর ষ্টেশন হইতে বারা প্রবেশ-পথে গ্রামপ্রান্তে 'রাক্ষস-ডাঙ্গা' নামে একটি স্থান দৃষ্ট হয়। রাক্ষস-ডাঙ্গার বিশাল ইষ্টক-স্তূপ বহুদিন পর্য্যন্ত বারা-বাসীর ভীতি উৎপাদন করিয়াছে। কিছুদিন হইতে স্তূপের ইষ্টকরাশি সাধারণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় স্তূপটি বিলুপ্ত হইয়াছে। কাড়া দীঘি নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাজা বীরেন্দ্র রায়ের দেহ সমাধিস্থ হইয়াছিল। এখনো সে সমাধি বিদ্যমান আছে। লোহাজঙ্গ সাহেব সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সমাধি আজিও লোকের নিকট পূজাপ্রাপ্ত হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় সমাধি সম্বন্ধীয় ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য কোনো মুসলমান বাদশাহ তিনশত বিঘা লাখেরাজ জমি দান করিয়াছিলেন। পীড়িত বা বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিগণ লোহা-জঙ্গের সমাধি-সমীপে উপস্থিত হইয়া মানসিক-করতঃ অঙ্গ বিশেষে একটি 'লোহার বালা' ধারণ করিলেই নাকি রোগ বা বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। বারায় সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিয়া থাকে,—সোমবার ও বৃহস্পতিবার। সোমবারের হাটে কুম্ভকারগণ পর্য্যায়মত সমাধিতে একটি করিয়া হাঁড়ি দিয়া যায়। চাকরাণ-ভোগি গোয়ালা আসিয়া সেই হাঁড়িতে নিয়মিত ভাবে দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়, দুগ্ধ পশু-পক্ষীতে পান করে। হাঁড়িটি ঠিক সাত দিন পর্য্যন্ত সমাধিতে থাকে, তারপর সাতদিনের রাত্রে সে-টা যে, কে লইয়া যায়, কেহ জানে না। লোহাজঙ্গের বংশধরগণ অনেকদিন বারায়

রাক্ষস ডাঙ্গা

বীরেন্দ্র রায়ের সমাধি

লোহাজঙ্গ সাহেবের মহিমা

বর্ত্তমান ছিলেন। সম্প্রতি সে বংশ লোপ পাইয়াছে। ১৭৫৯ খৃঃ অঃ বোগদাদ সহর হইতে সৈয়দশাহ গোলাম আলী দাস্তগীর-কাদেরী নামে এক সাধু বারায় আগমন করেন। সম্প্রতি তাঁহার দৌহিত্র-বংশীয় সৈয়দশাহ-মহতেশম-আলী আল কাদেরী সাহেব বর্ত্তমান আছেন। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ-জেলার বহু মুসলমান ইহাদের শিষ্য। শুনিয়াছি ইহাদের বাড়ীতে মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের পদ-চিহ্ন-যুক্ত একখণ্ড প্রস্তর আছে। বাড়ীর সম্মুখে একটি কষ্টিপাথরের সুবৃহৎ চৌকাঠ পড়িয়া রহিয়াছে, লোকে বলে তাহার ওজন প্রায় বারশত মণ হইবে! বারায় চল্লিশজন প্রসিদ্ধ পীরের সমাধি বর্ত্তমান। পীরগণের মধ্যে কয়েক জনের নাম জানিতে পারা যায়; যথা—১। শাহ লোহাজঙ্গ খোন্দকার, ২। শাহ টাঁড়াসহিদ, ৩। রাজা বালাশাহ, (বীরেন্দ্রনাথ রায়, বালারাজা নামেও অভিহিত হইতেন। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি বালাশাহ নামে অভিহিত হন) ৪। কুঙারশাহ, (ইনি বালা রাজার পুত্র, কুমার হইতে কোঙার বা কুঙার হইয়াছে) ৫। হয়দর-শাহ, ৬। কাবখিশাহ, ৭। সুলতান শাহ, ৮। নেংটা শাহ, ৯। এরকান শাহ, ১০। সৈয়দ শাহ ফরিদ, ১১। জামাল শাহ, ১২। মোখতুম জিলানী, ১৩। মোখতুম হোসেনি, ১৪। সৈয়দ শাহ গোলাম আলি দাস্তগীর, ১৫। সৈয়দ শাহ আব্দুল জলিল, ১৬। সৈয়দ শাহ মাশুক আলি, ১৭। সৈয়দ শাহ মেহের আলি, ১৯। সৈয়দ শাহ মহরম আলি, ২০। সৈয়দ শাহ গাজ্জারকান আলি, ২১। সৈয়দ শাহ হাজি আব্দুল সামেদ, ২২। একদিল শাহ, ২৩। লাঙ্গ শাহ, ২৪। দড়ক শাহ, ২৫। জামাল শাহ, ২৬। শাহ আজাদ।

মহম্মদের পদচিহ্ন

বারার-পীর

বারাগ্রামে এখন এই কয়টি পাড়ায় লোকের বসতি আছে—১। হৈদরপুর (মুসলমানের বাস) ২। জগৎপুর (মুসলমান ও হিন্দু) ৩। সাইল মাইল (মুসলমান) ৪। কুড়োলপাড়া (কুনাই—মুচি প্রভৃতি) ৫। কৈবর্ত্তপাড়া (হিন্দু) ৬। সাঁকোপাড়া (মুসলমান) ৭। ঠাকুরপাড়া, ৮। গোয়ালপাড়া (হিন্দু) ৯। কুমারপাড়া (হিন্দু) ১০। সেখহাট (মুসলমান) ১১। হাড়িপাড়া, ১২। সরূপবাটী (মুসলমান) ১৩। খোন্দকারপাড়া (মুসলমান) ১৪। মীরপাড়া (মুসলমান) ১৫। বাজারপাড়া, ১৬। কসবাপাড়া (মুসলমান) ১৭। তৈহার মালপাড়া, ১৮। টাঁড়াহাট (মুসলমান)। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি পাড়া এখন মাঠে পরিণত হইয়াছে। সেগুলির নাম চুনারিপাড়া (মাঠ), গণকপাড়া (মাঠ), জোহদ্দিপুর (মাঠ) ইত্যাদি। পাঠানপাড়া, কাজীপাড়া, আদারপাড়া, যুগীপাড়া,

বারার-পাড়া

২৩ নং বারাগ্রামের শিলালিপি।

বীরভূম-বিবরণ

৬৭ পৃষ্ঠা
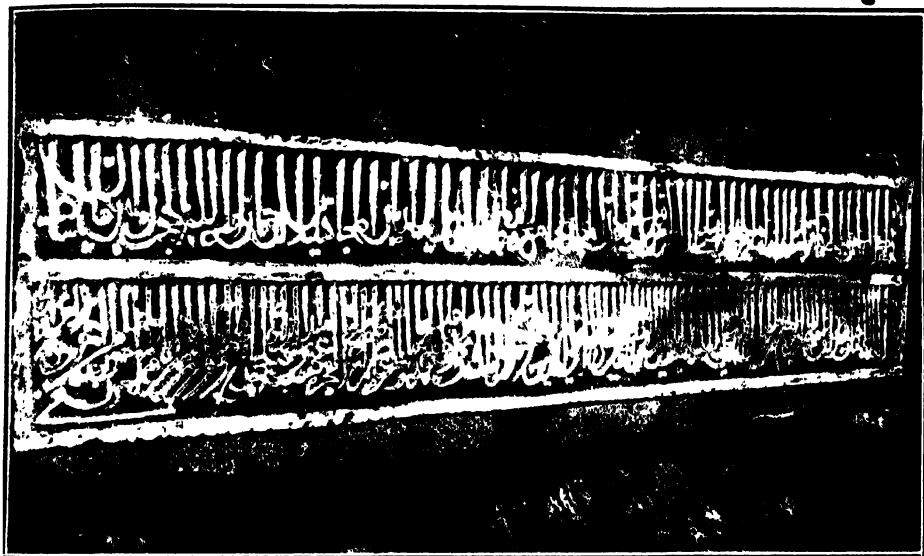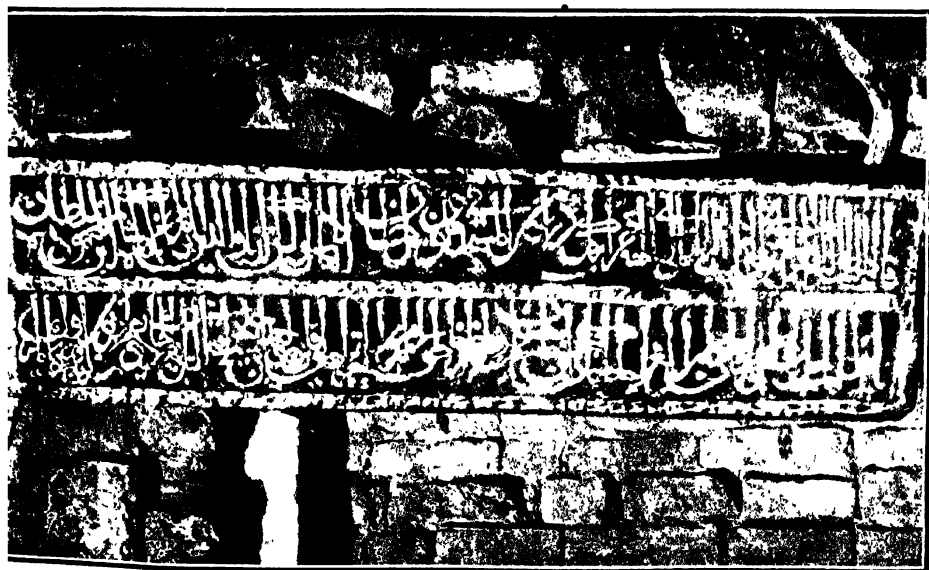
২৪ নং বারাগ্রামের শিলালিপি

বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামও শুনিতে পাওয়া যায়। বারা পূর্ব্বে যেমন জন-বহুল, তেমনি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। এই জন্যই মুসলমানগণ ইহাকে 'কসবায়ে' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কসবায়ে শব্দের অর্থ ছোট সহর। রাক্ষস-ডাঙ্গার উত্তরে নটীগ'ড়ে নামে একটি পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ,—পুষ্করিণী তীরে বারবিলাসিনীগণ বাস করিত। বারায় দুইটি শিলালিপি আছে। একটি আছে লোহাজঙ্গ সাহেবের সমাধিতে, অপরটি রহিয়াছে- মোখদুম হোসেনী সাহেবের সমাধিতে। লিপি দুইটি আরবী-ভাষায় তোগরা-অক্ষরে উৎকীর্ণ। ইহাতে নাকি পীর-দ্বয়ের আগমন ও মৃত্যু-তারিখ লিখিত আছে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম কোতাবা।

বারার শিলালিপি

বারায় হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি যে কত ছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। অত্যাচার উৎপীড়নে পলায়িত হিন্দু-গৃহস্থের সঙ্গে সঙ্গে কত দেব মূর্ত্তি স্থানান্তরে নীত হইয়াছে, অত্যাচারীর অস্ত্রাঘাতে কত মূর্ত্তি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে, কত মূর্ত্তি বিচূর্ণীকৃত হইয়াছে, কত মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে, কত মূর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে, কত মূর্ত্তি পুষ্করিণী জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আজি আর তাহার কে সন্ধান করিবে! গিয়াছে অনেক, কিন্তু অবশিষ্ট যে কয়েকটি আছে, বারার অতীত-গৌরবের পরিচয় প্রদানের পক্ষে বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট। আশ্চর্য্যের বিষয় বারায় একটি পুরাতন মূর্ত্তির আজিও পূজা হয়। অতীতের শত অত্যাচার-উপদ্রব-বিপ্লবের মধ্যেও এই মূর্ত্তিটি এতদিন ধরিয়া কিরূপে যে আপনার পূজার্হতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ভাবিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এই মূর্ত্তি ভূবনেশ্বরী নামে পরিচিতা। দেবী সিংহ পৃষ্ঠে আসীনা রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চরণের সর্ব্ব-নিম্নাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, গলদেশের ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া অনুমান হয়, স্কন্ধচ্যুত মস্তক পুনরায় সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দেবীর নামে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তাহারই যৎসামান্য আয়ে পূজাদির বর্ত্তমান ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। বারায় বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি (?), একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি অষ্টভূজা-চতুর্ব্বদনা-দেবী মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

বারার হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি

বারার পূর্ব্বদিকে কুমারষাণ্ডা গ্রাম। গ্রামে এখন কেবল মুসলমানের বাস। এই গ্রামের এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে একটি গঙ্গামূর্ত্তির ভগ্নাংশ, ও তাহার নিকটেই একটি শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছে। শিবের ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির ছিল, এখন আর তাহার চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নাই। কুমারষাণ্ডার দক্ষিণে তিলোড়া নামক

কুমার ষাণ্ডার হিন্দু দেবতা

গ্রামে একটি ব্রহ্মামূর্ত্তি, একটি গঙ্গামূর্ত্তি ও একটি হিরণ্য-কশিপুর মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলির পূজা হয়। গ্রামে হিন্দুর বাস আছে তবে ব্রাহ্মণ নাই। বিভিন্ন গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া নিত্য পূজা করে। লোহাপুরের দক্ষিণে বাণেশ্বর ও নগরা গ্রাম। বাণেশ্বর ও নগরায় একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি বাসুদেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নিকটেই সাহাকর-দীঘি নামে একখানি গ্রাম আছে। দীঘির নামেই গ্রামের নাম। গ্রামে অর্থাৎ দীঘির পশ্চিম পাড়ে' কয়েক ঘর মালের বাস। দীঘিটি খুব ছোট না হইলেও চৈত্র-বৈশাখ মাসে এখন আর দীঘিতে প্রায় জল থাকে না। সেই সময় দীঘি হইতে পাঁক উঠাইয়া লইয়া কৃষকেরা আপন আপন ক্ষেতে ছিটাইয়া দেয়। বীরভূমের বহু স্থানে এইরূপে 'সারের' পরিবর্ত্তে জমিতে পাঁক দেওয়া হইয়া থাকে। একবার সাহাকর দীঘি হইতে পাঁক তুলিবার সময় মালেরা একটি 'শ্রীকৃষ্ণজননী' মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১) ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ী ভদ্রপুর,—লোহাপুর-ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নহে। ভদ্রপুরের পশ্চিমে আকালীপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। মহারাজ নন্দকুমারের অনেক পূর্ব্বে আকালীপুরে কোনো রাজা বাস করিতেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। পুর পরিখা এখন ছোট আগড় ও বড় আগড় নামে পরিচিত। কেহ বলেন গ্রামের নাম ছিল আক্কেলপুর, কেহ বলেন আলেকপুর ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু গ্রামের প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারেন না। যাহা বলিতে পারেন, সে ঐ কেবল 'এক ছিল রাজা'! আকালীপুরেই মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিতা গুহ্যকালিকা দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন। এই গ্রামের মধ্যে গ্রামদেবতা-তলায় কতকগুলি ভগ্ন-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া অনুমিত হয়, এই স্থান মহারাজ নন্দকুমারের বহু পূর্ব্ব হইতেই বীরভূমের শক্তি-উপাসনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ও বহুকাল পূর্ব্বেই আকালীপুরে তান্ত্রিক মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আকালীপুরের নিকটেই দেবগ্রাম, দেবগ্রামে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রায় অক্ষত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। দেবগ্রামের পশ্চিমে কয়থা একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত কস্তরডাঙ্গা নামক উচ্চ-স্তূপকে লোকে 'কস্তর' রাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

বারার নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন স্থান, প্রবাদ ও দেবমূর্ত্তি আদি

(১) এই শ্রীকৃষ্ণজননী মূর্ত্তি, নগরা ও বাণেশ্বর (চলিত নাম বাণসোয়া) হইতে কয়েকটি মূর্ত্তি এবং আরো নানা স্থান হইতে নানাবিধ মূর্ত্তি-প্রস্তরাদি বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া হেতমপুর রাজবাটীতে অনুসন্ধান সমিতির কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে।

৩৫ নং তিলোরাগ্রামে প্রাপ্ত ব্রহ্মা ও হিরণ্যকশিপু-মর্ত্তি।
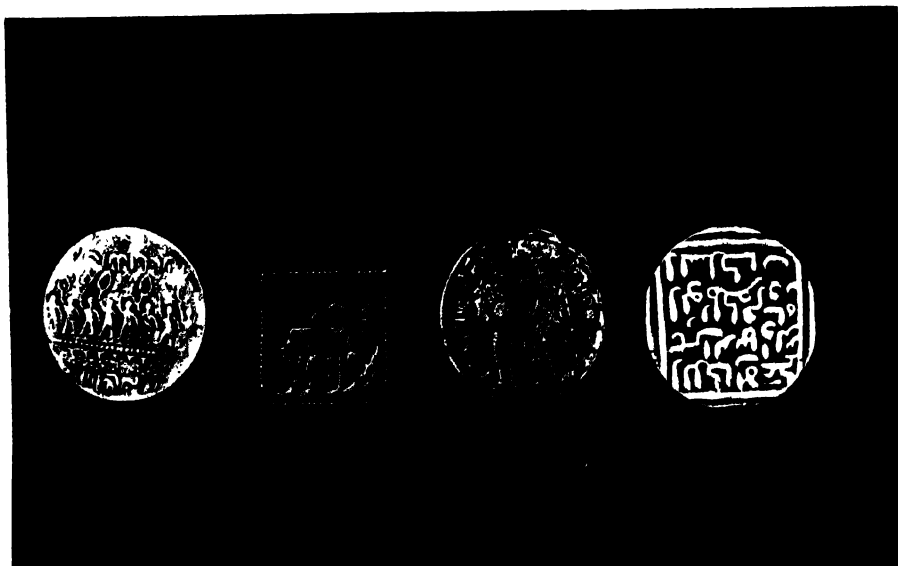
৩৬ নং দাঁড়কের মাঠে প্রাপ্ত মুদ্রার এক দিক।

বালানগর নাম শুনিয়া মনে কেমন সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, 'বালাদিত্য' নামের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই তো? খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজপুতনার মরু প্রদেশের পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা সপ্তসিন্ধুর মুখ ও বাহ্লীক হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করেন। সুতরাং রাঢ়ও ইহার মধ্যেই ছিল। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে তাঁহার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুপ্তবংশীয় দিগ্বিজয়ী মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার হস্ত হইতে এই দেশ অধিকার করিয়া লন। গুপ্তবংশে মহারাজ নরসিংহগুপ্তের উপাধি ছিল—বালাদিত্য। বীরভূমের নান্নুরে নরসিংহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা হউক রাঢ় যে গুপ্তরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। প্রাচীন গুপ্তবংশের রাজ্যাবসানের প্রায় চারিশত বর্ষ পরেও বাঙ্গলার স্থানে স্থানে কুমারামাত্যাধিকরণ মণ্ডলাধিকরণ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীগণের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ইহারা যে, স্ব স্ব রাজকার্য্যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ব্যবহৃত গুপ্তরাজ মুদ্রা ও ব্যবহার করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নরসিংহের পুত্র ২য় কুমারগুপ্তের পর আর প্রাচীন গুপ্তবংশের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি মুদ্রা হইতে কিন্তু বিষ্ণুগুপ্ত, জয়গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এদিকে মন্দশোর লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, যে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব গঙ্গাশ্লিষ্ট-সানু-হিমাদ্রি হইতে তালিবন-গহন-মহেন্দ্র উপত্যকা ও লৌহিত্যের উপকণ্ঠ হইতে পশ্চিম পয়োনিধি পর্য্যন্ত ভূমিভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে সন্দেহ উপস্থিত হয়, হয়তো গুপ্তবংশীয় কেহ আসিয়া রাঢ়ের নিভৃত প্রদেশে এই বালানগর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। কুমারষাণ্ডা গ্রাম বালানগরের নিকটবর্ত্তী। কুমার-গুপ্ত নামের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ থাকাও বিচিত্র নহে। অবশ্য এসমস্তই আমাদের অনুমান মাত্র। অনুমানের কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

বালানগর সম্বন্ধে সন্দেহ

কুমারষাণ্ডায়,—কুন্তীর অবস্থিতি, বালানগরই-বারণাবত, এ প্রবাদ যে কিরূপে সৃষ্ট হইল, অনুমান করা কঠিন। বীরভূমে একচক্রা, পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাসের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; মহাভারতীয় বনপর্ব্বে উল্লিখিত—পাণ্ডবগণের তীর্থ-পর্য্যটন ব্যপদেশে এতদ্দেশে আগমনের ক্ষীণ স্মৃতি, একচক্রার নাম সাদৃশ্যের সঙ্গে জড়িত হইয়া, হয় তো এই রূপ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। বারা একচক্রার অদূরবর্ত্তী, এবং পূর্ব্বে বোধ হয় কোনো সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাই বারার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই আমাদের

প্রবাদ ও অনুমান

অনুমান। গুপ্তরাজগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার অন্যতম ভাষ্য-বিবৃতি স্বরূপ পাণ্ডবগণের জীবনকাহিনীর (বীরভূমে প্রচলিত প্রবাদের বিষয়ীভূত) এই অংশ, গুপ্তপ্রভাবের পরিচয়-দ্যোতক কিনা, তাহাও চিন্তার বিষয়।

বারা ও নগরা প্রভৃতি অঞ্চলে বাণরাজার রাজত্বের যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার হয় তো একটা অর্থসঙ্গতি থাকিতে পারে। এই অঞ্চল একসময় আসামের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। গুপ্তবংশীয় নরেন্দ্রগুপ্ত যখন গৌড়েশ্বর, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক তখন তাঁহার প্রধান সামন্ত এবং বন্ধু ছিলেন। এই সময়ে মালবে গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হয়, মালবরাজ দেবগুপ্ত প্রবল হইয়া স্থাণ্বীশ্বররাজের ভগিনীপতি মৌখরি-রাজ গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করিলে, এদিকে মহাসেন-গুপ্ত মালব ছাড়িয়া স্থাণ্বীশ্বরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয় রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যেই মাধবগুপ্ত মগধ সিংহাসন অধিকার করেন। সেই জন্যই বোধ হয় গৌড়েশ্বর নরেন্দ্রগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বর রাজের সহিত শত্রুতা চরণে বদ্ধপরিকর হন। তাই রাজ্যবর্দ্ধন যখন স্বীয় ভগিনীপতি-নিহন্তা দেবগুপ্তকে নিহত করিয়াছিলেন, তখন নরেন্দ্রগুপ্ত দেবগুপ্তের সাহায্যার্থ গিয়া কৌশলে রাজ্যবর্দ্ধনের বধ সাধন করেন। এই হত্যাকাণ্ডে শশাঙ্কের যোগ ছিল। হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নরেন্দ্রগুপ্ত ও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের মৃত্যু হয়। কিন্তু শশাঙ্ক একাকীই হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। গৌড়েশ্বরের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজন্যগণ সকলেই শশাঙ্ককে বিশেষ ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। এই জন্যই তিনি যখন হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত, প্রাগ্জ্যোতিষরাজ-ভাস্করবর্ম্মা সেই সময় স্বয়ং উপযাচক হইয়া হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পশ্চিম ও পূর্ব্ব হইতে হর্ষ ও ভাস্করের যুগপৎ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শশাঙ্কদেব কর্ণসুবর্ণ পরিত্যাগে বাধ্য হন। ময়ূরভঞ্জ সীমায় বেণুসাগর নামক স্থানে শশাঙ্কের দ্বিতীয় রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শশাঙ্কের পরিত্যক্ত রাজধানী অধিকার করিয়া আসামের ভাস্করবর্ম্মা কিছুদিন এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আসামের-ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহাশয় শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড হইতে ভাস্কর-বর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহাতে লিখিত আছে,—

রাঢ় ও আসাম

২৭ নং বারাগ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি।
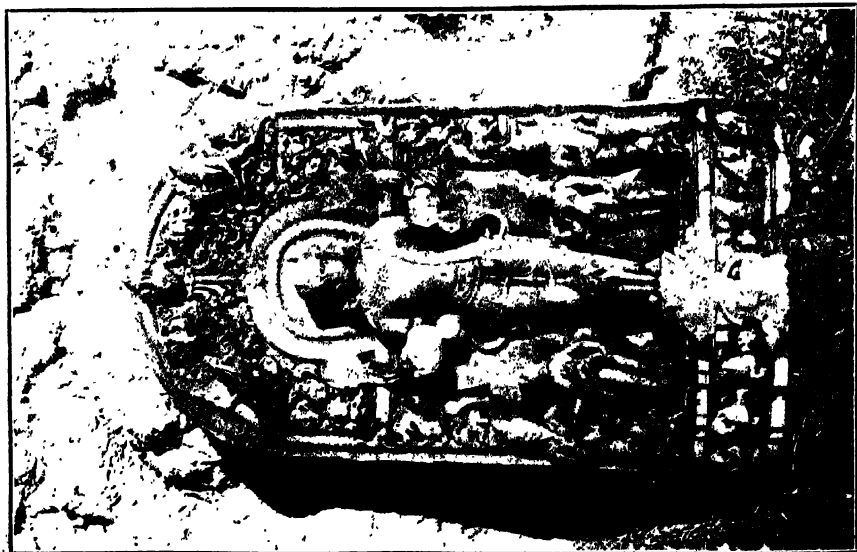
২৮ নং বারাগ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্য-মূর্ত্তি।

"মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তিসংপত্ত্যা জয়শব্দাবর্ষস্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ।" কর্ণসুবর্ণ-সমাবাসিত জয় স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐই সময় ভাস্করবর্ম্মা বা তাঁহার কোনো প্রতিনিধি হয় তো উক্ত বারা (নগরা ও বানশোরা সম্মিলিত) অঞ্চলে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মার রাজত্ব হইতেই বোধ হয় বাণ রাজার রাজত্বের প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। বাণ, নরক, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজগণের আবাসভূমি ছিল আসাম। ভাস্কর-বর্ম্মা আপনাকে ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দান করিতেন। বাণাদি সকলেই পরম শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ, ভাস্কর বর্ম্মাও শৈব ছিলেন। তাঁহার দূত গিয়া শ্রীহর্ষকে বলিয়াছিল—"কামরূপ-পতির শৈশব হইতে সংকল্প যে, মহাদেবের চরণ-যুগল ব্যতীত আর কোথাও মাথা নোয়াইবেন না"। সুতরাং এই ভাস্কর-বর্ম্মা হইতে বাণ রাজার প্রবাদ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের মনে হয় এই সময়েই—খৃষ্টীয় সপ্তম-শতাব্দীর প্রথমভাগে কামরূপ হইতেই এতদ্দেশে তান্ত্রিক-মতের আমদানী হইয়াছিল। কালিকা-পুরাণের মত যে এক সময় এ অঞ্চলে দৃঢ়তর-রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,—পাইকোড় এবং তারাপুর-কাহিনীর আলোচনায় আমরা তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি। কামরূপ-মাহাত্ম্যই কালিকা-পুরাণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। এই জন্য অনুমান হয়, কামরূপ হইতে এই সময়েই কালিকা-পুরাণোক্ত উপাসনা পদ্ধতি রাঢ়ে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

আসামের প্রভাব

রাজা অশোকের কোনো অনুশাসন রাঢ়ে আবিষ্কৃত না হইলেও ইহা নিশ্চিত-রূপে বলিতে পারা যায়, যে অশোক-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম রাঢ়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। মৌর্য্যাক্ষী বা ময়ূরাক্ষী (নদী), মৌরপুর, মৌর্য্যেশ্বর বা মৌরেশ্বর, মুরারই প্রভৃতি নাম যেন মৌর্য্য-রাজত্বের ক্ষীণ স্মৃতির শেষ নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। ইহার পরেই নলরাজগণের সময়ে রাঢ়ে বোধ হয় কিছু দিন সীতা-রামের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। বীরনগর-কাহিনীর আলোচনায় সীতা-পাহাড়ী প্রভৃতি স্থানের প্রচলিত প্রবাদে আমরা যেন তাহারই আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছি। নলহাটীর পাহাড়ে সীতার পদ-চিহ্নও যেন এই বিষয়েরই ইঙ্গিত করে। পুষ্করণার চন্দ্রবর্ম্মা চক্রস্বামী (বিষ্ণু)র উপাসক ছিলেন। গুপ্তরাজ-গণও বৈষ্ণব ছিলেন। এই সময়েই রাঢ়ে বাসুদেবমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হয়। সমুদ্রগুপ্তের কৃপায়—এদেশে বৈদিক ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা শশাঙ্ক পরম-শৈব ছিলেন। তাঁহার সময়ে, শিবো-

রাঢ়ে বৈদেশিক প্রভাব

পাসনা এদেশে বহুলরূপে প্রচলিত হয়। ভাস্করবর্ম্মাও শৈব ছিলেন এবং তাঁহারই সময়ে কামরূপ হইতে আনীত তান্ত্রিক-মত এদেশে প্রসার লাভ করে। তৎপূর্ব্বে যে তান্ত্রিক মত এদেশে প্রচলিত ছিল না, একথা অবশ্য জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য যে, আমরা হিন্দু তান্ত্রিকতাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছি। শৈবগণ যে কেবল শিবেরই উপাসনা করিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা শিব শক্তি উভয়েরই উপাসনা করিতেন। মৎস্য-পুরাণে (২৬০ অধ্যায়) লীলা-ললিত-বিভ্রম উমা-মহেশ্বরের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, এতদঞ্চলের হর-গৌরীর যুগল-মূর্ত্তিগুলি অবিকল প্রায় সেইরূপ। এই মূর্ত্তি বীরভূমের প্রায় যেখানে সেখানে বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

রাঢ়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের নিদর্শন

আমরা বীরভূমে বুদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধ-তন্ত্রোক্ত অবলোকিতেশ্বর ও তারা প্রভৃতির মূর্ত্তি, এবং গণেশ, গঙ্গা, শিব, দুর্গা, কালী, বাসুদেব, সূর্য্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুসন্ধান করিলে রাঢ়ে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন সকল মতেরই বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাঢ়ের নিজস্ব ধর্ম্ম ছিল, বৈদিক-হিন্দু ধর্ম্ম। তবে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আন্দোলনের পর হইতে রাঢ়ে বৈদেশিক-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজকীয় প্রভাবের সহিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতও যে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ইহা বলিবার জন্যই আমাদের এত কথার অবতারণা। এক বারাতেই বহু বিভিন্ন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বারার নিকটবর্ত্তী স্থানেও যে সমস্ত বিচিত্র-রকমের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলিও যারপর নাই কৌতূহল-জনক, তাই অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বারা-কাহিনীর মধ্যেই আমাদিগকে এই সমস্ত কথার অবতারণা করিতে হইল।

বারায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সিংহবাহিনী ভুবনেশ্বরী দেবীর সিংহটীকে দেখিয়া কেমন সন্দেহ উপস্থিত হয়। মূর্ত্তিটী কিন্তু অনেক দিনেক পুরাতন। ইহা কি হিমাচল-স্থিতা সিংহবাহনাসীনা কিশোরী-গৌরীর মূর্ত্তি? বারার সূর্য্যমূর্ত্তি—মৎস্য-পুরাণোক্ত সূর্য্য-প্রতিমার সহিত যেন অনেকটা মিলিয়া যায়। (৩) আমরা মৎস্য-পুরাণ (২৬১ অধ্যায়) হইতে প্রভাকর-প্রতিমা লক্ষণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(৩) সাগরদীঘিতে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি বারার সূর্য্যমূর্ত্তি হইতে আকারে বড়। ইহার কীর্ত্তিমুখ ও চালচিত্রের গঠনপ্রণালী ভিন্নরূপ। ইহা ছাড়া অপরাপর বিষয়ে প্রায় ঐক্য দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটি এখন ষ্টেশনের অনতিদূরে সাগরদীঘির তীরে একটি ইষ্টক-

২৯ নং সাগর দীঘিতে প্রাপ্ত সূর্য্য-মূর্ত্তি ।

৩০ নং বারাগ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভুজা-মূর্ত্তি ।

*　*　*　*　*　*
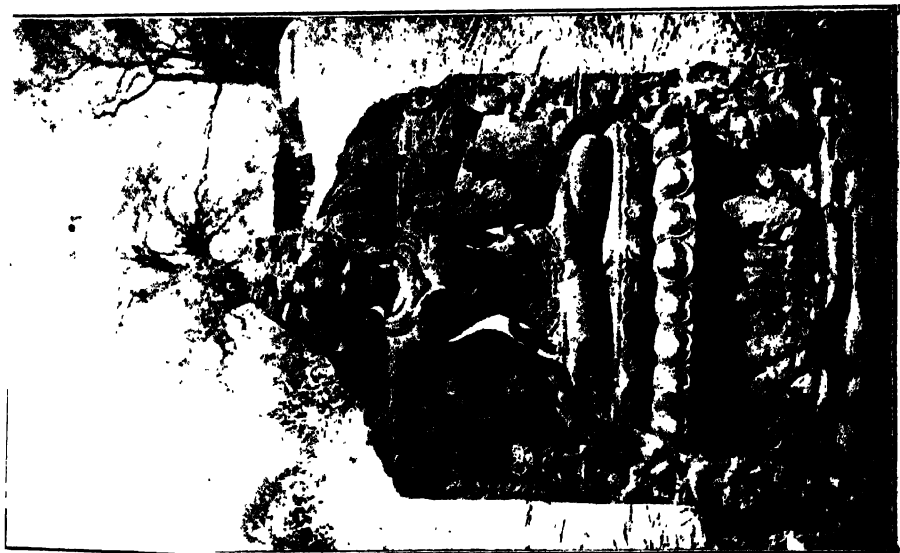
রথস্থ কারয়ে-দ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্ ॥
সপ্তাশ্ব চৈক চক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ।
মুকুটেণ বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভ সম প্রভম্ ॥
নানাভরণ ভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃত পুষ্করম।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে তে-তুলীলয়ৈব ধৃতে সদা ॥
চোলক চ্ছন্ন-বপুষং কচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ।
বস্ত্রযুগ্ম সমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ ॥
প্রতীহারৌ চ কর্ত্তব্যৌ পার্শ্বয়োর্দণ্ডি-পিঙ্গলৌ।
কর্ত্তব্যৌ খড়্গ হস্তৌ তৌ পার্শ্বয়োঃ পুরুষাবৃভৌ ॥
লেখনী-কৃত-হস্তঞ্চ পার্শ্বে ধাতার-মব্যয়ম।
নানা দেবগণৈর্যুক্ত-মেবং কুর্য্যাদ্দিবাকরম্ ॥
অরুণঃ সারথীশ্চাস্য পদ্মিনী-পত্র-সন্নিভঃ।
অশ্বৌ সুবলয় গ্রীবাবন্তস্থৌ তস্য পার্শ্বয়োঃ ॥
ভুজঙ্গ-রজ্জুভির্বদ্ধাঃ সপ্তাশ্ব রশ্মি-সংযুতা।
পদ্মস্থং বাহনস্থং বা পদ্মহস্তং প্রকল্পয়েৎ ॥

প্রভাকর প্রতিমা লক্ষণ

অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তিটির হস্তগুলি, দক্ষিণ জানু এবং বক্ষাংশ কর্ত্তিত, চালচিত্র ভগ্ন। যে বিচিত্রপাদপীঠখানির উপর মূল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, অত্যাচারীর কঠোর হস্তের নির্ম্মম-স্পর্শে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। যে খিলানের

বেষ্টনীর মধ্যে রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সাগরদীঘি গ্রাম হইতে এক নূতন প্রকারের বিষ্ণু মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাগর দীঘিতে প্রাপ্ত অপর একটি বিষ্ণু মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিয়া—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাসে—তাহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহীপালের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত একটি দ্বাদশ-হস্তযুক্ত মূর্ত্তির চিত্র মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে। লয়ার্ড সাহেব প্রভৃতি উক্ত মূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিখিলবাবু বলেন 'দ্বাদশভুজ প্রায় হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি মধ্যে দৃষ্ট হয় না'। আমরা কিন্তু মৎস্য-পুরাণে দ্বাদশহস্তযুক্ত কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছি।

"স্থাপয়েৎ খেট নগরে ভুজান দ্বাদশ কারয়েৎ।
ভুভুর্জঃ খর্ব্বটে স্যা-বনে গ্রামে দ্বিবাহকঃ ॥ (মৎস্য-পুরাণ ২৬০ অধ্যায়)

তবে মহীপালের মূর্ত্তির দ্বাদশ-হস্তের দশটি হস্তে পদ্ম ও পদ্মের উপরে বৃষ প্রভৃতি অঙ্কিত আছে, কিন্তু মৎস্য-পুরাণে কার্ত্তিকেয়ের হস্ত, শক্তি, পাশ প্রভৃতি অস্ত্র-নিচয়ে সুশোভিত রহিয়াছে।

দ্বারা মূর্ত্তি ও পাদ-পীঠ পরস্পর সংলগ্ন ছিল, সে খিলান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির চারিটি মুখের মধ্যে তিনটি সম্মুখে এবং অপরটি পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত। সম্মুখের তিনটি মুখই নাসিকাহীন, পশ্চাদ্ভাগের শিরোমুকুট ভগ্ন। সম্মুখের মুখ হইতে পশ্চাতের মুখের গঠণ প্রণালী ও সম্পূর্ণ পৃথক। এ দিকে কণ্ঠে ও কর্ণে কোনো ভূষণ নাই, মস্তকের কেশরাশি বেণীবদ্ধ হইয়া দুইপার্শ্বে লম্বমান। কণ্ঠহার ও নীবি-বন্ধাদির গ্রন্থিরাজি পশ্চাদ্দিকে অঙ্কিত রহিয়াছে। অত্যাচারীর ম্লান-হস্তাবলেপ শত-প্রযত্নে ও মূর্ত্তির অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। অযত্ন-অত্যাচারের পুঞ্জীকৃত বেদনা-রাশি বক্ষে-বহিয়া,—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি-হিম রৌদ্র মাথা পাতিয়া সহিয়া এ মূর্ত্তির চির-নবীনতা যেন আজিও অটুট। বদন-এয় যেন স্মিত-হাস্যের স্বর্গীয় দ্যুতিতে সমুদ্ভাষিত! দেবীমূর্ত্তি অষ্টদল পদ্মের উপর "পদ্মাসনে" উপবিষ্ট। পাদপীঠে একটি মন্দির চিহ্নক্ষোদিত,—তাহার মধ্যে (বিষ্ণুর) বাসুদেব মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। পাদপীঠের উভয় পার্শ্বস্থ অপর চারিটি মূর্ত্তি দেখিলেই "অযন্তার" চিত্রের কথা স্মৃতি পথে উদিত হয়। এই মূর্ত্তিটিকে আমরা "শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধাধিষ্ঠাত্রী মহাসরস্বতী" মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর নাগোজীভট্টকৃত টীকায় এই মূর্ত্তির ধ্যান বর্ণিত আছে।

বারার অষ্টভুজা-দেবী

মহা-সরস্বতীর ধ্যান—

"ঘণ্টাশূল হলানি শঙ্খ মুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কং,
হস্তাব্জৈঃ দধতীং ঘনান্ত-বিলস-চ্ছীতাংশু তুল্য প্রভাম্।
গৌরি-দেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতা মাধারভূতাং
মহাপূর্ব্বামত্র সরস্বতী মনুভজে চ্ছুম্ভাদি দৈত্যার্দ্দিনীম্॥

মহাসরস্বতীর ধ্যান

মহালক্ষ্মী, মহাকালী, ও মহাসরস্বতীর, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ক্রম এবং অপরাপর বিবরণ, ১ম খণ্ড বীরভূম-বিবরণ, বক্রেশ্বর—কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কুমার-বাণ্ডা গ্রামে একটি ভগ্ন মূর্ত্তির আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। মূল-মূর্ত্তির পাদপীঠে একটি মকর রহিয়াছে। দক্ষিণে গণেশের মূর্ত্তি,-বাম হস্ত ভগ্ন, কিন্তু প্রসারিত শুণ্ড দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়—এই হস্ত স্থিত পাত্র হইতে তিনি মোদক গ্রহণ করিতেছেন, দক্ষিণ হস্তে একটি টাঙ্গি; সচরাচর চতুর্ভুজ গণেশই দেখিতে পাওয়া যায়, এ গণেশ দ্বিভুজ। বামপার্শ্বের মূর্ত্তি ভগ্ন। গণেশের পদতলে দুইটি সিংহ এবং বাম পার্শ্বের মূর্ত্তির পদতলে দুইটি হরিণ রহিয়াছে। কুমার বাণ্ডার নিকটবর্ত্তী তিলোরা গ্রামে ঠিক এইরকমের একটি

কুমার বাণ্ডার গঙ্গামূর্ত্তি

৩১ নং বারাগ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভুজা দেবীর পৃষ্ঠদেশের দৃশ্য।

কুমারষাণ্ডা-গ্রামের গঙ্গামূর্ত্তির ভগ্নাংশ
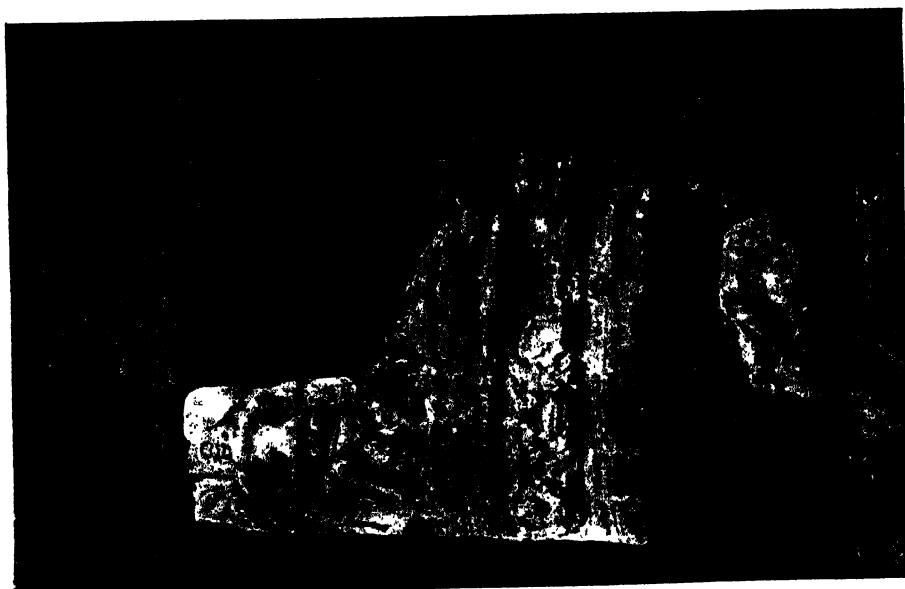
সম্পূর্ণ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির পদমূলে মকর; বামে ও দক্ষিণে কার্ত্তিক ও গণেশ, এবং ভ্রাতৃযুগলের পদতলে যথাক্রমে একটি হরিণ ও একটি সিংহ আছে। দেবী মূর্ত্তির দক্ষিণ-উর্দ্ধ-হস্তে গৌরী-পট্টসহ শিব-লিঙ্গ, অধোহস্তে বর, বাম-উর্দ্ধ হস্তে বীণা ও অধোহস্তে একটি কমণ্ডলু, মস্তক মুকুটালঙ্কারে সুশোভিত। ইহা গঙ্গা দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। বারার প্রান্ত-বাহিনী গম্ভীরা-নদী অদূরবর্ত্তী যে বশিয়া-বিলে পড়িতেছে, গঙ্গার প্রাচীন-স্রোত মজিয়া সেই বশিয়া-বিলের সৃষ্টি। সুতরাং গঙ্গার তটান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে যে গঙ্গা পূজা প্রচলিত থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে গঙ্গাপূজা প্রচলিত রহিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী গঙ্গা-পূজার বিশেষ তিথি-রূপে দশহরা নামে আখ্যাত হইয়াছে, রাঢ়ে আজিও এই অনুষ্ঠান অব্যাহত। প্রায় চারি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কুমার-ষণ্ডায় মহাসমারোহে গঙ্গাপূজা হইত।

ডিলোড়ার গঙ্গামূর্ত্তি

রাঢ়ে গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ও গঙ্গাপূজা

আকালী পুরে যে কয়েকটি ভগ্ন মূর্ত্তির-আলোক-চিত্র গৃহিত হইয়াছে,—তাহাদের মধ্যস্থলে নাগ-ছত্রতলে অবস্থিত দেবীমূর্ত্তিটি বোধ হয় মনসা বা নাগকন্যা। এই মূর্ত্তির বামপার্শ্বস্থিত মূর্ত্তি ক্ষেত্র পালের বলিয়া অনুমিত হয়, আবার কণ্ঠহার ও কটিভূষণ দেখিয়া সন্দেহ আসিয়া পড়ে, হয়তো বা অন্যদেবমূর্ত্তি ও হইতে পারে। মনসা মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে যে মূর্ত্তির চিত্র রহিয়াছে, তাহা যে-কোনো তান্ত্রিক মূর্ত্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নস্থিতা শবাসনে আসীনা দেবীমূর্ত্তির উর্দ্ধদেশে অপর একটি শব-শায়িত রহিয়াছে, তাহার বক্ষে মাত্র একটি চরণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় শবাসনা অপর দুই মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির আকারগত পার্থক্য ছিল। কালিকা পুরাণে (৬১ অধ্যায়) উগ্রতারা ও শিবদূতীর যে ধ্যান বর্ণিত আছে,—তাহাতে উগ্রতারার বামপদ শব-বক্ষে, দক্ষিণ পদ সিংহ-পৃষ্ঠে এবং শিবদূতীর দক্ষিণপদ শব-হৃদয়ে ও বামপদ শৃগালোপরি সংন্যস্ত থাকিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরোক্ত মূর্ত্তি শিবদূতীর মূর্ত্তি ছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। এই মূর্ত্তি যেন আকালীপুরের অতীত তান্ত্রিক-প্রধান্যের একটি বিলুপ্ত-চিত্রের ক্ষীণ আভাস স্মৃতি-পথে আনিয়া উপস্থিত করে।

আকালীপুরে তান্ত্রিক মূর্ত্তি

বারার আরবী-শিলালিপির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত মহতেশম আলী তাহা হইতে বারার মুসলমান আমলের দুইটি সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। প্রথমটির হিজিরা সন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় খৃষ্টাব্দ গণনা আমাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়টির তিনি মাত্র খৃষ্টাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। হিজরী সন না পাওয়ায় এই খৃষ্টাব্দ নির্ণয় নির্ভুল হইয়াছে কি না

বারার লিপির কালনির্ণয়

জানিতে পারা গেলনা। বীরেন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে যে প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সমস্ত অংশে বিশ্বাস হয় না। বারায় মুসলমান সাধুর আগমন এবং তৎ কর্তৃক রাজা বীরেন্দ্রকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান সত্য হইতে পারে। রাজার অত্যাচারে বারা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের পলায়ন কাহিনীতে ও অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। কিন্তু চারি পাচশত বৎসর পূর্ব্বে একটা জলজীয়ন্ত রাক্ষসের অবির্ভাব ও তৎকর্তৃক নিত্য নিয়মিত মানব ভক্ষণ, ইহা বস্তু বিশেষের প্রবল ধূমে সমাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্যত্র স্থান পাইবে কিনা সন্দেহ। রামায়ণ মহাভারতের রাক্ষসকে অবিশ্বাস না করিবার প্রধান কারণ, সেকালের আম-মাংস ভোজী অনার্য্য-জাতির অস্তিত্ব। আমাদের মনে হয় একচক্রার পাণ্ডব-ঘটিত প্রবাদ কাহিনী বহুশত-বৎসর পরে বীরেন্দ্র রায়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে। অথবা সেকালে নবাগত মুসলমানগণ কেহ কেহ স্থানে স্থানে যেরূপ অত্যাচার করিতে-ছিলেন, বারায় তাহা অতিরঞ্জিত হইয়াই পৌছিয়াছিল। বিশেষ,—সনাতন-কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া জোর পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরের দীক্ষাদান - হিন্দুগণ যাহাকে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম বলিতেন, তাহা যে রাক্ষুসে-কাণ্ড বলিয়াই ধর্ম্ম রক্ষক ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রতিভাত হইবে -ইহাই স্বাভাবিক। বারায় ব্রাহ্মণগণ রাজা বীরেন্দ্রকে তাই রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হাওয়ার শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিম্বা মুসলমান-আগমনের কথা লোক পরম্পরায় ব্রাহ্মণগণপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, এদিকে রাজার অত্যাচারও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বারা বাসিকে সম্ভাবিত বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হয়তো ইহাই বারায় 'ব্রাহ্মণশাপ' নামে কথিত হইয়া থাকে এবং মুসলমানগণ আপনা-দের রাক্ষস অপবাদ গোপনের জন্য শেষে স্থানিয় প্রবাদে রং ফলাইয়া ঐরূপ উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বারায় রাক্ষসের প্রবাদ ও তাহার আলোচনা

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলায় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, আবিসিনীয় ক্রীতদাসগণ প্রবল হইয়া গৌড়ে রাজ-বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ৮৯২ হিজরীতে প্রভুহন্তা ক্রীতদাস বারবককে হত্যা করিয়া মালীক আণ্ডিল নামে অপর একজন হাবসী গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হোসেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ হইয়াছিলেন। হোসেনের রাজত্বকালে অনেক মুসলমান সাধু পশ্চিম হইতে এদেশে আগমন করেন। মুর্শিদাবাদ সেখের দীঘির শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় ঐ দীর্ঘিকা উক্ত বাদশাহের খনিত। ঐ দীঘি খননের

সমসাময়িক বাঙ্গালা

[illegible] নং বারা গ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভুজা মূর্তির পাদপীঠ।
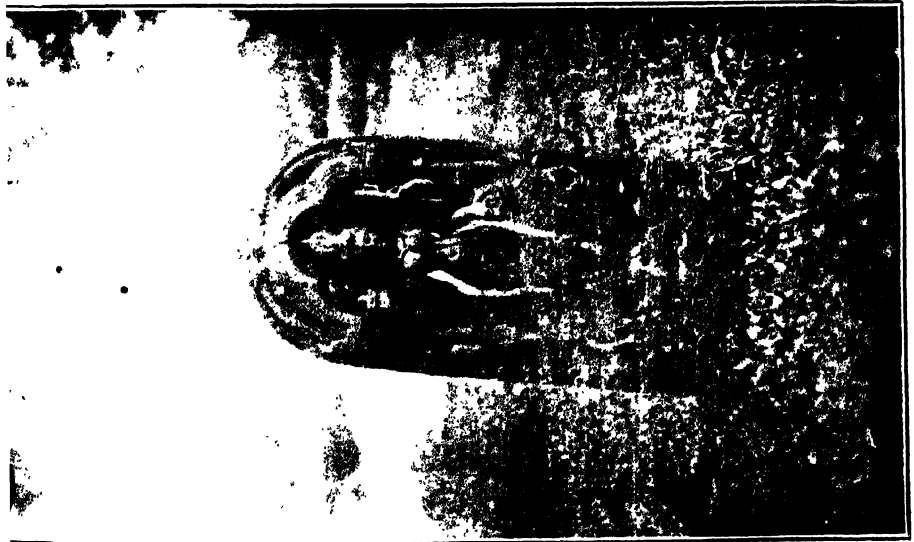
৩৭ নং তিলোরাগ্রামের গঙ্গা-মূর্তি।

সময় তথায় আবু সৈয়দ ত্রিমিজী (তাব্রিজ-সহর হইতে আগত) নামে এক মুসলমান সাধু আগমন করেন, গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ৬৬ বিঘা লাখেরাজ ভূমি ও মস্তফাবাদ নামে মৌজা প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান ফকিরগণ ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে অধিকাংশস্থলেই এইরূপে রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লোহাজঙ্গ সাহেবের বারায় আগমনের সময় বীরভূমির রাজধানী নগরে 'বীর' উপাধিধারী রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তখনো বীরভূমির কিয়দংশ প্রায় স্বাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুলতান গিয়াসউদ্দিন-ইয়ুজ লখণোর অধিকার করিয়া উত্তর রাঢ়ে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১২২৬ খৃঃ ইহার মৃত্যু হয়, তাহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের শাসনকর্ত্তার পদে যে কয়জন শাসকের নাম পাওয়া যায়, ইঁহাদের মধ্যে ইতিহাসে আওর খাঁ ও তোগানখাঁর সংশ্রবে লখ্ণোরের উল্লেখ আছে। অতঃপর লখ্-ণোরের শাসনকর্ত্তা করীমউদ্দিন লাঘ্রীর সহিত উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহদেবের সংঘর্ষের পরিচয় পাই। এই ঘটনা ১২৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবাদ আছে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (ঐতিহাসিক মতে ১২৪৪ খৃঃ অঃ) লখণোর পার্ব্বত্যজাতি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, মালিক পিণ্ডার নামক পশ্চিম বঙ্গের জনৈক শানকর্ত্তার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতঃপর বাঙ্গালা দেশ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। সুবর্ণগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের, সপ্তগ্রাম দক্ষিণবঙ্গের এবং গৌড় পশ্চিমবঙ্গের শাসনকেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ও পরে কয়েক বৎসর, সুবর্ণগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা,—পরস্পর দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিবাদে রত ছিলেন। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সুযোগে বীর উপাধিধারী এক হিন্দু জমিদারবংশ লখণোরে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সময় মহম্মদ বিন্ তোগলক শাহ—যিনি ইতিহাসে কতকটা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া বর্ণিত, দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিবস ধরিয়া দিল্লী ও দেবগিরি যাতায়াতে ব্যস্ত থাকায় এ সব হাঙ্গামায় মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ফিরোজ সাহ সম্রাট হইয়া, গৌড়েশ্বর (দুর্ভেদ্য একদলা দুর্গের অধিস্বামী) সামসউদ্দিন ইলিয়াসকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাহার পর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত—রাজাগণেশ, দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব এই তিনজন হিন্দু নরপতি, বাঙ্গালীর সাধের-স্বপ্ন সফল করিয়া বাঙ্গালার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; পরাধীনতার লৌহনিগড় ভঙ্গ করিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ

তৎসাময়িক বাঙ্গালা ও বীরভূমির অবস্থা

হইয়াছিলেন। সুতরাং রাঢ়ের এই বনময় প্রদেশের হিন্দু নরপতি কিছু দিন স্বাধীন ভাবেই রাজ্যপরিচালনের সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই দ্রুত গতিতে রাঢ়ে মুসলমান-প্রাধান্য বিস্তার লাভ করিতে থাকে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের রাজত্বকাল। এই সময় গৌড়-বঙ্গে রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশব্যাপী এক বিপুল ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। হোসেন শাহের রাজত্বের অনেক পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিম হইতে দলে দলে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়া গৌড়বঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কেহ রাজকীয় সাহায্যে অস্ত্রধারী শিষ্যসংগ্রহ পূর্ব্বক নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, কেহবা স্বীয় চরিত্রমহিমায় বিজাতীয় নর-নারীবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকাতলে "লোক সংগ্রহ" কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুসলমানগণের আগমন বাঙ্গালার-ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিপ্লবের পূর্ব্ব সূচনা,—যাহার প্রাকৃতিক-প্রতিক্রিয়ায় নদীয়ায় 'প্রেমধর্ম্ম' মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল, আর এক-চক্রায় "মূর্ত্তিমান্ দয়ার" উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। নিতাই-চৈতন্য আসিয়া বাঙ্গলায় নবজীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রাঢ়ে মুসলমান প্রাধান্য ও ধর্ম্মবিপ্লব

রাজা বীরেন্দ্ররায়ের সহিত নগরের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তিনি সত্যকার রাজা, কিংবা জমিদার বলিয়া প্রবাদ তাঁহাকে রাজা করিয়াছে, ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বই বিস্মৃতির অন্ধকার গুহায় নিহিত রহিয়াছে। সেখেরদীঘি প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে গৌড়েশ্বর হোসেন বীরভূম অঞ্চলে আর একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (১৫১৬ খৃঃ অঃ), এসিয়াটিক সোসাইটির পুরাতন সংখ্যায় প্রকাশিত বীরভূমে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে এই সংবাদ অবগত হওয়া যায়। (৪) সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে গৌড়েশ্বর হোসেনের সময় হইতেই বীরভূমে মুসলমান-প্রাধান্য দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, লোহাজঙ্গ প্রভৃতি ফকিরগণ সেই প্রতিষ্ঠা দানের অগ্রদূত মাত্র। (৫)

বীরভূমে মুসলমান অধিকার

(৪) Vol XXX 1861

(৫) ভদ্রপুরে (ফকির) সৈয়দ মহাবুব উল্লা সাহিবের আস্তানা আছে। মুসলমান ফকিরগণ গৃহী ও সন্ন্যাসী ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাবুব সাহেব সংসারী ছিলেন। ইনি বোগদাদ হইতে এদেশে আসিয়া ভদ্রপুরে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ হয়, তিনি সেই যুদ্ধে হত হন। ইহার নামে অনেক পীরোত্তর সম্পত্তি আছে। ইনি প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আগমন করেন।

রামপুরহাট কাহিনী

বর্ত্তমান বীরভূমের অন্যতর প্রধান নগর রামপুরহাট। এখন রামপুরহাটে (রেলকর্ম্মচারী) সাহেব বাস করে! ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে, উকীল, মোক্তার ও মক্কেলে, উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে, শিক্ষক ও ছাত্রে, ছাপাখানা ও খবরের কাগজে, দোকান-পশরায় ও খরিদ্দারে এখন রামপুরহাট যেন গুলজার হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এই সেদিন বলিলেও হয়,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেলওয়ে (লুপ) লাইন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে রামপুরহাটে কোনো ভদ্রলোকের বাস ছিল না। একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে—এইস্থানে কতকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর লোক বাস করিত। রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া রামপুরহাটে বাস করিতে লাগিল, যেখানে গ্রাম ছিল, তাহার দক্ষিণদিকের মাঠে লোকের বসতি হইল, ক্রমে রামপুরহাট সহর হইয়া গেল। এখন রামপুরহাটের লোক-সংখ্যা প্রায় পাঁচহাজার।

পূর্ব্বকথা

যখন রেলপথ নির্ম্মিত হয়, সেই সময় কোম্পানীর একজন ঠিকাদার চার্লস হ্যামটন সাহেব রামপুরহাটে আসিয়া বাস করেন। এখানে তখনও মহকুমা স্থাপিত হয় নাই, সুতরাং হ্যামটনই ছিলেন সর্ব্বে-সর্ব্বা,--তিনি দেওয়ানী হাকিম, তিনি ফৌজদারীর দণ্ডধর, তিনি কোতোয়াল—তিনিই সব। সে--আজ প্রায় সত্তর' বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই হ্যামটন সাহেবের আমলেই সাঁওতাল-পরগণার বিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহ, উত্তর দক্ষিণ রাঢ়ের অনেক স্থানেই সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। সাহেব আত্ম-রক্ষার জন্য রামপুরহাটে একটা 'গোল-ঘর' তৈরী করেন। গোল ঘরটি এখনও বর্ত্তমান আছে। সাঁওতালগণ কিন্তু রামপুরহাট পর্য্যন্ত আসে নাই। রামপুরহাটের পশ্চিমে নারায়ণপুরে কোম্পানীর সিপাহীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। আমরা কোনো প্রত্যক্ষ-দর্শীর মুখে শুনিয়াছি, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একদল বিদ্রোহী-সিপাহী রামপুরহাটে আসিয়া ছাউনী করে। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, তাহারা দলপতির অবাধ্য হইয়া পড়ে। অবশেষে নারায়ণপুর লুণ্ঠন করিয়া সাঁওতাল পরগণার

হ্যামটন সাহেব ও সমসাময়িক অবস্থা

রামপুর হাটে সিপাহী বিদ্রোহ

ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। আমরা এই দলের বা দলপতির বিশেষ কোনো বিবরণ জানিতে পারি নাই। ইতিহাসেও এ সম্বন্ধে কোনো কথা লেখা নাই।

হ্যামটন লোকটি দুর্দ্ধর্ষ হইলেও তাহার অনেক গুণ ছিল। তিনিই রামপুর-হাটে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে রামপুরহাটে মহকুমা হইল, ফৌজদারী-দেওয়ানী আদালত বসিল। হাকিম, উকিল ও মোক্তারের দল রামপুরহাটে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। কার্য্যানুরোধে সাধারণ ভদ্রলোকগণ আসিয়াও এখানে বাস করিতে লাগিলেন, সুতরাং ১৮৮৬ সালে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত বিদ্যালয়টিরও উন্নতি হইতে লাগিল, ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিল, ইং ১৯১৪ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হইল প্রায় সাড়ে পাঁচ শত। তখন গোটা মহকুমায় এই একটি মাত্র স্কুল! সেই জন্য ইং ১৯১৫ সালে রামপুরহাটে আর একটি 'হাইস্কুল' স্থাপিত হইল। ক্রমে মহকুমার অপরাপর স্থানে আরো তিনটি—নলহাটিতে একটি, (বসোয়া) বিষ্ণুপুরে একটি ও কুণ্ডলাতে একটি হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। প্রধানতঃ যাঁহার চেষ্টায় মফঃস্বলের এই স্কুল তিনটির প্রতিষ্ঠা হয়,—তিনি রামপুরহাটের প্রথম বাঙ্গালী হাকিম শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় এম্ এ। রামপুরহাটের রেলকর্ম্মচারী সাহেবগণের জন্যই হউক, অথবা অন্য যে কোনো কারণে হউক, এই মহকুমায় পূর্ব্বে সিভিলিয়ানগণই হাকিম হইয়া আসিতেন। মহকুমার সৌভাগ্যে প্রথম বাঙ্গালী হাকিম আসিয়াছিলেন তারক-চন্দ্র।(২) প্রজার এমন ব্যাথার-দরদী,—এমন হৃদয়বান-জনপ্রিয় হাকিম রামপুর-হাটে পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন কিনা জানি না; তবে মহকুমার তিনি যে উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সমগ্র বীরভূমবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বীরভূমের লোক তাঁহাকে চিরকাল মনে রাখিবে।

রামপুর হাটের নাম পরিবর্ত্তন

রামপুর হাটে প্রথম বাঙ্গালী হাকিম

বর্ত্তমান কথা

রামপুর হাটে এখন দুইটি ফৌজদারী আদালত, দুইটি দেওয়ানী আদালত, একটি ইউনিয়ন কমিটি, একটি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট্‌ব্যাঙ্ক, একটি গুরুট্রেণীং

(১) নারায়ণপুর পূর্ব্বে বীরভূমের একটি ধনজন পূর্ণ জনপদ ছিল। এই কাহিনীর মধ্যে যথাস্থানে তাহার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি।

(২) রামপুরহাটে ইঁহার কার্য্য কাল ইং ১৯১৫ সালের জানুয়ারী হইতে ইং ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন বৎসর। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইনি একজন অনুরাগী লেখক। সম্প্রতি ইঁহার 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে একখানি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি এখন কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির জয়েন্ট রেজিষ্টার।

৩৬ নং বালাগ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারদেশের কোণ।
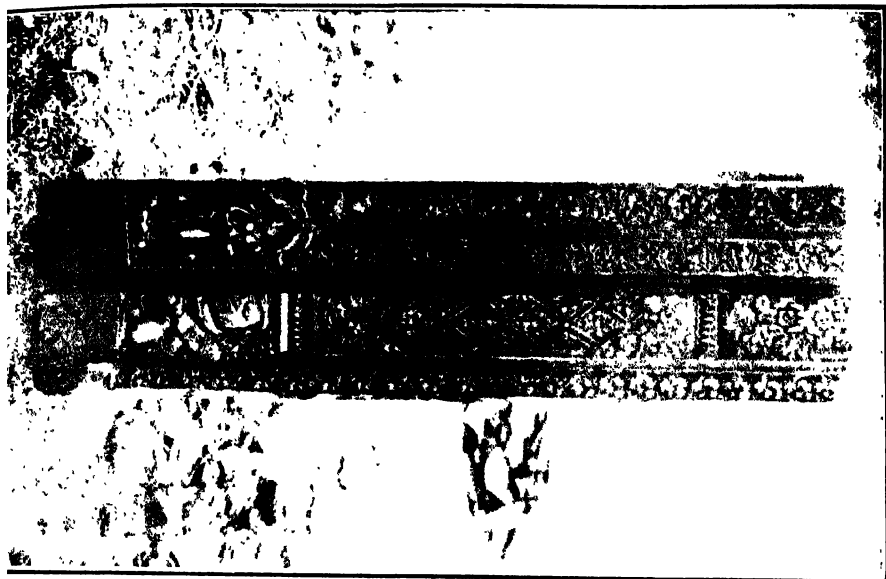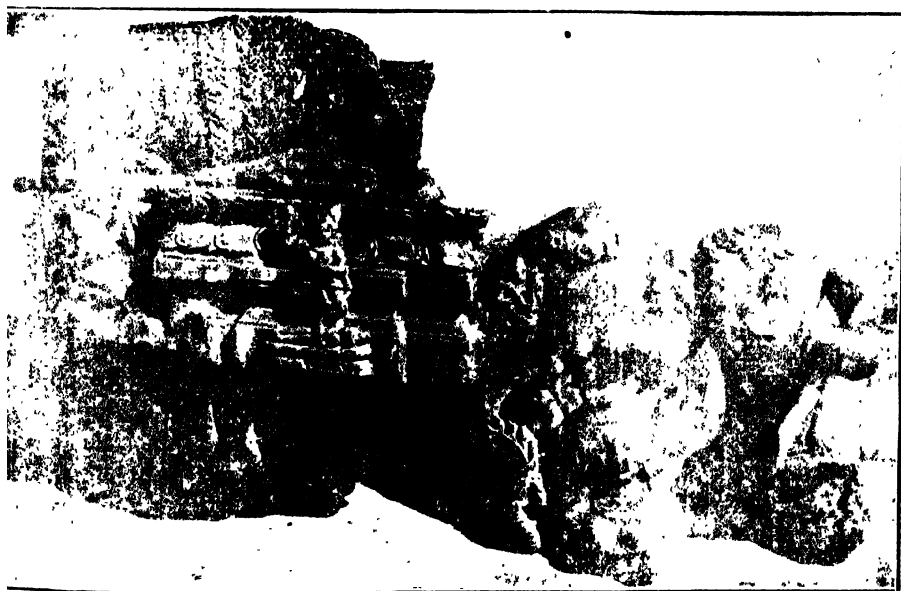
৩৮ নং ভদ্রপুরের নিকটবর্ত্তী আকালীপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি ভগ্ন-মূর্ত্তি।

বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি নৈশবিদ্যালয় আছে। উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় দুইটির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কলিকাতা—হাইকোর্টের জজ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীব, দেশপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় রামপুরহাটের গৌরব। রামপুরহাটের পুরাতন উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড় এম, এ, বি, এল, প্রমুখ কয়েক জন উকিল, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন মোক্তার ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাস প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোকের চেষ্টায় রামপুরহাটে মাঝে মাঝে বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। (মুর্শিদাবাদ,—সৈয়দাবাদের) ধন্বন্তরি-কল্প কবিরাজ স্বনামধন্য গঙ্গাধরের কৃতিছাত্র রামপুরহাটের স্বর্গীয় গয়ানাথ সেন মহাশয়ের চিকিৎসা-খ্যাতি লোকমুখে আজিও প্রবাদের মত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। গয়ানাথের উপযুক্ত পুত্র সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ সেন তর্কতীর্থ মহাশয় রামপুরহাটে এবং পৌত্র শ্রীমান দ্বারিকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ কলিকাতায় চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। রামপুরহাটে পরলোকগত মুরলী দাসের নাম বিশেষ পরিচিত। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে সোনা-রূপার কারবারে ও মনিহারি জিনিষ প্রভৃতির ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। পরোপকারী এবং বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। রামপুরহাট হইতে সম্প্রতি দুইখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। একখানি নাম "বীরভূমবাসী", শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় ইহার প্রবর্ত্তক। 'বাসী'র বর্ত্তমান সম্পাদক মোক্তার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসন্ন রায় মহাশয়। অপর খানির নাম 'বাঢ়-দীপিকা', উকিল শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর মুখোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় ইহার সম্পাদক। কাগজ দুইখানির দ্বারা রামপুরহাট মহকুমার অনেক উপকার সাধিত হইতেছে।

আধুনিক রামপুরহাট

৺গয়ানাথ সেন

রামপুরহাট সংবাদ পত্র

"রামপুরহাটের হেড্‌মাষ্টার" শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। একাধিক-ক্রমে প্রায় ত্রিশবৎসর কাল তিনি 'হেড্‌মাষ্টার'। অবশ্য রামপুর হাটে আছেন আজ নয়বৎসর, তথাপি ঐ নামেই তিনি অধিক পরিচিত। কিন্তু আমরা—তাঁহার যে পরিচয় জানি, তাহাই তাঁহার প্রকৃত-পরিচয়, এবং সেই পরিচয়েই তিনি সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্যিক-সমাজে সুপরিচিত। বীরভূমের "চণ্ডীদাসের-পদাবলী" সংকলয়িতা নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের নাম জানেন না, বাঙ্গালায় সত্যকার সাহিত্যানুরাগী এমন কেহ আছেন

চণ্ডীদাসের-পদাবলী সংকলয়িতা নীলরতন মুখোপাধ্যায়

কিনা সন্দেহ। আমাদের অদৃষ্ট-প্রদীপে যে কয়েকটি শিবরাত্রির-সলিতা উজ্জ্বল প্রতিভায় আজ বীরভূমির বাণীমন্দির আলোকিত করিতেছে, এই 'রত্ন'টি তাহার মধ্যে অন্যতম। বীরভূমির নান্নুর-থানার তিনক্রোশ উত্তরে 'জামনা' নামক গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। দর পনের যোল ব্রাহ্মণ, ঘর কুড়ি সৎগোপ, আর কয়েক ঘর বাগদী ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জাতি লইয়া জামনা গ্রাম, এখন একটি ক্ষুদ্র পল্লীমাত্র। কিন্তু এই গ্রাম খানি বহুদিনের পুরাতন এবং একসময় ইহার অবস্থা, অনেক ইদানীন্তন তথাকথিত উন্নতিশীল ছোট খাটো সহরকেও লজ্জাদিত। গ্রামে একটি পাড়া আছে, নাম 'ধ্রুববাটী'। ধ্রুববাটীতে ধ্রুবগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথজীউ বিগ্রহের আজিও পূজা হইতেছে। ইনি—সেই ধ্রুবগোস্বামী,—যিনি মঙ্গলডিহিতে এবং ভাণ্ডীরবনে শ্রীশ্যামচাঁদ-বলরাম ও শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ। (৩)

জন্মস্থান

বঙ্গাব্দ ১২৭২ সালের ১৬অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে নীলরতন জন্মগ্রহণ করেন। নীলরতন বাবু ভাগ্যবান্ পুরুষ, যেহেতু তাঁহার জনক-জননী আজিও জীবিত আছেন। জনকের বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর, নাম শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এই বয়সেও তাঁহার আহার-ব্যবহারের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইনিই স্বগ্রামে ছাত্রবৃত্তি পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় বালকগণের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। তৎপূর্ব্বে জামনার লোক ছাপার বই-দেখে নাই, বলিতে গেলে সাধারণে এখন বিশ্বাস করিবেন কিনা সন্দেহ। চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জুবুটীয়া গ্রামের কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জামনার মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয়ে —ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া নীলরতন কাঁদি উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্দ্ধমান রাজ-কলেজে এফ, এ, পড়েন। এই সময় বিশ্বপণ্ডিতগণের করুণা-নির্দ্ধারিত পাঠ্যের চাপ এবং বর্দ্ধমান-জাত ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রতাপ—তাঁহাকে সমানে সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক তিনি জব্দ হইয়া পড়েন নাই। বর্দ্ধমানে বিদ্যা-লাভ করিয়া, বৎসর দেড়েক কলিকাতার জেনারেল-এসেমব্লিতে পড়িয়া, অবশেষে বহরমপুর হইতে তিনি বি, এ, র ডিগ্রিধারী বলিয়া গণ্য হন। পাশের খবর বাহির হইবার কয়েক দিন পরেই কোনো বন্ধুর অনুরোধে আইন

পিতৃ পরিচয়

পাঠ্যাবস্থা

(৩) নবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

অধ্যয়নের সংকল্প তখনকার মত ত্যাগ করিয়া তিনি (মুর্শিদাবাদ) বেলডাঙ্গা স্কুলে হেড্‌মাষ্টারী করিতে যান। অনুরোধে পড়িয়া বেলডাঙ্গায় তাঁহাকে প্রায় দুই বৎসর কাল থাকিতে হয়। তাহার পর আর মন টিকিল না, সুতরাং আইন পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় গিয়া পাঁচ-ছয় দিন পরেই—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও যাহা করে,—তাহাই করিতে লাগিলেন, তিনি কটন-ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন! তথায় দেড়বৎসর থাকিয়া পুনরায় বেলডাঙ্গায় গেলেন। অতএব আইনের পাঠ ইতি হইয়া গেল। এবার প্রায় দুইবৎসরের অধিক কাল বেলডাঙ্গায় থাকিলেন। অতঃপর স্বগ্রামের নিকট বলিয়া কীর্ণাহারে আসিলেন। কীর্ণাহারে চৌদ্দ বৎসরকাল হেড্‌মাষ্টারী করিয়া তিনি রামপুরহাটে আসেন। রামপুরহাটে আজ প্রায় নয়বৎসর কাল আছেন। ইহাই হেডমাষ্টার নীলরতন বাবুর অধ্যাপক-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু আমরা মাষ্টারীর এই অবাধ-স্বচ্ছন্দ-দ্রুতগতির মধ্যে তাঁহার সাহিত্যিক-জীবনের পরিচয় দিবার অবকাশ পাই নাই। এই বার তাহাই বলিব।

হেড মাষ্টার-নীলরতন

বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি নীলরতন বাবুর প্রবলতর অনুরাগ ছিল। গ্রামে সে অনুরাগ মিটিবার কথা নহে। বিদ্যালয়—বঙ্গ হইলে কি হয়, বাঙ্গালা-বই পাড়াগাঁয়ে তখন কমই মিলিত। যাহা মিলিত, সে কেবল ছাত্রগণের বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক। কান্দীতে গিয়াও বিশেষ সুবিধা হইল না, অনেক কষ্টে বাঙ্গালা-বই দুই চারিখানি সংগৃহীত হয়, নীলরতন বাবু তাহাই পড়েন, আশা মিটিল না। এই বর্দ্ধিত অনুরাগ লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন, বর্দ্ধমানে তাঁহার সাধ পূর্ণ হইল। বাঙ্গালার-আকাশে তখন নবীন-উষার-আলো, বাতাসে নূতন-ফুলের-গন্ধ, নূতন-গানের-সুর! সমগ্র বাঙ্গালা ব্যাপিয়া পুলকের-চাঞ্চল্য! বঙ্কিম-ভূদেব-মাইকেল-হেম প্রভৃতি পূজারীগণ বাঙ্গালার বাণীমন্দিরে মহা-পূজার আয়োজন করিয়াছেন,—তাঁহাদের নূতন—নূতন গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালার ভাবরাজ্যে যুগান্তরের সূচনা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের সাধারণ পাঠাগারে নীলরতন সেই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলেন, পাঠাগার শেষ করিয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি এক নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, হৃদয়ে নবীন আশার সঞ্চার হইল, মনে বাঙ্গলা লিখিবার সাধ জাগিল। কিন্তু তখন তাঁহার ছাত্রজীবন, আর বলিয়াছি তো, এই সময় একদিকে কলেজের পড়া, অন্যদিকে ম্যালেরিয়ার তাড়া, এই দুইয়ের হাঙ্গামায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সুতরাং মনের আশা মনেই রহিয়া গেল,—কোনোরূপে পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিল, নীলরতন

নীলরতনের সাহিত্যালোচনা

বাবু আইন পড়িতে কলিকাতায় আসিলেন, এবং কটনস্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া গেলেন। এইবার তাঁহার চির-পোষিত আশা পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিল।

কটন-ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন স্বর্গীয় উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে। তথায় স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময়ে কয়েকজন মনীষী মিলিয়া দেশে একটি সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিতে ছিলেন, সংঘবদ্ধ হইয়া সাহিত্যালোচনার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া ছিলেন; ক্ষেত্রবাবু ইঁহাদের অন্যতম, এবং এই সমস্ত বিষয় লইয়া বন্ধু নীলরতনের সহিত তাঁহার বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও আন্দোলন-আলোচনা চলিত। এইরূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতে চলিতে বাঙ্গালার কয়েকজন কৃতি-সন্তান শুভক্ষণে এক-দিন সম্মিলিত হইলেন। মহারাজ-কুমার (পরে রাজা) বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে এক সভা আহূত হইল। "দি বেঙ্গল-একাডেমি অব লিটারেচার" যে দিন প্রতিষ্ঠিত হয়, বাঙ্গালার সে-এক স্মরণীয় দিন। যে বিতত-শত শাখ-বিশাল-বনস্পতির শান্তি-সুখ-শীতল সান্দ্র-ছায়াতলে আজ সাহিত্যের শান্ত-তপোবন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বাঙ্গালার মনীষা ও মনস্বিতার অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহার বীজ ঐ দিনেই উপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় তেরশত সালের আটই-শ্রাবণ ইংরাজী ১৮৯৩ সালের ২৩ শে জুলাই সেই পুণ্য দিন—বাঙ্গালার জাতীয়-অবদানের কীর্ত্তিমন্দিরের মণিময়-ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার বরেণ্য-বাসর! সভায় যে কয়জন ভাগ্যবান উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরই-মধ্যে একজন আমাদের নীলরতন। বড়ই গৌরবের কথা যে, জাতীয়-জীবন-যজ্ঞের সেই সূচনার-দিনে, আমাদের জয়দেব, চণ্ডীদাসের-বীরভূমিও তাহার সময়োপযোগী আসনে আসীন ছিল। তাই ভরসা হয়—এ-যজ্ঞ যে দিন সম্পূর্ণ হইবে, সেই পূর্ণাহুতি-দিনে, হুতশেষ-যজ্ঞতিলক-লাঞ্ছনে বীরভূমির-ললাটও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, শান্তি-বারির স্নিগ্ধ-অভ্যুক্ষণে হৃদয়ের জ্বালা—তাহার চির-নির্ব্বাণ লাভ করিবে। জানি-না, সে-দিন কবে আসিবে? আমরা না-থাকিতে পারি, কিন্তু আমি যেন দেখিতেছি—আমাদের ভবিষ্য-সন্তানগণ বাঙ্গালার সেই অভিনব-নৈমিশে অবনত-শীর্ষে সমুপস্থিত রহিয়াছে, ত্যাগ-ব্রত উদ্‌যাপনের মাহেন্দ্র-মুহূর্ত্তে সিদ্ধি তাহাদের করতলগত হইয়াছে।

দি বেঙ্গল একাডেমি লিটারেচার ও নীলরতন

সভাক্ষেত্রে এল, লিওটার্ড সাহেব উপস্থিত ছিলেন, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। (৩) সভায় যে কয়েকটি মন্তব্য পরিগৃহীত

(৩) সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম— (পরপৃষ্ঠায়)

হয়—সভার মুখপত্র স্বরূপ "দি বেঙ্গল-একাডেমি অব লিটারেচার" নামে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশ তন্মধ্যে অন্যতম। সভার সভ্য হইবার নিয়ম-স্থির হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, পণ্ডিত, অথবা ভাল লেখক ভিন্ন অন্য কেহ সভ্য হইতে পারিবেন না। নীলরতন বাবু বলেন আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, "কাগজের বাঙ্গালা নাম দেওয়া হউক, প্রবন্ধ এবং আলোচনাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হউক, আমার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই"। আমরা কিন্তু 'কার্য্য-বিবরণী'র মধ্যে নীলরতন বাবুর এরূপ প্রস্তাবের কোনো উল্লেখ পাইলাম না। লেখার সম্বন্ধে একটা নিয়ম ছিল, সমালোচনা ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা এই তিন ভাষাতেই লিখিত হইবে, কিন্তু লেখক ইচ্ছা করিলে সমস্ত বিষয়ই ইংরাজীতে লিখিতে পারিবেন। সভাধিবেশনের দিন ২৩শে জুলাই; আগষ্ট মাসে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল এবং (সেইটিকে প্রথম-সংখ্যা ধরিয়া) সেপ্টেম্বর মাস হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে কাগজ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সেপ্টেম্বরের কাগজ আগাগোড়া ইংরেজীতে লিখিত। অক্টোবর সংখ্যায় 'ভারতচন্দ্রের জীবনী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—লেখক সারদাপ্রসাদ দে। ইংরেজী প্রবন্ধের মাঝে মাঝে ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা কবিতা উদ্ধৃত ছিল। সর্ব্ব প্রথম খাঁটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—অক্টোবর মাসে, লেখক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ। এই প্রবন্ধটি ১৭ই সেপ্টেম্বরের সভায় নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের নাম "ইংরাজ অধিকারে বাঙ্গালা কাব্য"। এই প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে নভেম্বর ও এপ্রিল (১৮৯৩) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক প্রথমে কাব্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিয়া পরে সংক্ষেপে কয়েকজন কবি ও তাঁহাদের কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন।

দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ও নীলরতন

লেখক নীলরতন

মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মিঃ এল লিওটার্ড
পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী
বাবু আশুতোষ মিত্র
" ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
" ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" ব্রজভূষণ সেন গুপ্ত
" কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন
" গোপালচন্দ্র গুপ্ত
(ভূতপূর্ব্ব হুগলী কলেজের অধ্যাপক)

বাবু সরোজমোহন দাসগুপ্ত
" হরিমোহন সরকার কবিরত্ন
" নীলরতন মুখোপাধ্যায়
" প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" শ্রীমোহন দাসগুপ্ত
" অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত

কৌতূহলের বিষয়, ইং ১৮৯৪ সালের মার্চ্চমাস হইতে এই মাসিক পত্রের শিরোদেশে "দি-বেঙ্গল একাডেমি অব লিটরেচর" ও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ" এই উভয় নামই প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে হইয়েছে যে,—"স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু" মহাশয়ের একখানি পত্রই এই পরিবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান কারণ। সে সময় বাঙ্গালায় বাঙ্গালা মাসিক-পত্রের অভাব ছিল না। 'বঙ্গদর্শন' 'বান্ধব' 'ভারতী' 'সাধনা', প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কাগজগুলি ইহার পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত হইতেছিল। সুতরাং একাডেমির এই বিসদৃশ ব্যবহার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহা প্রকাশ করেন তাহার পত্র পড়িয়া মনে হয়—দুই এক সংখ্যা কাগজ প্রকাশের পর হইতেই এই সম্বন্ধে লিওটার্ড সাহেবের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। (৪) লিওটার্ড এবং পরে ক্ষেত্রপাল বাবু বসু মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রপালবাবুর লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়, এই পত্রখানি ১৩০০ তের শত বাঙ্গালা সালের ৩রা পৌষ তারিখে লিখিত হইয়াছিল, বা সভায় পৌঁছিয়াছিল। ১০ই পৌষের সভায় পত্রখানির বিষয় আলোচিত হইলে ইং ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যার কাগজে রাজনারায়ণ বাবুর পত্র ও ক্ষেত্রপাল বাবুর মন্তব্য একত্রে প্রকাশিত হয়। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা রাজনারায়ণ বাবুর পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রে তিনি একাডেমি আদি পরিত্যাগ করিযা একেবারেই 'বঙ্গসাহিত্য-পরিষদ্' নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

দি বেঙ্গল একাডেমি লিটারেচার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্র

ওঁ

মান্য শ্রেষ্ঠ—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর বঙ্গসাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু—

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর পত্র

সবিনয় নিবেদন

অদ্য Bengal Academy of Literature. এর পত্রিকার পঞ্চম-সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে দেখিলাম লিওটারড সাহেব পরিষদের কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায়

(৪) লিখিতে ভুলিয়াছি—সভার সভাপতি ছিলেন মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সহকারী সভাপতি ছিলেন, এল, লিওটার্ড, সম্পাদক ছিলেন বাবু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী। মাসিক পত্রখানিও ক্ষেত্রপাল বাবুই সম্পাদন করিতেন।

সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য আমার এই মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদি বাঙ্গালাভাষার উন্নতি সাধন করিতে চাহেন, এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাহইলে সেইমত ঘোষনা করা কর্ত্তব্য যে, কোন গভর্ণমেণ্ট ও কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত, আর অন্য কোন উপলক্ষ্যে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে। আমি এতদ্দ্বারা ইংরাজী-শিক্ষার অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছিনা তাহা আপনারা অনায়াসে প্রতীত করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতকগুলি সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে, এবং এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরাজিতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গালায় পারেন না, তাঁহারা বাঙ্গালায়—লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গপরিষদের কার্য্য বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে নহে, অতএব উহার কার্য্য কেবল বাঙ্গালাভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে পারিনা। যদি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিবার কাহারো ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে। অধিক লেখা বাহুল্য।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর পত্র

বশম্বদ

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজনারায়ণ বসু

এই পত্র খানি দেওঘর হইতে লিখিত হইয়াছিল। অতঃপর (বোধ হয় এই পত্র পাঠ করিয়া) মালদহ হইতে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম এ, মহাশয় একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি বেদাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পরিষদ নামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক 'বঙ্গীয়-সাধুগোষ্ঠী' বা 'বঙ্গীয়-সদগোষ্ঠী' বা 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ' এই নামকরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই পত্রখানি ইং১৮৯৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর সভায় পঠিত হয়। বসুজ মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্য-পরিষদ, বটব্যাল মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই নাম সকলেরই মনোনীত হওয়ায় মার্চ্চমাস হইতে দি বেঙ্গল-একাডেমি অব লিটরেচর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এই উভয় নামই ব্যবহৃত হয়। ইহার পরে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবন হইতে পরিষদ কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হওয়ার কথা, পূর্ব্বাবস্থা হইতে ধীরে ধীরে পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নামকরণ

এখানে নিষ্প্রয়োজন, নীলরতন বাবু পরিষদের জন্মের সেই প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহোদয় নীলরতন বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ত্রিবেদী মহোদয়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

নীলরতনের সাহিত্য সেবা

নীলরতন বাবু পুনরায় যখন বেলডাঙ্গায় গমন করেন, সেই সময় (মুর্শিদাবাদ) গোরাবাজার হইতে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির সম্পাদকতায় সৎসঙ্গ নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত। নীলরতন বাবু তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। এই সময় পরিষদ পত্রিকা সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পত্রিকার ২য় সংখ্যায় তিনি "রামমোহনের রামায়ণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একজন অজ্ঞাতনামা কবির এক খানি অপ্রকাশিত রামায়ণের পরিচয় প্রদানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার সম-সময়ে বা কিছু পরে সাঁওতাল পরগণার মলুটী হইতে ধরণী নামে একখানি মাসিক বাহির হয়। তাহাতে নীলরতন বাবুর অভিজ্ঞান-শকুন্তল শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। অতঃপর তিনি কীর্ণাহারে আগমন করেন। কীর্ণাহারে আসিয়াই তিনি চণ্ডীদাসের পদ সংকলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাসলীলা শীর্ষক প্রায় অশীতি সংখ্যক অপ্রকাশিতপদ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। এই সময়ে সৎসঙ্গের সাতকড়ি বাবু কীর্ণাহারের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়দের বাড়ীতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, ফলে কীর্ণাহার হইতে সৎসঙ্গ মাসিক পত্র একবৎসর কাল প্রকাশিত হয়।

বীরভূমি-সম্পাদক নীলরতন

সৎসঙ্গ বন্ধ হইলে সাহিত্যানুরাগী সৌরেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ ব্যয়ানুকূল্যে নীলরতন বাবুর সম্পাদকতায়—'বীরভূমি' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরাজী ১৮৯৬ সালে নীলরতন বাবু কীর্ণাহারে যান, তাহার অত্যল্প কাল পরেই বীরভূমি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।(৫) ডিমাই ৪ফর্ম্মা ৩২পৃষ্ঠা কাগজ, প্রতি মাসে প্রায় ৫০৲ হিঃ খরচ পড়িত। নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাসের নূতন পদ অনেকগুলি বীরভূমিতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বীরভূমি পাঁচ বৎসর কাল চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। রামপুরহাটে থাকিয়াই নীলরতনবাবু তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' সংকলন করেন। ইহাতে আটশত ত্রিশটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে, অধিকাংশ গুলিই

(৫) কীর্ণাহার-কাহিনী, বীরভূমির কথা ও সেই সঙ্গে বীরভূমে সাহিত্য চর্চ্চার ইতিহাস, বীরভূম বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

সম্পূর্ণ নূতন। এই পদাবলী সংকলনের জন্ত তিনি যে, কত বৈরাগীর আখড়ায় আখড়ায় ঘুরিয়াছেন, কতস্থানে কীর্ত্তন শুনিয়া বেড়াইয়াছেন, কত কীর্ত্তনীয়ার বাড়ীতে গিয়া দিন কাটাইয়াছেন, ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ফলতঃ এই পদাবলী সংকলনে তিনি যে রূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, গ্রন্থের সম্পাদনেও সেই রূপ কৃতিত্ব পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক মহামূল্যরত্ন। এ হেন রত্নের প্রকাশ-কৃতিত্বে পরিষদের সঙ্গে সঙ্গে নীলরতন বাবুও আমাদের ধন্তবাদ-ভাজন হইয়াছেন। বিগত সন ১৩২১ সালে এই পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কীর্ণাহারে থাকিতে তিনি 'অর্জ্জুন' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রামপুরহাটে আসার পর তাঁহার 'মহাভারতীয় পাঠ' নামে আর এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। রামপুরহাটে আসিয়া বোধহয় দুই বৎসর পরে তিনি 'বীরভূমবাসী' নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক-সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'বীরভূম-বাসী' অনেকদিন তাঁহারই সম্পাদকতায় পরিচালিত হইয়াছিল। পদাবলী সম্পাদনের পর আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল তিনি নীরব আছেন, এতদিনের মধ্যে তাঁহার একখানিও পুস্তক বা এই 'মাসিক' প্লাবিত বাঙ্গালার কোনো মাসিকের পৃষ্ঠে তাঁহার একটিও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি—বলিয়া তো মনে হয় না। জানিনা নীলরতন বাবুর এ বৈরাগ্যের কারণ কি? জীবনের এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নেই কি তিনি অবসর গ্রহণ করিতেছেন! বীরভূমির দুর্ভাগ্য।(৭)

নীলরতনের পুস্তক প্রণয়ন ও বীরভূম-বাসী সম্পাদন

রামপুরহাটের পূর্ব্বে 'মাড়গ্রাম'। লোক-সংখ্যা প্রায় আট-হাজার। ইহাদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান, বাকী হিন্দু। আঠারপাড়া গ্রাম, হিন্দু মুসলমানের পল্লী পৃথক্ পৃথক্। তবে মুসলমান পল্লী-বেষ্টনীর মধ্যে একস্থানে মাত্র ৬।৭ ঘর হিন্দুর বাস আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ বোধহয় দশঘরের বেশী হইবে না। হিন্দুর মধ্যে ময়রা ও সেকড়ার সংখ্যা কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। গন্ধবণিক, তাঁতি, কুম্ভকার, কামার, নাপিত, ছুতার এবং মুচিহাড়ি প্রভৃতি অপরাপর জাতিও

মাড়গ্রামের পরিচয়

(৭) নীলরতন বাবুর সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে উল্লেখ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। এখানে আমরা সে ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিলাম। "১২৮৯ সালের ১৮ই বৈশাখ পূর্ণিমার রাত্রে সাড়ে সতের বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।" বর্ষ প্রবেশের মুখে পৌর্ণমাসী রজনীতে কাজটি ভালই হইয়াছিল। পাঁচথুপির দক্ষিণ পাড়ার ৺হরেকৃষ্ণ পাঠকের কন্তার সঙ্গে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার ফল-স্বরূপ, তিনি তিন পুত্র ও চারিটি তনয়া লাভ করিয়াছেন।

আছে। মাড়গ্রামে "মেহনা" নামে একটি জাতি আছে, সংখ্যায় তাহা অল্প হইবে। এই জাতি গোবধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে, মসজিদে যায়, দাড়ি রাখে, আবার হিন্দুর ভাতও খায়, দেবালয়ে গিয়া মাথাও নোয়ায়। মেহনা নূতন রকমের সঙ্কর জাতি। এখানে অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত লোকের বাস, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। গ্রামে একটি পোষ্টাফিস ও একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। মুসলমানগণের চামড়ার কারবার এবং তাঁতিদের রেশমের কারবার মাড়গ্রামের শিল্পের নাম বজায় রাখিয়াছে। গ্রামে নানাবিধ জিনিষের-দোকান। পশারীর সংখ্যাও মন্দ নহে। বড় জনপদ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একমাইল করিয়া পরিমাণ হইতে পারে।

মেহনা জাতি

প্রবাদ কাহিনী কতকটা বারারমত,—গ্রামে এক রাজা ছিলেন, একজন মুসলমান সাধু আসিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া গ্রাম দখল করেন। তবে ইহার মধ্যে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। বারার কাহিনী বলিয়াছি, সেই—রকমের কাহিনীই আবার এখানেও বলিতে হইবে। একে একে বলিতেছি। মাড়-গ্রাম ছিল বড় সহর, প্রাচীন নাম তার মাণ্ডব্যপুর। অতি পূর্ব্বকালে এদেশ যখন অরণ্য-সংকুল ছিল, তখন এখানে ছিল মাণ্ডব্য নামে কোন মুনির একটি শান্তিপূর্ণ তপোবন। এক সময়,—উত্তরে দার্ষদ (পাথরের) দেশ—বোধ হয় রাজ-মহালের পাহাড় শ্রেণী, পশ্চিমে আরণ্যভূমি—ঝাড়খণ্ডের ঘন অরণ্যানী, দক্ষিণে বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা অনেক নদী, আর পূর্ব্বে জননী-জাহ্নবী—ইহাই ছিল বীরভূমির প্রাকৃতিক সংস্থান।(৮) সুতরাং স্থল পথে এদেশে আসা পূর্ব্বে বিশেষ সহজ সাধ্য ছিলনা। সে কালে সাধারণতঃ সুবিধাজনক পথ ছিল—নদীবক্ষ। তাই মুনি ঋষিরা উড়ুপে চড়িয়া নদীপথ ধরিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিতেন। সকলেই যে পরমার্থ চিন্তা লইয়া ফিরিতেন, তাহা নহে। বিশেশ্বর-বিরাট্-পুরুষকে তাঁহারা নানা ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন, সুতরাং বিশ্বরূপের উপাসনাপদ্ধতিও ছিল তাঁহাদের বৈচিত্র্যময়। কেহ ধর্ম্ম, কেহ সমাজ, কেহ রাষ্ট্র, কেহ অর্থ, কেহ বিজ্ঞান, কেহ শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিভাগ ধরিয়া, বিশ্বের বিভিন্ন পথযাত্রী-রূপে অনন্তভাক্-ভজনায়, তাঁহারা সেই বিশেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হইতেন। এমন অনেক মুনি-ঋষি ছিলেন—যেমন অগস্ত্য প্রভৃতি, যাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম

মাড়গ্রামে মাণ্ডব্য

বীরভূমির প্রাচীন সীমা

দেশের মুনিঋষিদের কাজ

(৮) "বীরভূঃ কামকোটী স্যাৎ প্রাচ্যা গঙ্গাজলাবিতা।
আরণ্যকং প্রতীচ্যন্ত দেশোদার্ষদ উত্তরে।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহু সংস্থিতাঃ" (কুলপঞ্জিকা ধৃত শ্লোক)

প্রদেশে লোকাবাস-স্থাপনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদেরই অদম্য অধ্যবসায় ও অক্লান্ত-উদ্যমের ফলে আর্য্য-সভ্যতা পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়াছিল। নদীপথ-যাত্রী ঋষিগণের মধ্যে 'দীর্ঘতমার' কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ। বলিপত্নী সুদেষ্ণার গর্ভজাত তাঁহারই পাঁচটি ঔরস পুত্র, ভাগলপুর, মালদহ, পূর্ব্ববঙ্গ, রাঢ় এবং উড়িষ্যায় আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন করেন। (৮) পুরাণে এক মাণ্ডব্যের নাম পাওয়া যায়, যিনি শূলে গিয়াছিলেন। কোনো রাজকীয় বিচারের গোলমালে, একজন দণ্ডিত ব্যক্তির জন্য স্থাপিত শূলে তাঁহাকেই চড়িয়া বসিতে হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কৃত কোনো লঘু-পাপের এই গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা জন্য, মুনির শাপে কুরুক্ষেত্রের আমলে যম-রাজা, দাসী-পুত্র—বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে ভারতের আদর্শ সতী-সাবিত্রী, পতি সত্যবান্ সহ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। মাড়গ্রামের মাণ্ডব্য সেই মাণ্ডব্য, অথবা তাঁহারই গোত্র সম্ভূত, কিম্বা অপর কেহ, তিনি কি—উদ্দেশ্য লইয়া কত দিন পূর্ব্বে—কোন পথে বীরভূমে আগমন করেন, ইত্যাদি বিষয় জানিবার পক্ষে প্রবাদ কোনো সাহায্য করেনা। সুতরাং অনুমান করিয়া কিছু বলা কঠিন।

মুনি পুত্রের দেশ

পুরাণের মাণ্ডব্য

মাড়গ্রামে "সতী-মুনি বিসম্বাদ" নামে একটি প্রবচন প্রচলিত আছে। প্রবচন সৃষ্টির হেতু, মাণ্ডব্য মুনির সঙ্গে এক সতী-রমণীর বিবাদ। এ সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই,—"মাণ্ডব্যমুনির তপোবন সন্নিধানে, কালে—বহু জনাকীর্ণ এক নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে রাজা এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—মাণ্ডব্যের নামানুসারে তিনি নগরের নাম রাখেন মাণ্ডব্যনগর বা মাণ্ডব্যপুর। মাণ্ডব্যপুর রাজধানী হইতেই রাজা তাঁহার এতদঞ্চলে-স্থাপিত নূতন-রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেন। মাণ্ডব্যপুরে সে সময় এক বারাঙ্গনা বাস করিত। আবাসে তাহার বিলাসীর প্রবেশাধিকার মূল্য ছিল লক্ষ টাকা, তাই লোকে তাহাকে বলিত "লক্ষহীরা"। কতদেশ-বিদেশের বিলাস-বণিক, তাহার রূপ-বিপণীতে আসিয়া উপস্থিত হইত, কত নিরাশ-প্রণয়ীর নবীন-জীবন তাহার বিরহে বিকাশের পথেই ঝরিয়া পড়িত, বারনারী ফিরিয়াও চাহিত না। রাজপথে রূপের-তরঙ্গ তুলিয়া লীলায়িত-গতিতে সে যখন মাণ্ডব্যেশ্বর শিব-মন্দিরে পূজা দিতে আসিত, পুরবাসী অবাক্ হইয়া দেখিত। একদিন এক মহা-

সতী-মুনি বিসম্বাদ

বারবিলাসিনী লক্ষহীরা

(৮) "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি"॥
(সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার বরদান) মহাভারত আদি—১০৪

ব্যাধি-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীকে আসিয়া বলিল, ইহার কোনো একটা উপায় করিয়া না দিলে সে না খাইয়া মরিবে। ব্রাহ্মণের স্ত্রী কায়-মনো বাক্যে সতী ছিলেন। তিনি স্বামীকে প্রবোধ দিয়া লক্ষহীরার বাড়ীতে গিয়া দাসী-বৃত্তি আরম্ভ করিলেন। একদিন লক্ষহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল— এ নীচকাজের উপযুক্তা তো তুমি নও, বল তুমি কে, কেন এমন ভাবে আসিয়া ছদ্মবেশে এ নীচকাজে প্রবৃত্তা হইয়াছ। ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া লক্ষহীরার হৃদয়ও গলিল, বলিল ঘরে যাও মা, লইয়া আসিয়ো তোমার স্বামিকে, আমি আজই—রজনীতে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিব, সেজন্য এক কপর্দ্দকও দিতে হইবে না। ব্রাহ্মণী আনন্দে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। রাত্রিতে স্বামিকে একটা বড় রকমের—ঝুড়িতে বসাইয়া—মাথায়-বহিয়া তিনি লক্ষহীরার-বাড়ীতে আসিতেছিলেন; পথে এক বিভ্রাট বাধিল, ঝুড়িতে ঠেকিয়া শূন্যে কি যেন একটা নড়িয়া উঠিল এবং ঝুড়িটা আটকাইয়া গেল। ব্রাহ্মণী দাঁড়াইলেন, শুনিলেন—রোষভরে গর্জ্জন করিয়া কে যেন বলিতেছে পথে চলিতে—দেখিতে পাওনা? রাত্রিচর! আজিকার রাত্রি বাঁচিয়া থাক, আমায়, যেমন যন্ত্রণা দিলে তেমনি প্রভাত হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে'! কি বিপদ! কিন্তু তখন আর চিন্তার সময় ছিলনা, মনে মনে আপনার অবস্থা বিচার করিয়া সতী তৎক্ষণাৎ প্রতিশাপ দিলেন, "আজিকার রজনী আর প্রভাত হইবে না"। শূলে ছিলেন-মাণ্ডব্য মুনি, শাপ দিয়াছিলেন তিনিই। সমাধি-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শূলের যন্ত্রণা তাঁহাকে অধীর করিয়া দিয়াছিল, ক্রোধে তিনি জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। তিনি শূল-বিদ্ধ হইয়াছিলেন—সেও এক অপ্রত্যাশিত-রকমে! আগের-রাত্রে রাজার কি কয়েকটা জিনিষ চুরি গিয়াছিল-, প্রহরীর দল এখনকার মত ছিলনা, সুতরাং চোর পলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বুদ্ধি জোগাইয়াছিল, চোরকে তাহারা তাড়া করিয়াছিল। 'চোর-একটু অসময়েই চুরি করিতে আসিয়াছিল, সে জানিত না, যে রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। কাজেই এই তাড়াতাড়ির হাঙ্গামায় ছুটিতে ছুটিতে সে যেমন দেখিল-পূর্ব্বদিক্ লাল হইয়া উঠিতেছে, অমনি পথিপার্শ্বস্থ সমাধি-মগ্ন-মাণ্ডব্যের পাশে বামাল রাখিয়া দিয়া আরো-বেগে ছুটিতে লাগিল। প্রহরীরা আসিয়া কতকগুলি মূল্যবান্ দ্রব্য ও তাহারই নিকট একটি মুদ্রিত নেত্র-মনুষ্যকে যুগপৎ দেখিতে পাইল। চিনিল দ্রব্যগুলি রাজবাড়ীর, সুতরাং অনুমান করিল-মনুষ্য মূর্ত্তিই চোর, তাহাদের ভয়ে এখন চোখ বুজিয়া সাধু সাজিয়া বসিয়া আছে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী

মুনির শাপ

সতীর প্রতি শাপ

চোরের কার্য্য

প্রহরীর বুদ্ধিমত্তা

(এখানে আবার ঝুড়িটা একেলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে) মহোৎসাহে (চোরাই) মালসহ মাণ্ডব্যকে বাঁধিয়া লইয়া তাহারা রাজদ্বারে উপস্থিত করিল। সাড়ম্বরে বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া গেল, ধর্ম্মাধিকরণ ব্যবস্থা দিলেন মাণ্ডব্যের শূলদণ্ড! অনুষ্ঠানের ত্রুটী হইল না, মুনিবর যথারীতি শূলে সমর্পিত হইলেন। কার'-শূল কার' * * গেল! মুনি কিন্তু তখনো সমাধি-মগ্ন। এইবার ধীরে ধীরে সমাধি ভাঙ্গিতেছিল,—এমন সময়,—(শূলটা বোধ হয় রাস্তার পাশেই ছিল এবং ছোট ছিল) ব্রাহ্মণীর স-স্বামিক ঝুড়িটি আসিয়া বেগে তাঁহারা গায়ে লাগিল; মুনি অমনি হাত বাড়াইয়া ঝুড়ির উপরিস্থিত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং শাপ দিয়া বসিলেন। যাহা হউক প্রতি শাপ শুনিয়া তাঁহাব জ্ঞান ফিরিল, তিনি ব্রাহ্মণীকে দাঁড় করাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কাহিনী শুনিলেন। এই সব ব্যাপারের মধ্যেই প্রতিদিনকার রাত্রি কখন প্রভাত হইয়া গিয়াছিল, এখন অভিশাপের রাত্রি আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দেওয়ায় মাণ্ডব্যপুর যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া একে একে দেবগণ আসিয়া 'বার' দিলেন। অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর মীমাংসা হইল "রাত্রি প্রভাত হইবে, ব্রাহ্মণ ক্ষণেকের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, আবার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিবেন।" দেবতারা বলিলেন,—এ "ব্যাপার ঘটিয়াছিল কেবল ব্রাহ্মণীর পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণা হইয়াছেন, সুতরাং এখন আর তাঁহাকে স্বামি-সহ ঘৃণিত বেশ্যালয়ে গমন করিতে হইবে না। পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মণ এবার ব্রাহ্মণোচিত সর্ব্ববিধ গুণগ্রামে ভূষিত হইবেন, অপিচ মহাব্যাধি মুক্ত হইয়া দিব্য দেহ লাভ করিবেন। সতীর পুণ্যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ভোগ শেষ হইয়াছে"। দেব বাক্য সফল হইল; মাণ্ডব্যও শূলমুক্ত হইলেন।" ইহাই মাড়গ্রামের সতী-মুনি বিসম্বাদ।

বিচার ও দণ্ড

দেবাগমন ও বরদান

কাহিনী শেষ হইল, কিন্তু আজি আর ইহার সত্য-মিথ্যা নিরূপণের কোনো উপায় নাই। হয়তো এমনও হইতে পারে যে, নাম সাদৃশ্য পাইয়া, পৌরাণিক মাণ্ডব্যের কাহিনী এই মাণ্ডব্যের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া, মাড়গ্রামের কোনো পুণ্য প্রতিমার, কোনো মানবীর সত্যকার সতীত্বকাহিনী লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছিল। জন্মান্তরে বিশ্বাসবতী হিন্দু রমণীর পক্ষে, একটা জীবনের—মাত্র কয়েকটা বৎসরের জন্য এই ত্যাগ, রক্তমাংসের ক্ষুধার তীব্র তাড়নার প্রতি এই উপেক্ষা, ইহাতো এমন কিছু অধিক কথা নহে। স্বামী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, পত্নী কিন্তু প্রাণপণে তাঁহার সেবাপরায়ণা, কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণাশ্রিতা। এ

জীবনের সাধ মিটিল না বলিয়া, পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ অনন্ত জীবনের প্রতি সে কি বিশ্বাস হারাইতে পারে,- না অবিচার করিতে পারে? একটা জীবন— কাটিয়া যাউক দুশ্চর তপঃসাধনায়! তাহার পর—তাহার পর এই তপস্যা,— এই ত্যাগ, এই প্রেম,—অসীমের মধ্যে সসীম হইয়া, অনন্ত জীবনের সান্ত-দেহ-ধারীরূপে আবার যখন আকার পরিগ্রহ করিবে, সে কত মধুর, কত উজ্জ্বল, কত মহিমাময়, কত পবিত্র! সত্যের এই জীবন্তানুভূতি এ কি ভুলিবার? তাই মাড়গ্রামের সতীর কাহিনী আমরা বিশ্বাস করি। বলা অনাবশ্যক, যে পত্নীর পতি ভক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া পতির দুক্রিয়াসক্তির কাহিনী, ইহাকে বলিতে পারা যায় না। ক্ষণিকের মোহ! তাহাতেই ব্রাহ্মণ পথ হারাইয়া ছিল। কিন্তু আপনার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী জায়াকে সে কথা বলিতে ভুলে নাই। পত্নী ভাবিয়াছিলেন—এ জীবনে স্বামীর সকল সাধই তো অপূর্ণ রহিয়াগেল, দেখি যদি এই সাধটি পূর্ণ করিতে পারি। যাহা হউক, সব ভাল যার শেষ ভাল। এ কাহিনীর পরিসমাপ্তি, এ প্রবাদের পরিণাম-সঙ্গতি বড় সুন্দর।

প্রবাদের আলোচনা

মাড়গ্রামের দক্ষিণে দ্বারিকা-নদীর তীরে মাণ্ডব্যের আশ্রম ছিল। তথায় একটি বড় রকমের পাথর পড়িয়া আছে, লোকে তাহাকে মুনির-আসন বলে। এই স্থানের নাম এখন 'ঘুটিঙ্গের ঘাট'। ফকির শা-মাদার এই স্থানে আসিয়া আস্তানা পাতিবার পর হইতে ঘুটিঙ্গের ঘাটের নিকটবর্ত্তী একটি স্থান এখন 'ফকিরবাগান' নামে খ্যাত হইয়াছে। মাড়গ্রামের যে রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছি, সেই বংশের শেষ রাজার নাম 'মানপতি'। প্রবাদ প্রসঙ্গের মধ্যে ইহার পূর্ব্বপুরুষের কাহারও নাম পাওয়া যায় না। মানপতির অস্তিত্ব জ্ঞাপক নিদর্শন মাড়গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে ;—যথা—মানপতির রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ তাঁহার কন্যা "মল্লিকাহারের" নামে একটি পুষ্করণী, রাজার পূজিত মাণ্ডব্যেশ্বর শিব, দেবডাঙ্গা, ফাঁসিতলা ইত্যাদি। যেখানে রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, সেই স্থানের নাম এখন দেবডাঙ্গা, এবং রাজ্যের গুরু-অপরাধীগণ যেখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত, সেই স্থানের নাম ফাঁসিতলা। মানপতি নাকি স্বাধীন রাজা ছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে দিল্লী হইতে "শা জাফর খাঁ গাজী ওরফে মহম্মদ হোসেন" নামক একজন মুসলমান সাধু মাণ্ডব্যপুরে উপস্থিত হন, এবং যুদ্ধে মানপতিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে, এই গাজী দিল্লীশ্বর সুলতান মহম্মদ বিন্ তোগলক শাহের আত্মীয়। ৭২৫ হইতে ৭৫২ হিজরী পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১৩২৫—৫১) মহম্মদ

মাণ্ডব্যের আশ্রম

মানপতি রাজা

গাজীর আগমন ও মানপতির নিধন

তোগলকের রাজ্যকালে, কেবল যে মুসলমান ফকিরগণই বাঙ্গালায় আসিয়া ছিলেন তাহা নহে—দুই একজন রাজ-অনুচর আসিয়াও শেষে রাজ্যেশ্বর হইয়া বসিয়া ছিলেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিনে বর্ণিত আছে, “সুলতান মহম্মদ তোগলকের খুড়তুতো ভ্রাতা মালিক ফিরোজের আলী মবারক নামে এক অনুচর ছিলেন্। মবারকের ধাত্রী-পুত্র ছিলেন হাজী ইলিয়াস। ইলিয়াস কোনো অপরাধ করিয়া দণ্ডভয়ে দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। আলী মবারক তাঁহার সন্ধান করিতে না পারায় ফিরোজ কর্তৃক দিল্লী হইতে নির্বাসিত হন। মবারক বাঙ্গলায় আসিয়া গৌড়েশ্বর মালিক পিণ্ডার বা কাদর খাঁর আশ্রয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। (সুবর্ণগ্রামের শাসক) মালিক ফকর উদ্দিন বিদ্রোহী হইয়া কাদের খাঁকে নিহত করিলে, সুযোগ-বুঝিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক মবারক গৌড়-সিংহাসন দখল করিয়া বসেন। আলী মবারক নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তখন তাঁহার নাম হয়, আলাউদ্দীন আলীশাহ। কিছুদিন পরে ইলিয়াস উপস্থিত হইলেন। আলীশাহ তাঁহাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু ধাত্রীমাতার অনুরোধে শেষে মুক্ত করিয়া দিলেন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াস রাজ্যে একটা উচ্চপদও লাভ করিলেন। ইহারই প্রতিফল স্বরূপ, অল্পদিনের মধ্যে দল-বল সংগ্রহ করিয়া ইলিয়াস, একদিন মবারককে পরলোকের পথ দেখাইয়া দিয়া নিজে গৌড়েশ্বর হইয়া বসিলেন।” কেহ কেহ বলেন ১৩৭১ খৃঃ অঃ মহম্মদ বিন্ তোগলক পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণগ্রামের সুলতান ফকর উদ্দীনকে দমন করিবার জন্য একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক উপরোক্ত ঘটনা বলীর আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লী হইতে বহু যুদ্ধব্যবসায়ী এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ফকির হউন, আর রাজপুত্রই হউন, যুদ্ধবিদ্যাটা সকলেরই অভ্যস্ত ছিল, আর সঙ্গে ইহাদের দলবলও বেশ থাকিত। ইহাদের মধ্যে সুবিধা অনুসারে কেহ বা রাজ্যলাভ করিয়াছেন, কেহ বা জমিদার হইয়াছেন, কেহ ধর্ম্মের আস্তানা পাতিয়া ঐ সমস্ত রাজ্যেশ্বর বা জমিদারের নিকট হইতে পীরোত্তর আদি পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মালোচনায় জীবন কাটাইয়াছেন। মাণ্ডব্যপুরে সমাগত জাফর খাঁ গাজী শেষোক্ত দলেরই একজন। প্রবাদ-কাহিনী সত্য হইলে ইনি প্রায় পাঁচশত আশী বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে আগমন করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় মাণ্ডব্যপুরে মানপতি নামক হিন্দু রাজা বর্ত্তমান ছিলেন।

বাঙ্গলায় মুসলমান আগমন

জাফর খাঁ গাজীর আগমন কালে

প্রবাদ আছে, কোথাকার বিনোদ নামক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গাজী

সাহেব নিহত হন। তাঁহার মস্তক নাকি ত্রিবেণী অঞ্চলে পড়িয়া আছে, দেহ মাড়গ্রামে সমাধিস্থ রহিয়াছে। যেখানে মাণ্ডব্যেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই স্থানেই গাজীর সমাধি হয়। মূল সমাধি দুই ভাগে বিভক্ত, ইহার একটি নাকি-গাজীর আর অপর-টিতে তাঁহার ভগিনী সমাহিত রহিয়াছেন। আশে-পাশে আরো কয়েকটি সমাধি আছে। শিবলিঙ্গ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু সমাধি-প্রান্ত-স্থিত একটি প্রস্তর-খণ্ডে মাঝে মাঝে দুগ্ধধারা ঢালিয়া আজিও হিন্দুগণ,—বোধহয় অতীত স্মৃতিরই তর্পণ করিয়া থাকেন। মাড়গ্রামের পশ্চিমে শা গরিব-উল্লা-বিয়াবানি, দক্ষিণে শা মাদার, উত্তরে শা কবমউদ্দীন এবং পূর্ব্বে উক্ত জাফর খাঁ গাজীর সমাধি বিদ্যমান। গ্রামের উত্তরে একটি উৎস আছে, উৎস হইতে অবিরত শীতল-জল নির্গত হইতেছে। সাধারণের বিশ্বাস 'হাত-তালি' দিলে উৎসধারা বর্দ্ধিত বেগে বাহিরে আসিতে থাকে। মাড়গ্রাম নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মুসলমানগণ বলেন, যে গাজী সাহেবের 'মান্দ-গ্রাম'—'কদমরাখ্‌খা' অর্থাৎ প্রথম পদার্পণ ভূমি বলিয়া এইস্থানের নাম মান্দ-গাম্‌ হইতে মাডগ্রাম হইয়াছে। 'মাণ্ডব্য' হইতে 'মাণ্ড', ক্রমে 'মাড' হওয়াও স্বাভাবিক। বিশেষ গাজীর পূর্ব্বে হিন্দুরাজা যখন ছিলেন, স্থানের নামতো একটা কিছু ছিল। হইতে পারে পূর্ব্ব নাম মাণ্ডব্যপুর, মুসলমান আগমনের পর মান্দগাম হইতে মাড়গ্রাম আখ্যা লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, উভয় পক্ষের কথিত প্রবাদ কাহিনী উপরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উপর বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। পুরাণে 'মাড়ব' নামে একটি জাতির পরিচয় পাই। অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন অনার্য্যগণই রাঢ়বঙ্গাদির আদিম অধিবাসী। তাঁহাদিগের নিকট হইতেই আর্য্যগণ এই সমস্ত স্থান অধিকার করেন। সুতরাং মাড়গ্রামে 'মাড়ব' জাতির বাস থাকা অসম্ভব নহে। মানপতিরাজার পূর্ব্বপুরুষ অথবা মাণ্ডব্য মুনি হয়তো তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া এতদঞ্চলে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছিলেন। এই মাড়ব হইতেও মাড়গ্রাম হওয়া বিচিত্র নহে। একখানি কুলগ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোক পাইয়াছি,—"লেটস্তীবর কন্যায়াং জনয়ামাস যন্নরান্‌। মাল্লং মল্লং মাড়বঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্‌"। মাড়গ্রামে গাজী সাহেবের বংশধর শ্রীযুক্ত জিল্লার রহমান সাহেব বর্ত্তমান আছেন। তিনি শিক্ষিত, সজ্জন ও বিনয়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ কোনো তথ্য তিনি অবগত নহেন। আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা লোকপরম্পরাপ্রচলিত প্রবাদ মাত্র। আশাকরি জিল্লার রহমান্‌ সাহেব তাঁহার পিতৃপিতামহের সত্য ইতিহাস সংগ্রহে যত্নবান্‌ হইবেন। তুনি-

গাজীর সমাধি

হিন্দুর শিব

পীর চতুষ্টয়
মাড়গ্রামে উৎস

নামের ব্যুৎপত্তি

মাড়ব জাতি
ও মাড়গ্রাম

গাজীর বংশধর

যাছি মাড়গ্রামে হিন্দু মুসলমানে বড় ভাব। অনেকদিন হইতেই এই প্রীতির বন্ধন অটুট আছে। হিন্দু জমিদার কর্ত্তৃক মসজিদেব ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য মুসলমানকে আয়মা দান, এদেশে তখন অনেক ছিল। মাড়গ্রামে তাহার এক নিদর্শন পাইয়াছি। আর একখানি বিক্রয়পত্র পাইয়াছি, নলহাটি-কাহিনীতে প্রকাশিত বিক্রয় পত্র অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা এই দানপত্র ও বিক্রয়পত্র খানি প্রকাশ কবিয়া দিলাম।

হিন্দু জমিদার কর্ত্তৃক মসজিদের সাহায্যার্থ দানপত্র

দানপত্র

ইয়াদি কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীমিঞা পান্না খোজেস্ বায় সবকাব শ্রীযুক্ত মহারাজা সরূপচন্দ্র সিংহ জিউ সচ্চবিতেষু আয়মা পত্রমিদং সন এগাবসত বাসটি সালাবে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে আমার তালুক মৌজে হায় মজকুরের মধ্যে ২৫ পচিষ বিঘা জমী খারিজ জমানা * * * জিরাত তোমাকে ৺মসিদের খরচকারণ আয়মা দিলাম জমী মজকুব আবাদ তবদ্দদ কবিয়া জমী মজকুরেব 'মহযুন' ৺মসিদের খরচ করহ জমী মজকুরের বাজস্ব সহিত তোমার এলাকা নাই এতদর্থে আয়মা পত্র দিলাম ইতি সন ১১৬২ সাল বাঙ্গলা তারিখ ৫ পাচঞী মাহ বৈশাখ

বিক্রয় পত্র

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ দত্ত

শ্রীমনষুক দত্ত

শ্রীখড়্গেশ্বর দত্ত

৭ শ্রীশ্রীরাম

৺ই আদি কীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় খরিদগিকারক শ্রীকৃপারামসেন মজমদার সচ্চরিতেষু—

বিক্র আমিক শ্রীচন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও শ্রীমনষুক দর্ত্ত ও শ্রীখড়্গেশ্বর দর্ত্ত নাখেরাজ [illegible] পত্রমিদং লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে আমার দিগের তালুক পৌত্রিকা কীস্মৎ ননগর দরুন পরগনে নয়া নগর সরকার ওড়ম্বর কীস্মৎ মজকুরের মাল

গুজারির সরবরাহ আমার দিগের হইতে নহিল এ কারন সেচ্ছা পূর্ব্বক তালুক মজকুর মধ্যে আকন্দ গৈরার পশ্চিম তাহিরপুরের এক কীর্ত্তা জমির পশ্চিম শ্রীযুক্ত রায় সিংহের তালুকের বাকী কীরের পূর্ব্ব দুইকীর্ত্তা কড়চ একবিঘা চারিকাঠা মাগুরার পূর্ব্বে সিহ মজকুরের তালুকের পূর্ব্বে সিমৈল জুলি এককীর্ত্তা সাতকাঠা জোল বড় সের পুনির উত্তর ও মাঠের উত্তর পাহাড়ের নামে দুই কীর্ত্তা আউয়ল মাঠ পোন্দোব কাঠা একুনে পাচকির্ত্তা কাত জমী দুই বিঘা ছয়কাঠা সালিজমি মাফিক তপসিল জএন সেউআয় হাতা নর্ব্বাই হাতের রসিতে বাজ জব্দ মত জমী জব্দ কবিঞা দিঞা তোমাকে নাখেবাজ খরিদগি দিল অস্ত পত্রন ফিরিখের মৌজিমে তপসিল মবলগেব ত্রিশটাকা তেথয়ানা সিকা দস্ত বদস্ত লইয়া আপন তালুকেব বাকীতে ও মহাজনান সোদে দাখিল কবিল জমী মজকুরের খাজনা আমি আপন তালুকের সামিল করিব ইবসাল মালগুজারি কবিব তোমার সহিত এলাকা নাই তুমি জমী মজকুবেব আপন দখল লইয়া আবাদ তবদদ করিঞা জমী ইসসা পূর্ব্বক পরম সুখে পুত্র পহোত্রাদি ক্রমে ভোগ কর আমি ও আমার দিগেব ওয়ারিশান সহিত এলাকা নাস্তি ওসানিন * * কেহ দায়া কবে এবং কস্মীন কালে কেহ দস্তাকরে আমাব দিগেব জির্ম্মা দান বিক্রয অধিকার তোমাব এতদর্থে নাখেরাজ খরিদগি পত্র দিল ইতি সন ১১৬৮ সাল তারিখ ২৪ জৈষ্ট (১০)

তপসিল জমি।

আসামী	কীর্ত্তা	জমী	দর ফি বিঘে	নেট
আকন্দ গৈরা	২	১/৪	পত্রন	১৭।০
সিমৈলজুলী	১	।২	১৪।৵০	৫।০
বড় সেরপুনির			১৫৲	
মাঠ আউয়ল	২	৸০	১১/১২	৮।/৪০

মহারাজ স্বরূপসিংহ ও মিঞা খোজেস রায়

আয়মা পত্রখানি একশত চৌষট্টি বৎসরের পুরাতন। ইহা হইতে শ্রীযুক্ত মহারাজা স্বরূপচন্দ্র সিংহ জিউব নাম পাইতেছি। মিঞা পান্না খোজেসরায় যে গৃহীতা ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সিংহ জিউকে 'সচ্চরিতেষু' হইতে দেখিয়া একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। কমুনগোই মহেন্দ্র নারায়ণ সিংহ টি কে? অনুমান হয় তিনি মহারাজারই কর্ম্মচারী ছিলেন। লিখিবার দোষেই সনন্দ খানিতে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গৃহীতা খোজেস রায় এবং দাতা

(১০) আমাদের পরম স্নেহাস্পদ,—রামপুরহাট (পুরাতন) হাইস্কুলের ছাত্র শ্রীমান মহম্মদ জমির এই কাগজ দুইখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি খোদাতালার কৃপায় শ্রীমানের মঙ্গল হউক।

সরকার মহারাজ স্বরূপচন্দ্র, ইহাই বোধ হয় সনন্দ খানির মর্ম। সনন্দ দানের সময় বঙ্গাব্দ ১১৬২ সালে (খৃঃ ১৭৫৫ অঃ) মুর্শিদাবাদের মসনদে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরকার সরীফাবাদের অন্তর্গত সাহজাঁহাপুর পরগণার মধ্যে আমিনা বাজার ও মুরারীপুর মহারাজের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজা টোডর মল্লের আমলে "ওড়ম্বরের দক্ষিণ হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান নগর ও পরগণাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সরকার সরীফাবাদ বিস্তৃত হয়"। (১১) এই সরকার ২৬ পরগণায় বিভক্ত ছিল। উত্তর কালে মুর্শিদকুলি যখন চাকলা বিভাগ করেন, তখন সরকার ওড়ম্বর ও সরীফাবাদ প্রভৃতির অধিকাংশ ভূভাগ লইয়া চাকলা মুর্শিদাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বীরভূমের কতকাংশ ও ফতেসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মহারাজা স্বরূপসিংহ ফতেসিংহ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন স্বরূপচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ অনাদিবর সিংহ শূররাজগণের সামন্ত রাজরূপে গঙ্গার পশ্চিম-কূলে সিংহপুর হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিকার প্রাপ্ত হন। (১২) রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনুমান করেন খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ফতেসিংহ অঞ্চলে এই রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মহারাজ স্বরূপসিংহের নামে একটি পরগণা আজিও বর্ত্তমান আছে। পরগণার নাম স্বরূপসিংহ।

ওড়ম্বর সরকারের সীমা।

ফতেসিংহের প্রাচীন সীমা

বিক্রয়পত্রখানি হইতে ননগর (গড়), পরগণে নয়ানগর ও সরকার ওড়ম্বরের নাম পাওয়া যায়। "বাঙ্গলার দ্বারস্বরূপ তেলিয়াগড্ডী ও শকরীগলি হইতে বর্ত্তমান রাজমহল প্রদেশ লইয়া ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত চুনাখালি পর্য্যন্ত ভূখণ্ড সরকার ওড়ম্বর নামে অভিহিত হয়।" (১১) বীরনগর-কাহিনীতে আমরা যে ননগড়ের উল্লেখ করিয়াছি, এবং যাহার নাম নয়গড় হইতে অপভ্রংশে ননগড়ে পরিণত হইয়াছে বলিয়াছি, ইহা সেই ননগড় বা নয়গড়। (১৩) নয়গড হইতেই পরগণে নয়ানগরের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। মুর্শিদাবাদ চাকলা সৃষ্টি হওয়ার পর ননগড় প্রভৃতি স্থান মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। বিক্রয়পত্র হইতে অবগত হওয়া যায়,—দেড়শত

ননগড় বা নয়াগড

(১১) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৩৩২ পৃঃ।
(১২) রাজন্যকাণ্ড, ১৩২ পৃঃ।
(১৩) বীরনগর কাহিনী দ্রষ্টব্য।

বৎসর পূর্ব্বে সরকার ওড়ম্বরের নাম প্রচলিত ছিল, তবে নলগড় প্রভৃতি চুনাখালি পরগণা হইতে নয়ানগর পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত কাগজ পত্র হইতে বাঙ্গলার ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণও হয়তো কিছু সাহায্য পাইতে পারেন।

বিষ্ণুপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে রেশমের কাজ

মাড়গ্রামের পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর গ্রাম। বিষ্ণুপুর এবং তাহার পাশাপাশি অবস্থিত বসোয়া ও তেঁতুলিয়া গ্রামে সাতশত ঘর তাঁতির বাস। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ গৃহস্থ রেশমের থান-কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মহাজনগণ সেই থান খরিদ করিয়া কলিকাতায় চালান দেয়, তথা হইতে কতক কাপড় যায় বিলাতে, কতক যায় মাদ্রাজে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে। মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যে কাপড় রপ্তানী হয় তাহা কলিকাতার মহাজনগণ শ্রীরামপুরে রং করাইয়া ও ছাপাইয়া পাঠাইয়া দেন। বিলাতে সাদা-থানই রপ্তানী হয়, কিন্তু সেই কাপড়গুলিই বিলাত হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিস্কৃত হইয়া পাতলা কাগজের মোড়কে (বোধ হয় লজ্জায়) গা-ঢাকা দিয়া আবার এ দেশেই আসে এবং তিনগুণ চারিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়, আমরাও সেই বিলাতী জিনিস কিনিয়া তৃপ্তিলাভ করি! বিষ্ণুপুর, বসোয়া ও তেঁতুলিয়া হইতে বৎসরে এখনো প্রায় দশলক্ষ টাকার থান-কাপড় প্রস্তুত ও বিদেশে রপ্তানী হয়। এই ছয় সাত শত ঘর তাঁতির মধ্যে মহাজন-শ্রেণীর লোক প্রায় কুড়ি জন। আট দশ জন যুবক নাকি উচ্চশিক্ষালাভ করিয়াছে! ইহারা সকলেই অবস্থাপন্ন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যৌথ-কারবারের চেষ্টা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা ইচ্ছা করিলেই বিদেশ হইতে কারিকর আনাইয়া অথবা ছেলে-পুলেদের বিদেশে পাঠাইয়া থান পরিষ্কার ও রং করার পদ্ধতিটা অনায়াসেই আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু সে দিকে কাহারো লক্ষ্য মাত্র নাই।

বিষ্ণুপুরের মহাজন ও তন্তুবায় সংখ্যা

পূর্ব্বে এখানকার মহাজনেরা মুর্শিদাবাদের মহাজনদিগকে কাপড় বিক্রয় করিতেন, তাহারা সেই সমস্ত কাপড় নৌকায় করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেন। এখন মুর্শিদাবাদের সঙ্গে কারবার উঠিয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুরের অন্যতম মহাজন শ্রীযুক্ত লাবণ্যগোপাল মণ্ডলের পিতামহ নিত্যানন্দ মণ্ডল এন্, এল, এম, মার্কা থানের প্রচলন করিয়া যান। এখন নাকি এই মার্কা থানের বিলাতে বড় আদর। বিষ্ণুপুরে ৬৫০ ঘর এবং বসোয়ায় ৬০০ ঘর লোকের বাস। অধিকাংশই তন্তুবায়। উপাধি দেখিয়া মনে হয় ইহারা নানা স্থান হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। একনামের দুই তিনি জন

লোকের মধ্যে যদি গোলযোগ ঘটে, সেই জন্ম সাবধানী সামাজিকগণও কয়েকটি বিচিত্র উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্ম নসীপুরী প্রভৃতি উপাধির সঙ্গে 'গড়ে গাবা' উপাধিও স্থান পাইয়াছে। যেমন 'গদাধর গড়েগাবা'! গড়ে গাবার মানে করিলে দাঁড়ায় ছোটপুকুরের ভিতরের দিক্‌টা। নদীগর্ভ, পুষ্করিণীগর্ভ প্রভৃতি শব্দের গর্ভ হইতেই অপভ্রংশে 'গাবার' জন্ম। এ যেন সেই শ্রীচৈতন্তের সময়ের 'খোলাবেচা' প্রভৃতি উপাধির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিষ্ণুপুরের সামাজিক উপাধি

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের যত্নে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়াছি। এক পুণ্যবতী নারীর অর্থে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই দানশীলা-মহিলার নাম শ্রীযুক্তা রসমঞ্জরী দাসী। বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। ইহার বিবাহ হইয়াছিল মাড়গ্রামে। বিবাহের কিছুদিন পরে স্বামী-বিয়োগ ঘটিলে শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না বলিয়া ইনি পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। সহোদর ভ্রাতা বৃন্দাবন মণ্ডল নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইলে তাঁহার উইল অনুসারে প্রথমে মাতা, পরে ভগিনী রসমঞ্জরী বৃন্দাবনের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপুর বিদ্যালয়ের জন্ম ইনি পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা রসমঞ্জরীর দান

ব্যবসায়ে যে দুইটি জিনিসের (সততা ও ধর্ম্মবুদ্ধির) অভাবে বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ হইতেছে, যে ভেজালের বিষ-জ্বালায় বাঙ্গলা উৎসন্নপ্রায়,—বিষ্ণুপুর অঞ্চলের থান-কাপড়েও তাহা প্রবেশলাভ করিয়াছে। কাপড় নাকি ওজনে লওয়া হয়, তাই তাঁত হইতে নামাইয়া পাট করিবার সময় তাঁতিরা ইহাতে চিনি মিশাইতেছে। যাহারা মজুরী লইয়া কাপড় বুনিয়া দেয়, তাহারাই এই কাজ করে। ইহারা ওজন করিয়া রেশম লইয়া যায়, সুতরাং রেশম চুরী করিতে তাহাদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হয়। তাঁতিদিগকে এই আত্মহত্যার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্যই বিষয়টীর উল্লেখ করিতে হইল। একে তো বীরভূমের রেশমের চাষ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, বড় বড় কুঠী যাহাতে হাজার হাজার লোক প্রতিপালিত হইত, সবই উঠিয়া গিয়াছে, এখন সবে ধন-নীলমণি আছে রেশমের কাপড়ের ব্যবসায়। কিন্তু তাহাতে যদি পাপ প্রবেশ করে, তবে সে ব্যবসায় আর কতদিন? অধর্ম্মে কখনো কোনো জাতির উন্নতি হয় না, কখনো হয় নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন কোনো কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না, এ নীতি যাহারা ভুলিবে, তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমাদের মুখের কথা নহে,—ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য। সকলেই যে মন্দ এমন কথা আমরা বলিতেছি না।

রেশমে ভেজাল

তবে যাহারা এই পথ ধরিয়াছেন, তাহাদের জন্য এই অপ্রিয়-প্রসঙ্গের অবতারণা।

বিষ্ণুপুরের গোপাল

বিষ্ণুপুরে গোপালদেব বিগ্রহ আছেন,—প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠিত। শুনিতে পাওয়া যায় বর্গির হাঙ্গামার সময় বর্গিরা গ্রাম লুঠ করিতে আসে। মুসলমান বর্গিরা গোপালদেবের মন্দিরের দ্বার ভাঙ্গিয়া বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করিতে উদ্যত হইল, কতকগুলি সাংঘাতিক রকমের বোল্‌তা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বর্গিরা বেলতার কামড়ে জ্বালাতন হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

শরবোনার শরাক জাতি

রামপুরহাটের পশ্চিমে শরবোনা নামে গ্রাম। এই গ্রামে 'শরাক' নামে এক জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে মৎস্য মাংসের ব্যবহার নাই। বালকেও মাছ মাংস খায় না। উপাধি 'হন্দ', 'রক্ষিত', 'দত্ত', 'প্রামাণিক', সিংহ', 'দাস' ইত্যাদি। এই জাতি এখন শূদ্রের মত একমাস অশৌচ পালন করে, হিন্দুর যাবতীয় ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান করে। কৃষি-কার্য্য ইহাদের প্রধান জীবিকা। কেহ তাঁত বোনে, দোকান করে। বিধবাগণ ব্রাহ্মণের বিধবার মত একাদশী করিত থাকে। নবশাখগণের পুরোহিত দ্বারাই ইহাদের যাবতীয় পূজা পার্ব্বণ-সংস্কার কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। ইহাদের গোত্র "গৌতমঋষি, অধুঋষি, অনন্তঋষি, কাশ্যপ ও আদিদেব" ইত্যাদি। পূর্ব্বে যে ইহারা বৌদ্ধ ছিল কোনো সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় ছিল একটির নাম "শ্রমণ" অপরটির নাম 'শ্রাবক'। শ্রাবক হইতে ক্রমে শরাক হইয়া গিয়াছে। জাতির মধ্যে মৎস্য-মাংসের অব্যবহার্য্যতা, আদিদেব গোত্র, ও শরাক নাম বৌদ্ধত্বের শেষ নিদর্শন স্বরূপ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা কোন্ সময় হিন্দু-সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, জানিতে পারা যায় না। এই জাতির সংখ্যা সম্প্রতি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান কার্য্য এখন একটি সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বীরভূমে বলেরপুর, সাঁওতাল পরগণার সাদিপুর, শিলাজুড়ি, জয়তারা, বাঁশফুলি, বিলকান্দি ও হাড়জুড়ি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের স্বজাতি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সংখ্যায় তাহারা অত্যন্ত অল্প। যেরূপ দ্রুতগতিতে এই জাতির জন-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় অদূর ভবিষ্যতে এই জাতির নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এক শরবোনাতেই প্রায় একশত ঘর শরাকের বাস ছিল, এখন সংখ্যায় ১৫।১৬ ঘর হইবে কিনা সন্দেহ। গ্রামে শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই গ্রামে একজাতীয় মাটি পাওয়া যায়, মাটির কিগুণ আছে জানি না কিন্তু এই মাটি

শৈলেশ্বর শিব
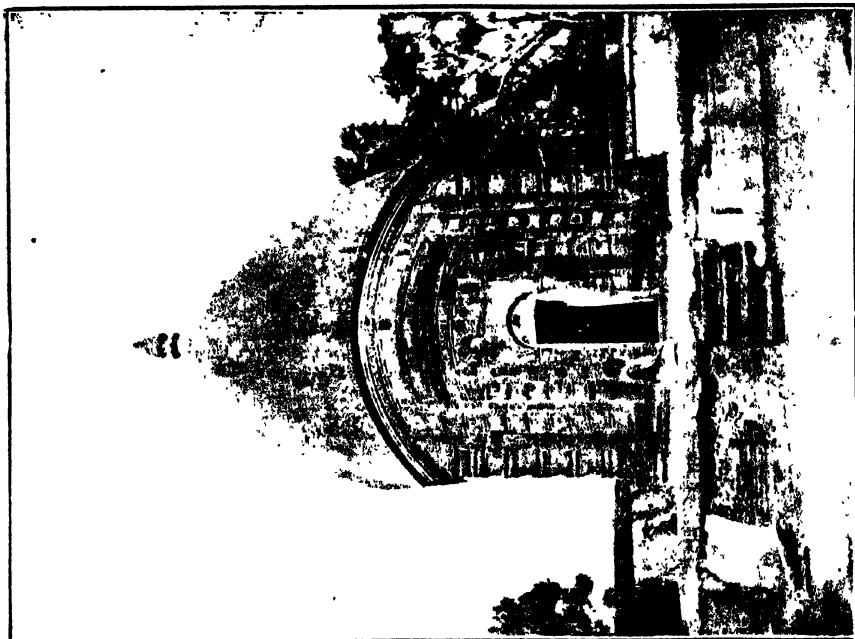
ভিন্ন লোহা প্রস্তুত হইত না। পূর্ব্বে যখন এই অঞ্চলে লোহা তৈরী হইত, তখন শালের উপরে লেপন দেওয়া প্রভৃতির কাজে এ মাটি ভিন্ন অন্য মাটির-ব্যবহার চলিত না।(১৩)

খরবোনার পশ্চিমে প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে মৌবুনিডাঙ্গা। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, মধ্যে প্রায় ৪০।৫০ বিঘা পরিমিত সমতল-ভূমি। প্রবাদ আছে "এই স্থানে বহুপূর্ব্বে রাজবাড়ী ছিল। বর্গির হাঙ্গামার সময় বর্গিরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করিত।" পাহাড়ের নীচে নীচে পরিখার মত চিহ্ন

মৌবুনিডাঙ্গার ভগ্নাবশেষ

(১৪) 'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্রিকার শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতিভূর্ষণ নামে একজন লেখক লিখিয়াছিলেন (পৌষ ২য় ১৩২৪। ফাল্গুন সংখ্যায়) 'খরবোনায় বোড়ো'-জাতির বাস আছে এবং তাহারা না কি বৌদ্ধ ছিল। আমরা বহু অনুসন্ধানেও খরবোনায় বোড়ো-জাতির কোনো সন্ধান পাইলাম না। তবে লেখকের বাস গ্রামের নিকটে পেটারী প্রভৃতি স্থানে বোড়ো জাতির বাস আছে বটে, কিন্তু তাহারা বৌদ্ধ ছিল না। বহু প্রাচীন লোকের মুখে শুনিলাম, বোড়োরা সৎগোপ জাতি, বর্গির হাঙ্গামার সময় পতিত হইয়াছে। গ্রামে এমন অনেক সৎগোপ রহিয়াছে, বোড়োদের সঙ্গে যাহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। মাত্র পাঁচ পুরুষের বংশ-তালিকা অনুসন্ধান করিলেই বোড়ো ও সৎগোপের এমন বহুলোকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে সোদর সম্বন্ধ ছিল। দুই সহোদর ভ্রাতার মধ্যে একজন সৎগোপ রহিয়া গিয়াছে, অপর ভ্রাতা বা তাহার পুত্র পতিত হইয়া কালে বোড়ো নামে অভিহিত হইয়াছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে। শুনিলাম বর্গির হাঙ্গামার সময় বর্গিদলভুক্ত মুসলমানগণ ঘরে ঢুকিয়া লুঠতরাজ ও স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করায় হাঙ্গামার শেষে সমাজ কর্তৃক অনেকে পতিত হইয়াছিল। অনেকেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিয়াছিল। বোড়েদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধনগর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত হয় নাই, ইহাই তাহাদের পাতিত্যের ইতিহাস। কিছু কম প্রায় একশত বৎসর গত হইল মৌড়কান্দি গ্রামের গোবিন্দ মণ্ডল নামে কোনো সমাজপতি, একবার ইঁহাদিগকে জাতিতে উঠাইবার চেষ্টা করে। লোক সমারোহ হইলে পেটারীর আনন্দ মণ্ডল বলে যে গোবিন্দ মণ্ডল যদি উঁহাদের বাড়ীতে কন্যাদান করে, তবেই আমরা উঁহাদিগকে জাতিতে উঠাইতে পারি। গোবিন্দ মণ্ডল তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় কথা হয় যে, একটা খুব উঁচু তেঁতুল-গাছে উঠিয়া যত দূর দেখা যায়, তত দূর পর্য্যন্ত গ্রামের সমস্ত সৎগোপগণকে ভোজ দিতে হইবে। পতিত দর অবস্থা তখন ভাল ছিল না, এ প্রস্তাবে তাহারা সম্মতি দিতে পারিল না, রাগে গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিল এ ভেড়োরা কিছুই পারিবে না। ইহাদের জাতিতে উঠিবার আশা নাই। ভড়ূয়া বা ভেড়ূয়া শব্দের অর্থ বোধ হয় গোলাম। অনেককে এখনো এই গালি ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। সেই হইতে একটা বড় রকমের ভোজ নষ্ট হইয়া যাওয়ায়—কেহ ক্ষোভে, কেহ দুঃখে, কেহ বা ঠাট্টা করিয়া ইহাদিগকে ভোড়ো বলিতে আরম্ভ করে। ভোড়ো, দ্রুত উচ্চারণে জল-বায়ুর গুণে বোড়ো হইয়াছে।

বোড়ো-জাতি

আছে। পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমির এক পার্শ্বে একটি পুষ্করিণীর চিহ্ন দেখিতে যায়। নিকটেই ভাটিনা নামে একখানি গ্রাম আছে, সেখানেও এক 'রাজ-বাড়ীর' প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। খরবোনার উত্তরে 'বুমকোতলা' নামে একটি ডাঙ্গায় বুমকেশ্বরী-দেবীর নামে পৌষ-সংক্রান্তি হইতে দশ বার দিনব্যাপী একটি মেলা হয়। সেখানে একটি উৎস আছে, উৎস হইতে অবিরত শীতল জল নির্গত হয় বলিয়া স্থানটির চলিত কথায় বুমকোতলা নাম হইয়াছে। ইহার অদূরে কুতম্বা নামে গ্রাম। কুতম্বায় কুম্বমাতী নামে এক দেবী আছেন। দেবীর কোনো মূর্ত্তি নাই, তবে মন্দির-প্রাঙ্গণে এক প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের তলায় কতকগুলি ভগ্ন-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। নিকটবর্ত্তী বলরামপুর গ্রামেও কতকগুলি ভগ্ন-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটি বৌদ্ধ-দেব-মূর্ত্তি ও বাকী প্রায় হিন্দু-দেব-মূর্ত্তির ভগ্নাংশ, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। খরবোনার বড়জোল গ্রামে একটি ধ্বংস-স্তূপ "রাজবাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। বড়জোলার পশ্চিমে বেলপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে, তাহার পশ্চিমে নাককাটিতলা। তথায় কয়েকটি অনতিবৃহৎ বাসুদেব-মূর্ত্তির অংশ বিশেষ দেহুরী উপাধিধারী মালজাতি কর্ত্তৃক পূজিত হয়। বড়জোলে বসুমতী-দেবী আছেন। নাককাটি ঠাকুর ও বসুমতী-দেবী এবং ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের বৎসরে দুইবার,—আষাঢ় সংক্রান্তি ও পৌষ সংক্রান্তিতে বেশ ধুমধামের সহিত পূজা হয়। খরবোনা হইতে এই বড়জোল পর্য্যন্ত স্থানের বিষয় আলোচনা করিয়া মনে হয়,—বীরভূমের এই অঞ্চলও বহু প্রাচীন এবং পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থান খুব সমৃদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ-দেব-মূর্ত্তি এবং শরাক-জাতি বৌদ্ধ-প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি জাগ্রত করিয়া তোলে। এই অঞ্চলের 'রাজবাড়ী' গুলির বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

দেবী বুমুকেশ্বরী

কুম্বমাতী

বসুমতী-দেবী

রামপুরহাটের কতকটা উত্তরপশ্চিমে নারায়ণপুর। রামপুরহাট যখন নিতান্ত নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লী মাত্র, তখন এই নারায়ণপুরই ছিল এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান ধনজনপূর্ণ জনপদ। নারায়ণপুরেই উত্তরপ্রান্তে ব্রহ্মাণী নদী প্রবাহিত। পূর্ব্বে এই নদীপথে নৌকাযোগে নারায়ণপুরে সুপারী প্রভৃতি আমদানী হইত এবং নারায়ণপুর হইতে আজিমগঞ্জের নিকবর্ত্তী লোহাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে লোহা প্রভৃতি বিবিধ জিনিসের চালান যাইত। ব্রহ্মাণীর দক্ষিণ তীরে নারায়ণপুরের ঈশান-কোণে 'মল্লেশ্বর' শিবের মন্দির আছে। 'গ্রামের' অগ্নি-কোণে বলিহার নামক পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে কোনো 'রাজার বাড়ী' ছিল বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নারায়ণপুরের পশ্চিমে সালকুনি নামক স্থানেও 'এক রাজা' ছিলেন, এই-

নারায়ণপুর গ্রাম

রূপ প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। নারায়ণপুরে লোহার কারবার খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গাব্দ ১২৬০ সালে নারায়ণপুরে কাঁচা লোহা তৈরির জন্য ৭৫টি 'কোটুসাল' ও কাঁচা লোহাকে পাকা করিবার জন্য ৭৫টি ডুকিশাল স্থানীয় লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। নিকটবর্তী বলবন্ত-নগরের সীমানায় (নারায়ণপুরের প্রায় তিনমাইল মধ্যে) ব্রহ্মাণীর অপর তীরে আরো ২৫টি কোটুশাল ও ২৫টি ডুকিশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতি কোটশালে প্রায় একশত করিয়া মজুর খাটিত। ডুকিশালে (ইহা আধুনিক পাড়াগাঁয়ে চলিত কামারশালের মত) বেশী মজুরের প্রয়োজন হইত না। বর্ষায় প্রায় চারিমাস কাল কোটুশালের কাজ বন্ধ থাকিত। এক একটা কোটুশাল হইতে প্রতি ক্ষেপে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মণ কাঁচা লোহা প্রস্তুত হইত। এই লোহার মণ ছিল পাচসিকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত। অন্যান্য খরচ ও মজুরী বাদে একটা কোটশালে প্রতি ক্ষেপে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ টাকা লাভ থাকিত। পাকা লোহা পাঁচ টাকা—সাড়ে পাঁচ টাকা মণদরে বিক্রয় হইত। পাকা লোহা বিক্রয় করিয়াও প্রতি শাল হইতে মাসে প্রায় একশত টাকা হিসাবে লাভ পাওয়া যাইত। সন ১২৯০-৯৪ সাল হইতে নারায়ণপুরের লোহার কারবার উঠিয়া গিয়াছে। বৈদেশিক লোহার আমদানীই তাহার কারণ। এই শ্রমসাধ্য দেশীয় কারখানাগুলি এঞ্জিন-চালিত যন্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়াই চিরকালের জন্য লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে। এক নারায়ণপুর হইতেই প্রতি দিন প্রায় দশহাজার মজুরের অন্ন সংস্থাপন হইত,—ইহা বড় সহজ কথা নহে। নারায়ণপুরের উত্তর প্রান্তে ব্রহ্মাণীর তীরে কালো-পাহাড়ের শ্রেণীর মত স্তূপী-কৃত লৌহমণ্ডুররাশি—সেই অতীত সমৃদ্ধির শেষচিহ্ন রূপে আজিও দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। কোটশাল হইতে কিরূপ পদ্ধতিতে লৌহ প্রস্তুত হইত, আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

নারায়ণপুরে লোহার কারবার

প্রায় দশ হাত দীর্ঘ, দশ হাত প্রস্থ এবং সাত হাত গভীর একটি গর্ত্ত কাটিয়া তাহার চারিপার্শ্বে অন্ততঃ সাত আট হাত দূরে—মোটা মোটা শাল বা তাল গাছের খোঁটা পুঁতিয়া বেশ উঁচু রকমের একটা চালা তুলিতে হইত। গর্ত্তের মাঝামাঝি একটা দেওয়াল উঠাইয়া গর্ত্তটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিত। এই দেওয়াল খয়রোনার মাটি ভিন্ন অন্য মাটিতে তৈরী হইত না। গর্ত্তের সমতল ভাগের সঙ্গে মিলিয়া দেওয়ালের সর্ব্বনিম্নাংশে—মাঝখানে একটি বড় ছিদ্র থাকিত। গর্ত্তের উপরে একভাগে বেশ শক্ত একটা মাচা বাঁধিতে হইত। মাচার উপর দুই পাশে স্থাপিত দুইটি হাপরের নল পূর্ব্বকথিত দেওয়ালের

ছিদ্রপথে গিয়া গর্ত্তের অপর অংশের খালি দিক্‌টায় প্রবেশ করিত। ইতিপূর্ব্বে শালবুনি ও তাহার রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পাশেই আগড়ের-বন (রাজার গড় হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে) নামে একটা (এখন) বন আছে। সেখানে তিন চারি হাত মাত্র নীচের দিকে খুঁড়িয়া গেলেই এক রকমের পাথর পাওয়া যাইত—এখনো পাওয়া যায়। পাথরগুলির প্রায় বারআনা-ভাগ হল্‌দে এবং সিকি-ভাগ লাল-রঙের। সেই পাথরকে কুচি কুচি করিয়া ভাঙ্গিতে হইত। তারপর খালি গর্ত্তটিতে প্রথমে এক থাক্‌ কাঠকয়লা দিয়া তাহার উপরে ঐ পাথরের কুচি একথাক্‌ বসাইয়া ক্রমান্বয়ে সাত আট থাক্‌ কয়লা ও পাথর (কয়লায় এবং পাথরে প্রতি থাক্‌ প্রায় এক হাত করিয়া উঁচু) সাজাইয়া সমস্তটা ঢাকিয়া প্রায় একদেড় হাত উঁচু করিয়া লেপিয়া দিতে হইত। আবার সেই খরবোনারই মাটি। এই কাজগুলি শেষ হইলে শালে আগুন ধরাইয়া দিয়া, মাচার উপরের হাতনে' দুটিতে দুজন করিয়া চারিজন লোক চাপিয়া, পা দিয়া অনবরত হাতনে' তাওয়াইতে (টিপিতে) থাকিত। একাধিক্রমে প্রায় সাত দিন সাত রাত' অবিশ্রান্তভাবে এই শালের কাজ চলিত। ঘন ঘন মজুর পরিবর্ত্তন করিতে হইত, এই জন্যই প্রতি শালে প্রায় একশত করিয়া মজুর খাটিত। মাচার কথা বলিয়াছি, মাচার নীচেটা একেবারেই খালি রাখা হইত। সেখানে বসিয়া বসিয়া অভিজ্ঞ কারিকর দেওয়ালের সেই ছিদ্রটা দিয়া পাথর এবং (কয়লার) আগুণের অবস্থা দেখিত। পাথর গলিয়া গলিয়া যখন লোহা বাহির হইত, তখন সে সেই ছিদ্রপথে টানিয়া বাহির করিত। এই লোহার নাম ছিল কাঁচা লোহা, আর কারিগরের উপাধি ছিল 'শাশা'। এই লোহাকে আবার পাকা করিতে হইত। এ কাজ যাহারা করিত তাহাদিগকে বলিত 'মেহতর'। গোলাকার লোহার তালের নাম ছিল 'ডুকী', আর লম্বা-রকমের লোহাকে বলিত 'বাতা'। পাকা লোহারই এই দুইটা শ্রেণী ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পঁচাত্তোরটা শালে কাঁচা লোহা এবং পঁচাত্তোরটায় পাকা লোহা তৈরী হইত। যাহার এই শালের কারবার থাকিত লোকে তাহাকে বলিত 'শালুই'। প্রতি কোটশালেই কিছু পরিমাণে উৎকৃষ্ট লোহা বাহির হইত, তাহার নাম 'মূচ্‌', এই লোহা ইস্পাৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল। মূচ্‌ লোহা বারুদের কারখানার লোকেরাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিত। ইহার মণ ছিল প্রায় আট টাকা। এই লোহা আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী লোহগঞ্জে চালান যাইত। রপ্তানীর কারবারেও লোকে মণকরা অন্ততঃ এক

কোটশালে লৌহ প্রস্তুত প্রথা

০ নং কবি গঙ্গানারায়ণের সিদ্ধিস্থান—উদয়পুরের কালীবাড়া।
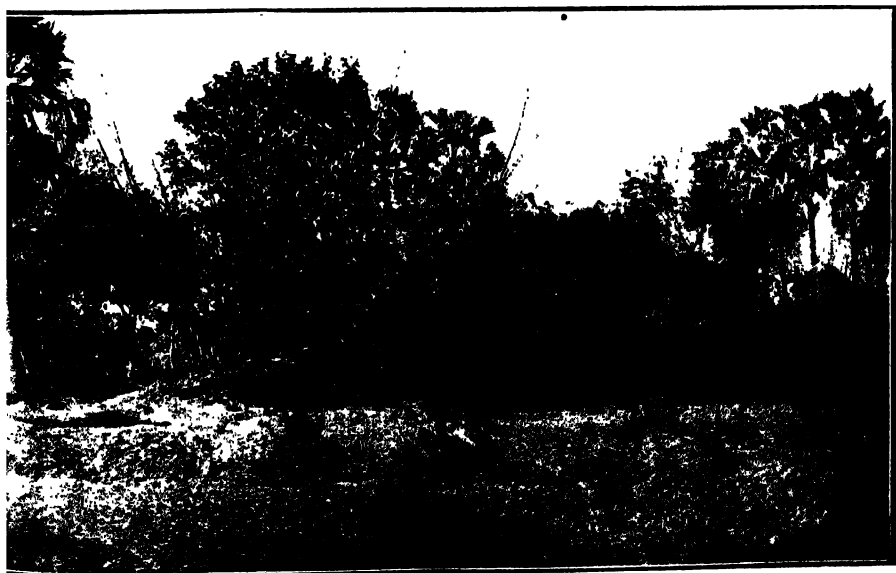
২ নং গুড়েপাশলার নিকটবর্ত্তী ঠাকরুণ-পাহাড়।

টাকা হিসাবে লাভ পাইত। বর্ষায় কোটশাল বন্ধ থাকার কথা বলিয়াছি, শালের খালে (৭।৮ হাত গভীর গর্ত) জল জমিত বলিয়াই বাধ্য হইয়া কাজ বন্ধ রাখিতে হইত। লোহা প্রস্তুত হইয়া শেষ হইয়া গেলে পোড়া পাথরের অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেওয়া হইত। তাহার গায়ে গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার টুকরা লাগিয়া থাকিত। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় মজুরদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দৈনিক প্রায় দুই আনা এবং স্ত্রীলোকেরা প্রায় চারি আনা পয়সা রোজগার করিত। এই সমস্ত টুকরা লোহা ডুকিশালের কামারেরা কিনিয়া লইত, পরে সেগুলিকে পাকা লোহায় পরিণত করিয়া তাহারাও ইহার দ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইত।

আয়াস গ্রাম

নারায়ণপুরের কিছুদূরে আয়স (চলিত কথায় আয়াস) নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে এক অনাদিলিঙ্গ শিব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন নাম যোগেশ। অনেকেই বলেন ইনিই নলহাটীর মহাপীঠের যোগেশ ভৈরব। আয়স শব্দের অর্থ 'লৌহসম্বন্ধীয়' বা 'লৌহ নির্ম্মিত'। আমাদের মনে হয় বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই যে এতদঞ্চলে লৌহ এবং লৌহময় বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইত, এই আয়স নামই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

বেলে নারায়ণপুর

নারায়ণপুর সাধারণতঃ 'বেলে'নারায়ণপুর' নামে পরিচিত। বেলে'নারায়ণপুর এখন দুইখানি পৃথক্ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। নারায়ণপুরের মধ্যে তেঁতুলবাঁধি এবং মৃত্যুঞ্জয়পুর নামে দুইটি বড় পাড়া আছে। ইহার মধ্যে আবার হালদারপাড়া, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, সংগোপপাড়া, কলুপাড়া, শুঁড়িপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রচলিত রহিয়াছে। গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক্, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সংগোপ, মোদক, নাপিত, তন্তুবায়, বৈরাগী, সুবর্ণবণিক্, যুগী, শুঁড়ি, কলু, জেলে, মাল, লেট, বাউড়ি, চামার, ডোম প্রভৃতি জাতি বেলে'-নারাণপুরে বাস করে। উভয় গ্রামে এগার শত ঘর লোকের বাস। লোক-সংখ্যা প্রায় ছয় হাজারের অধিক হইবে। নারায়ণপুরে একটি মধ্য ইংরাজী-বিদ্যালয়, একটি বালিকা-বিদ্যালয় ও একটি পোষ্ট আফিস আছে।

যে সময় নারায়ণপুরের খুব চল্‌তি অবস্থা লোহার কারবারের খুব ধুমধাম ছিল, সেই সময় রামশঙ্কর হালদার (গন্ধবণিক্), কৃষ্ণধন মালুই (কর্ম্মকার) ও গদাই বড়ালের (সুবর্ণবণিক্) মত সঙ্গতিপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক এ অঞ্চলে আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। শুনিতে পাওয়া যায় মালুইদের একান্নবর্ত্তী পরি-

বারে প্রায় আশীজন লোক ছিল। শালুইদের তখন অপ্রতিহত প্রতিপত্তি; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—ভয়ে 'বাঘে বলদে' একঘাটে জল খাইত। অনেকেই বলেন এই প্রভাবের পরিণাম বড় বিষময় হইয়াছিল। অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া শালুই-পরিবার গুরু লঘু, বিচার করিত না, ফলে সেই বিপুল ধন-জন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, বংশে বাতি দিতেও কেহ অবশিষ্ট নাই। শালুইদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া আজ জনসমূহের ভীতিউৎপাদন করিতেছে। এই বংশের ধ্বংস-কাহিনীও বড় অদ্ভুত! শুনিয়াছি ইহাদের বাড়ীতে কোথা হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প আসিয়া বাসা লইয়াছিল। সর্প-ভীতির জন্য একটি কুঠরীতে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। হঠাৎ এক এক সময় এই সর্পটি বাহির হইয়া পড়িত, যে দিন শালুই-পরিবারের যে কেহ তাহাকে সাম্না-সাম্নি দেখিত,—দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকিত এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এইরূপে ঐ একই ব্যাধিতে শালুই-পরিবার নির্ব্বংশ হইয়াছে। বড়াল এবং হালদার-পরিবার এখনো বর্ত্তমান আছেন। হালদার পরিবারের মধ্যে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন হালদার একজন সাহিত্যানুরাগী ও শিক্ষিত পুরুষ। ইনি কতকদিন 'ভন্ ম্যাগাজিনের' সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শালুইদের প্রতাপ

রামপুরহাট-মহকুমার অন্তর্গত (সুপ্রসিদ্ধ তারাপীঠের কিয়দ্দূর উত্তরে) উদয়পুর নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে "ভবানী-মঙ্গল" রচয়িতা বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ কবি স্বর্গীয় গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। কবি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। মেটেরীর নিকটবর্ত্তী নলহাটী-জগদানন্দপুরে ইহাঁর ইষ্টদেবের বাড়ী ছিল। কবির প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবী আজিও উদয়পুরে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রবাদ, এই কালী-বেদী পঞ্চমুণ্ডীর আসনে নির্ম্মিত, এবং কবি এই স্থানে শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়—সাধারণ লোকতো দূরের কথা অনেক সাধু সন্ন্যাসীও এই মন্দিরে রাত্রি-বাস করিতে ভীত হন। কালী-মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইল। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমান মন্দির অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কালিকা-দেবী উদয়পুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেবতা।

উদয়পুর কবি গঙ্গানারায়ণ

কবির পূর্ব্বপুরুষগণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী মেটেরী গ্রামে বাস করিতেন। এই বংশের আদিপুরুষ গৌড়েশ্বর আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হইয়া কান্যকুব্জের ঔড়ুম্বর হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুরী নামক স্থানে বাস

করেন। স্বনাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মুরারি ওঝা এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "মুরারি ওঝার নাতি" "বিচক্ষণ কবিত্ব"-সম্পন্ন "পণ্ডিত কৃত্তিবাস" বাঙ্গলার আবাল বৃদ্ধ নরনারীর সুপরিচিত। মুরারির বহু পুত্রের মধ্যে মদন ও অনিরুদ্ধ অন্যতম। মদন হইতে অধস্তন দশম-পুরুষে ভাষা-শিল্পের "নিপুণ ঐন্দ্রজালিক, কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধের অধস্তন দশম-পুরুষে কবি গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়। (১৫)

কবি গঙ্গানারায়ণের পূর্ব্ব পরিচয়

গঙ্গানারায়ণের পিতা তিতুরাম মুখোপাধ্যায় কৌলীন্যের তাড়নায় বিবাহ-ব্যপদেশে বীরভূমে আসিয়া শ্বশুরালয়ে হাতিকান্দা গ্রামে বাস করেন। হাতিকান্দায় তাঁহার বাস্তভিটা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিতুরামের দুইপুত্র গঙ্গানারায়ণ ও রামদুলাল। বিবাহ করিয়া গঙ্গানারায়ণ উদয়পুরে গমন করায়, রামদুলাল রামপুরহাটের অদূরবর্ত্তী আখিরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। আখিরায় রামদুলালের বংশধর শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় রামপুরহাটে ওকালতি করিতেছেন। গঙ্গানারায়ণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণনাথ উদয়পুরের বাস পরিত্যাগ করিয়া নিকট দেখুরে' গ্রামে গিয়া বাস করেন। কৃষ্ণনাথের দুই পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান আছেন।

ভবানী-মঙ্গলের ভনিতায় কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ কুলের মণি সকল সভাতে জিনি
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র রায়।
তাঁর সভাসদ কবি চণ্ডীর চরণ ভাবি
দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ গায়।

(১৫) সন ১৩০৩ সালের 'পরিষৎ-পত্রিকায়' স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'পাকুড় রাজ-পৃথ্বীচন্দ্র বিরচিত গৌরীমঙ্গল' কাব্যের পরিচয় দান-প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম কবি গঙ্গানারায়ণ ও তাঁহার ভবানী-মঙ্গল কাব্যের অস্তিত্ব সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সন ১৩১৭ সালে বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের যত্নে স্বর্ণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible]পতি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। ঐ সালের প্রবাসী পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় বীরভূমের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র "গঙ্গানারায়ণ বিরচিত ভবানী-মঙ্গল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কবি ও কাব্যের পরিচয় প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে নামমাত্র ভিন্ন কবি ও কাব্যের অপর পরিচয় কেহ জ্ঞাত ছিলেন না। আমরা প্রবাসী প্রবন্ধ হইতে সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য শিবরতন বাবু ও প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় কবি আনন্দচন্দ্র রায়ের সন্তান ছিলেন। আনন্দচন্দ্র রায় রাজা বসন্তের বংশধর। কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

মহারাজ বসন্তের সন্তান সকলে।
কৃপা করি রাখ মাতা কল্যাণ কুশলে ॥

রাজা বসন্তের পরিচয়

প্রবাদ প্রচলিত আছে,—দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন এতদ্দেশে আগমন করিয়া মল্লারপুরের নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। শিবির হইতে এক দিন তাঁহার অতি আদরের একটি বাজ-পক্ষী উড়িয়া যায়। আমীর ওমরাহগণ বহু চেষ্টাতেও তাহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। সম্রাট্ ঘোষণা করেন, বাজ ধরিয়া দিতে পারিলে তাহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করা হইবে। এতদঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই তখন বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বনে এক রাখাল গরু চরাইতে ছিল, বাজ-পক্ষীটি তাহার হাতের উপরে গিয়া বসিল। রাখাল পক্ষীটিকে লইয়া বাড়ীতে আসিলে তাহার মাতুল সেটিকে হস্তগত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন সম্রাটের ঘোষণার কথা বলিয়া পক্ষীসহ ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইল। সম্রাট্ বাজ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং রাখালকে বলিলেন যে আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত অশ্বারোহণে তুমি চারিদিক্ বেড়িয়া যতদূর ঘুরিয়া আসিতে পারিবে সমস্ত ভূভাগেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। বলা বাহুল্য এই রাখালই বসন্ত, অবস্থাহীনতার জন্য তাঁহার মাতা এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পাচিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুত্রকে উক্ত ব্রাহ্মণের গোপালরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্নাভাবে ব্রাহ্মণ-সন্তান গোচারণ করিতেন। বসন্ত এক সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলেন। যাহা হউক বসন্তের রাজ্য-প্রাপ্তির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার পূর্ব্ব উপাধি ছিল মুখোপাধ্যায়, রাজা হইয়া রায় উপাধি গ্রহণ করেন। লোকে ইহাকে রাজা বসন্ত বলিত। শুনিয়াছি আলাউদ্দীন আহার করিতে করিতে বসন্তরায়ের সনন্দে আপনার উচ্ছিষ্ট হস্তের পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া সহি মোহরের কার্য্য শেষ করিয়া দিয়াছিলেন। বসন্তের জমিদারী নিষ্কর বলিয়া নানকর মহাল নামে অভিহিত। বসন্তের বাড়ী ছিল মৌড়েশ্বর থানার অধীন কাঁটা গ্রামে। তথায় এখনো ইষ্টকময় বাসভূমির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

বসন্তকুমারের পরে রাজা জয়চন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি কাঁটা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মল্লারপুরের নিকটবর্ত্তী ডাবরায় আসিয়া বাস করেন। ডামশ রায় জয়সাগর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। রাজা

জয়চন্দ্রের তিন পুত্র,—রাজচন্দ্র, রামচন্দ্র ও মহাদেব। রাজনগরের রাজভ্রাতা ও সেনাপতি আলিনকী খাঁ ডামরা আক্রমণ করিয়া রাজচন্দ্রকে নিহত করেন। প্রবাদ আলিনকী এই তিন ভ্রাতর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নাকি দুইবার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পরে রামচন্দ্র ও মহাদেব তীর্থপর্য্যটনে গমন করিলে সেই সময় তিনি ডামরা আক্রমণ করেন এবং সেই যুদ্ধেই রাজচন্দ্র নিহত হন। ডামরা লুণ্ঠিত হয়, রাজপুত্র ও ভৃত্যগণ মলুটীতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। মলুটী তখন জঙ্গলময় ছিল। রামচন্দ্র ও মহাদেব তীর্থপর্য্যটনান্তে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, কিন্তু তখন আর প্রতিকারের কোনো উপায় ছিল না। যাহা হউক তাঁহারা মলুটীতে বাসোপযোগী অট্টালিকাদি প্রস্তুত করাইয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শুনিয়াছি ইহারা অনেকগুলি সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজচন্দ্রের তিন পুত্র রাখড়চন্দ্র, পৃথ্বীচন্দ্র ও স্বরূপচন্দ্র। রাখড়চন্দ্রের দুই পুত্র—আনন্দচন্দ্র ও প্রাণনাথ। কবি এই আনন্দচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। বসন্ত হইতে জয়চন্দ্র কত পুরুষ অধঃস্তন জানিবার উপায় নাই। একটা প্রথা দেখিতেছি এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজোপাধি গ্রহণ করিতেন। জয়চন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশের অধিকারী হইয়াছিলেন রাজা রাজচন্দ্র। রাখড়চন্দ্র এই অর্দ্ধেকের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন। এই হিসাবে আনন্দচন্দ্রও পৈত্রিক-সম্পত্তির অর্দ্ধভাগের অধিকারী হইয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মেহেরচন্দ্র পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠানুক্রমে রাজোপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তাহার পর আর রাজা নাম আর শুনিতে পাওয়া যায় না। মেহেরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মুক্তিচন্দ্র ও পশুপতি এই দুইটি পুত্র এখন বর্ত্তমান আছেন।(১৬)

মলুটীর রাজবংশ

(১৬) মলুটীর ভূতপূর্ব্ব ধরণী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এই রাজ-বংশের দৌহিত্র। তিনিই এই প্রবাদ-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, "১২৯৩ খৃঃ রাজা বসন্ত রায় জমিদারী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।" দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন সম্রাট্ জালালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি পিতৃব্য হত্যা করিয়া রাজ্যেশ্বর হন। ইতিহাসে আমরা তাহার গৌড়াভিযানের কোনো বিবরণ পাই না। তবে ইলিয়ট সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে তিনি দক্ষিণাপথে অভিযান করিবার পূর্ব্বে লক্ষণাবতী আক্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের রাজত্ব-কাল ১২৯৫ হইতে ১৩১৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং অনুমান হয় তিনি অভিপ্রায় মত লক্ষণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়েই বসন্তকে জমিদারী দান করিয়া গিয়া-ছিলেন। এই ঘটনা তাঁহার সম্রাট্ হওয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বেই হওয়া অসম্ভব নহে।

কবি গঙ্গানারায়ণ

এই প্রবাদের আলোচনা করিয়া মনে হয় কবি গঙ্গানারায়ণ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এদিকে বংশাবলী হিসাবে খুঁজিয়া দেখিলে তাঁহাকে কবিবর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিতে হয়। আমরা আলিনকী খাঁর সঙ্গে কবি গঙ্গানারায়ণের দাবা-খেলার প্রবাদও শুনিয়াছি। প্রবাদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আনন্দচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ প্রায় সমবয়সী ছিলেন। দাবাখেলায় গঙ্গানারায়ণের অত্যন্ত প্রসিদ্ধি ছিল। সমকালবর্ত্তী নানাদেশাগত বহু খ্যাতনামা গায়েবী খেলোয়াড় তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এইজন্য আনন্দচন্দ্রের পিতা দাবাখেলায় নিরতিশয় অনুরাগপরায়ণ রাখড়চন্দ্র গঙ্গানারায়ণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাজনগর-রাজের ভ্রাতা ও সেনাপতি আলিনকী খাঁ কোনো সময়ে ভামরা আক্রমণ করেন, ফলে রাখড়চন্দ্র পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এক ফকিরের মধ্যস্থতায় সন্ধি-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আলিনকীরও দাবাখেলায় বিশেষ নেশা ছিল, সুতরাং সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেলে, গঙ্গানারায়ণের খেলার খ্যাতি শুনিয়া সাগ্রহে রাখড়চন্দ্রকে তিনি শিবিরে আহ্বান করেন। রাখড়চন্দ্র, আনন্দচন্দ্র, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি আগমন করিলে পরস্পর স্বাগত সম্ভাষণের পর খেলা আরম্ভ হইবে, এক পক্ষে রাখড়চন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ, অপর পক্ষে স্বয়ং আলিনকী ও তাঁহার পারিষদবর্গ। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষই খেলায় মাতিয়া উঠিলেন, ক্রমে আলিনকীর পক্ষে হারিবার লক্ষণ দেখা দিল। দাবাখেলায় হারিতে সুরু হইলে উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক, আলিনকীও সে স্বভাব অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি যখন ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সময়ে গঙ্গানারায়ণ হঠাৎ "মাৎ" বলিয়া চীৎকার হইয়া উঠিলেন, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রোধোন্মত্ত পাঠানের কোষনিষ্কোশিত তরবারি রাখড়চন্দ্রের স্কন্ধে পতিত হইল। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, আনন্দচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন।

মাৎ শব্দটি পার্শি শব্দ, সতরঞ্চ-খেলায় রাজাকে বন্দী করার নাম মাৎ। আলিনকী রাজবংশীয়, রাজভ্রাতা, তাই নাকি মাৎ শব্দ শুনিয়া ক্রোধে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, তিনি নিবিষ্টচিত্তে চাল ভাবিতেছিলেন, সুতরাং কে মাৎ শব্দ উচ্চারণ করিল ইহা তাঁহার জানিবার সুযোগ হয় নাই। রাখড়চন্দ্রই খেলিতেছিলেন অতএব রাখড়চন্দ্রই মাৎ বলিয়াছিলেন, এই ভাবিয়া সে সময়

আমিরবারও বোধ হয় অবস্থা ছিল না—তিনি রাখড়চন্দ্রকেই হত্যা করেন। তরুণ যুবক গঙ্গানারায়ণ অত কায়দা কানুনের ধার ধারিতেন না, খেলায় উন্মত্ত হইয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি মাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে যাহা হইবার তাহা হইল, এবং এইরূপ ঘটনায় হিন্দুর পক্ষে যাহা স্বতঃসিদ্ধ—নিরপবাধ বাজরক্ত-প্লাবিতা তামবার ধরণী হঠাৎ সাত্ত্বিকতায় বোমাঞ্চিতা হইয়া কতকগুলি তুলসী বৃক্ষ প্রসবপূর্ব্বক এই কাণ্ডের যবনিকাপাত কবিয়া দিলেন; কিন্তু যে মহানুভব ফকীর সন্ধিকার্য্যে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন, বাখড়চন্দ্রকে আলিনকীর শিবিরে আহ্বান কবিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি আলিনকীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, আর যে হস্তে সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ কবিয়াছিলেন—এই কদর্য্য দারুণ ঘৃণার পরিচয় স্বরূপ আপনার সেই দক্ষিণ হস্তটিকে আমবণ নিষ্ক্রীয় করিয়া রাখিলেন। শুনিয়াছি হিন্দুর সেই তুলসী-বৃক্ষ এখনো বর্ত্তমান আছে, আব সেই মুসলমানেব বংশধরগণ আজিও বাম হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া আপনাদের ন্যায়পরায়ণ পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য স্মৃতির সম্মান বাখিয়াছে। এই দুইটি প্রবাদেব সামঞ্জস্য কোথায়? হইতে পাবে প্রবাদে রাজচন্দ্রকে রাখড়চন্দ্র কবিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বাজচন্দ্রেব পৌত্র আনন্দচন্দ্রেব সমসাময়িক—গঙ্গানারায়ণ, আলিনকীব সঙ্গে দাবা খেলিয়াছিলেন ইহা সম্ভবপর বলিযা মনে হয় না। তবে আপবা রাজের সভায় থাকিয়াও কবিকঙ্কণ মুকুন্দবাম তাঁহাব চণ্ডীগ্রন্থে যেমন রাজপুত্র রঘুনাথেরই নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কবি গঙ্গানাবায়ণও বোধ হয় সেইরূপ ভাবেই স্বীয় কাব্যে আনন্দচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়া থাকিবেন এইরূপ ধরিয়া লইলে এই সমস্যার একরূপ সমাধান হইতে পারে। কবি তাঁহার কাব্যে আনন্দচন্দ্রকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সে সময় এই বংশের যে রাজোপাধি ছিল ইহা নিশ্চিত। সুতরাং আমাদের অনুমান হয় রাখড়চন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই—আনন্দচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই গঙ্গানারায়ণের ভবানী-মঙ্গল সম্পূর্ণ হইয়াছিল। যাহা হউক গঙ্গানারায়ণকে আমরা ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে করি।

মুসলমান ফকীর বংশের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

গঙ্গানারায়ণের নিজ-প্রদত্ত বংশ-পরিচয়—

"ফুলিয়া কুলের মণি সুবেণ পণ্ডিত গণি
ক্রমে কহি সন্ততির নাম।
শিবাচার্য্য গোপেশ্বর, বিশ্বেশ্বর তার পর
জনার্দ্দন সুত রামবাম॥

নিবাস ম্যাটারী গ্রাম পিতামহ রামরাম
তিতুরাম তাঁহার নন্দন।
তার সুত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ
উমাগীত করিল রচন" ॥

ভবানী মঙ্গলের প্রতিপাদ্য বিষয়

কবি গ্রন্থারম্ভে গণেশ, দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, গঙ্গা, শ্যামা, চৈতন্য এবং প্রত্যেক দেবতার বন্দনা করিয়াছেন। অতঃপর 'গায়েন' 'বায়েন' ও 'নৃত্যক' প্রভৃতি সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া পুরাণ-সম্মত ভবানী-চরিত্র, অষ্ট দিবসব্যাপী গীতিচ্ছলে ভাবা কথায় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গৌরীর জন্ম হইতে ভবানী-মঙ্গল কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। কবির বর্ণনীয় বিষয় "গৌরীর বাল্য-লীলা, তপস্যা, গৌরী অদর্শনে গিরি রাণীর খেদ, ও গৌরী-সাক্ষাৎকার, শিব-বিবাহ, শিবের শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি এবং তজ্জন্য সখীগণের নিন্দা, গৌরীর অনুরোধে শিবের হিমাচল-ত্যাগ, বারাণসী-নির্ম্মাণ ও কাশীবাস, তথা হইতে হর-পার্ব্বতীর কৈলাস-গমন, আশ্বিনে গৌরী আনয়ন জন্য গিরিরাণী কর্ত্তৃক হিমাচলকে অনুরোধ, গিরিরাজ কর্ত্তৃক দেবগণের স্নেহশূন্যতার উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ-লীলা-বর্ণন, শ্রীদামের অভিশাপ, তুলসীর উৎপত্তি, মাথুর, কংশবধ, নন্দবিদায়, ও নন্দরাণীর খেদ, গৌরী আনায়ন জন্য গিরিরাজের কৈলাস-যাত্রাপথে কাশীগমন, কাশী-মাহাত্ম্য, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, গৃধিনী-সংবাদ, বিষ্ণু-দূত ও যম-দূত-সংবাদ, নারদ-সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সহিত গিরিরাজের কৈলাস-যাত্রা, গিরি-গৌরী-সংবাদ, শিবানুমতি, গিরিগৃহে গৌরীর আগমন ও দুর্গোৎসব।" কাব্য-শেষে কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

"গঙ্গানারায়ণ করে নিবেদন
চণ্ডীর চরণতলে।
সময় নিদানে তব গান শুনে
যেন মরি গঙ্গাজলে" ॥

কবির ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, উপাখ্যান-ভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মনোরম, রচনা ভাবময়ী ও ঘাতপ্রতিঘাতে লীলায়িত। পরিচয় দিবার স্থান নাই, নতুবা দেখা-ইতাম তথাকথিত অশ্লীলতার যুগে রচিত গঙ্গানারায়ণের এই সুবৃহৎ কাব্যখানি কিরূপ সুরুচি-সঙ্গত কবিতাবলীর একত্র সমবায়ে সমুজ্জ্বল, রচনা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে গোপী বিলাপের একাংশ উদ্ধৃত হইল।

"চাঁদে দেখি মনে হবে শ্রীমুখ মণ্ডল।
নয়ান পড়িবে মনে দেখিয়া কমল॥
অধর পড়িবে মনে দেখিয়া অরুণে।
এই সবে দৃষ্টিশূন্য কৈল গোপীগণে॥
আপন আপন আঁখি কাল হৈল সবে।
কহ কহ প্রাণসখী কি উপায় হবে॥
কেহ কহে নয়ন মুদিয়া যদি থাকি।
অন্তরে শ্যামের রূপ নিরন্তর দেখি॥
যোগযুক্ত হুই কর শুন মোর বাণী।
সদা চিত্তে চিন্তা কর কৃষ্ণ গুণমণি॥
করে জপ কৃষ্ণগুণ মুখে জপ হরি।
হৃদে সদা কৃষ্ণগুণ দেখ ধ্যান করি॥
এই যুক্তি সার আমি কহিল সভারে।
এখন না পাই কৃষ্ণ পাব জন্মান্তরে। (১৭)

---

(১৭) কবি বিরচিত জ্যোতিষের সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদ একসময় স্থানীয় গুরুমহাশয়গণ আপন আপন ছাত্রগণকে কণ্ঠস্থ করাইতেন। এই শ্রেণীর জ্যোতিষের একটি কবিতা—

"কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণি।
অষ্টমে মঙ্গল যার রন্ধ্রগত শনি"॥

তারাপুর-কাহিনী

উত্তর-বাহিনী দ্বারিকা-নদীর পূর্ব্বতীরে প্রাচীন পীঠতীর্থ তারাপুর—শক্তি সাধনার পুণ্য-ক্ষেত্র। মাতৃমন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক কত শত শক্তিধর, যে এই পুণ্য ভূমিতে সাধনা করিয়া পূর্ণকাম হইয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। রাম-পুরহাট থানার অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ষ্টেসন মল্লারপুর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে চণ্ডীপুর নামে একখানি গ্রাম এই পীঠতীর্থকে বক্ষে ধরিয়া বিদ্যমান। তারাপুর নামে একখানি পৃথক্ গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। "তারা-রহস্যে" এই পীঠের স্থান-নির্ণয়-প্রসঙ্গে—

"বক্রেশ্বরস্য ঐশান্যাং বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ।
তারাপুরমিতি খ্যাতং নগরী ভুবি দুর্লভং"।

তন্ত্রের তারাপীঠ

এই শ্লোকটি উল্লিখিত আছে। দ্বারিকার পূর্ব্বতটে, স্বচ্ছন্দবনজাত তীরতরু-নিকরে পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র অটবী পরিদৃষ্ট হয়। তথায় এক সুবৃহৎ শাল্মলী-তরু বিদ্যমান ছিল। তন্ত্রের উক্তি—

"দ্বারিকায়াং পূর্ব্বতীরে শাল্মলী বৃক্ষ যদ্ভবেৎ
তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র তারা শিলাময়ী"।

(শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ধৃত পীঠমালা।)

এই তারাপুরে মহামুনি বশিষ্ঠদেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। "বশিষ্ঠারাধিতা তারা" শ্লোকাংশ অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বলেন "তারাপীঠে ভবদারা বশিষ্ঠারাধিতা তারা"। প্রবাদ, অধুনা লুপ্ত ঐ শাল্মলী-বৃক্ষমূলে বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে তারা-দেবীর মন্দির এবং তাঁহার শিলাময়ী-মূর্ত্তিও ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে কোন্ স্মরণাতীত কালের কাহিনী।

তার পর কত ঝঞ্ঝা কত প্লাবন, কত বিপ্লব কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মন্দির, মূর্ত্তি, কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কালের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া যুগ সাক্ষ্য স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল শুধু ঐই আকাশস্পর্শী বিশাল শাল্মলী তরু। কত-কাল পরে এক বণিক্ আসিয়া দেবী-মূর্ত্তিকে পুনঃ প্রকাশিত করেন। "শিমুল-

তলায়" কিয়দ্দূর দক্ষিণে মন্দির মধ্যে এখন দেবীর সেই শিলাময়ী মূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন।

নিম্নে তারাপুর সম্বন্ধীয় বশিষ্ঠ ও বণিক্ প্রভৃতির প্রবাদ-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

তারাপুর ও বশিষ্ঠ সম্বন্ধে প্রবাদ

মানব-সৃষ্টির সংকল্প করিয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে যে কয়জন মানস-পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বশিষ্ঠ অন্যতম। তিনি পিতৃ আজ্ঞায় দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে অসম্মত হইলে, চতুর্ম্মুখ তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, যে তুমি দাসী-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অভিশপ্ত বশিষ্ঠ তপঃ সাধনার জন্য কামাখ্যা-তীর্থে গমন করেন। বহুদিন তপস্যা করিয়া বিফল-মনোরথ ঋষি কামাখ্যা-তীর্থকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, "এই তীর্থে কোনো সাধক মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না"। শাপ শুনিয়া কামাখ্যাদেবী বালিকার বেশে আসিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন এবং শাপোদ্ধার করাইয়া দেন। বশিষ্ঠ পুনরায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। অভীষ্ট লাভের বিলম্বে অধীর হৃদয়,—মনঃ-সংযোগে বাধা প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দন, আবার যে দিন তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করিলেন,—সেদিন তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, যে "যাহার জন্য অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছি সেই সৃষ্টিধারা সম্প্রতি কেমন ভাবে কোন পথে প্রবাহিত হইতেছে, একবার দেখিয়া আসিতে হইবে"। বশিষ্ঠদেব দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, কত পুর, কত নগর, পল্লী-জনপদ, কত গিরি-নদী-কানন-কান্তার, পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিনি উপনীত হইলেন চীন-দেশে। মহাচীন, প্রকাণ্ড দেশ, তাহার একাংশে গিয়া তিনি দেখিলেন চীনবাসী মদ্য-মাংসাদি পঞ্চ 'ম' কারে তারা দেবীর অর্চ্চনা করিতেছেন। দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, কি ঘৃণা! মদ্য-মাংস দিয়া কখন দেবতার পূজা হয়! ইহারা ঘোরতর অনাচারী! তিনি তারা-মন্ত্রে অভিশাপ প্রদান। করিলেন (পরজন্মে বশিষ্ঠের তারা আরাধনার সময় পুত্রের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া ব্রহ্মা এই শাপ মোচন করিয়া দেন) চীনেরা তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা বশিষ্ঠের পূর্ব্ব কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি কি তপস্যার উপযুক্ত? আদৌ আপনি যে কিঞ্চিন্মাত্রও মানসিক বলসম্পন্ন, তাহাতে আমাদের মনে হয় না, পাছে প্রলোভনে পতিত হন এই জন্য আপনি ধর্ম্ম-পত্নী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, আর আমরা এই সমস্ত ভোগের মধ্যেও কিরূপ জীবন-যাপন করি, না জানিয়া

চীনাচার

শুনিয়া, শুধু বাহ্য আচার দেখিয়া আমাদের সম্বন্ধে একটা জাতির সম্বন্ধে একেবারে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে "ইহারা অনাচারী," যাহা হউক, আমরা এজন্য আপনাকে অভিশাপ দিতেছি যে আপনি পরজন্মে যখন দাসী-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, সে সময় এইরূপ আচারে এই দেবীর আরাধনা ভিন্ন সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। বশিষ্ঠদেব তো তাহাদের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন, অবশেষে ধীরে ধীরে চট্টলে চন্দ্রনাথ-তীর্থে আসিয়া প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিলেন।

কবিনন্দ বন

বীরভূমে দ্বারিকা নদীর তীরে কবিনন্দ নামে এক বন ছিল। লোকে বলে এখন যথায় কবিচন্দ্রপুর নামে গ্রাম, কবিনন্দ বন ছিল সেইখানে। সেই বনে কুবুদ্ধ নামে এক চিরকুমার-তপস্বী বাস করিতেন। দ্বারিকার অপর পারে এক রাজার রাজধানী ছিল। রাজধানীতে চন্দ্রচূড় নামে দেবাদিদেবের অনাদিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শঙ্করপ্রসাদে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া কুবুদ্ধের সমসাময়িক রাজারও নাম ছিল চন্দ্রচূড়। রাজার এক রাণী ছিলেন, নাম তারাবতী। একদিন তারাবতী রাণী তাঁহার হারাবতী দাসীকে লইয়া নদী-স্নানের পর কুবুদ্ধকে প্রণাম করিতে গেলেন। মনসিজের বিচিত্র লীলা! কুবুদ্ধ সেদিন সদ্যোস্নাতা রাণীকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার নিকট আপনার আসঙ্গলিপ্সা প্রকাশ করিয়া বসিলেন। রাণীর তখন হইল উভয় সঙ্কট। একদিকে সতীধর্ম্ম, অপরদিকে অভিশাপের ভয়। অভিশাপে হয় তো রাজ্যের এমন কি রাজারও কোনো অনিষ্ট ঘটিতে পারে, এই চিন্তায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উপস্থিত পরিত্রাণের আশায় নৈশ-সাক্ষাৎকারের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া গৃহে গমন করিলেন। বহু চিন্তা ও পরামর্শের পর দাসী হারাবতী রাণীর সঙ্কট মোচন করিল। রজনীতে রাণীর মত বসন-ভূষণে সজ্জিতা হইয়া সে কুবুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইল। কামান্ধ কুবুদ্ধ যুবতী হারাবতীকে, তারাবতী মনে করিয়া সানন্দে গ্রহণ করিলেন। যথাকালে হারাবতী একটি পুত্র প্রসব করিল। সেই পুত্রই অভিশপ্ত বশিষ্ঠদেব।

শূদ্র রূপে বশিষ্ঠের জন্ম

জাতিস্মর ঋষি বশিষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে প্রগাঢ় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। কিছুদিন পরে একদিন দৈববাণী হইল "তুমি চীনদেশে গমন কর।" বশিষ্ঠদেব তপস্যা ত্যাগ করিয়া চীনে গমন করিলেন। এবারও চৈনিক আচারে তাহার মনে ঘৃণার উদয় হইতেছিল, কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের অবস্থা ভাবিয়া তিনি সংযত হইলেন এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে 'চীনাচার' শিক্ষা করিতে লাগিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বীরভূমে ফিরিয়া আসিয়া উপরি কথিত

শাল্মলীতরু-মূলে তারা-দেবীর আরাধনা করিয়া বশিষ্ঠদেব সিদ্ধি লাভ করেন। অনেকেই বলেন, যে তিনি বীরভূমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কারণ, বীরভূমের জলই মন্ত্র তুল্য বলিয়া গণ্য হইত। এতই বীরভূমির শক্তি সাধনার খ্যাতি ছিল। সুতরাং এদেশে আসিয়া বশিষ্ঠদেবকে আর সত্যকার মন্ত্র স্পর্শ করিতে হয় নাই। সিদ্ধি-লাভের পর বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় গমন করেন এবং সূর্য্য-বংশীয় অযোধ্যাপতিগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন ইত্যাদি।

বণিকের সম্বন্ধে প্রবাদ।

দ্বারিকাবক্ষে সেকালে বাণিজ্য-তরণী যাতায়াত করিত। রত্নগড় বা রাতগড়ায় তখন অনেক ব্যবসায়ীর বাস ছিল। বাণিজ্যযাত্রার পূর্ব্বে বণিক্‌গণ শ্রীগঙ্গা-দেবীর পূজা করিয়া বহির্গত হইতেন। আজিও রাতগড়ায় সেই গঙ্গা-পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ বৎসরান্তে প্রতি পৌষ মাসে রত্নগড়ের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাপুরতলায় সমাগত হইয়া মহাসমারোহের সহিত এই উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। রত্নগড়ের জয়দত্ত নামে কোনো বণিক্ বাণিজ্য করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তারাপুরে নৌকা বাঁধিয়া স্নানাহারের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় আকস্মিক, কোনো কারণে তাহার একমাত্র পুত্র মৃত্যু মুখে পতিত হন। শোকে কাতর বণিক্ যখন নদী-নীরে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত, এমন সময় তাঁহার কোনো সহযাত্রী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেন, যে নিকটবর্ত্তী এক কুণ্ডের জল দিয়া ধীবরেরা তাহাদের মৃত মৎস্যগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতেছে। বলা বাহুল্য সে সাধু পুত্রও সেই কুণ্ডের বারিস্পর্শে পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। রজনীতে জয়দত্ত স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন যে "এই পুণ্য-ক্ষেত্রেই তন্ত্র-প্রসিদ্ধ তারাপীঠ, শাল্মলীমূলের অদূরেই ব্রহ্মময়ীর শিলামূর্ত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তোমাকে তাহা উদ্ধার করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, এবং তারাদেবী ও চন্দ্রচূড় মহাদেবের যথাবশ্যকীয় পূজার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে"। বণিক্ সে আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তখন হইতেই তারাদেবীর পূজার প্রচার। বণিক্ জয়দত্ত যে স্থানে তারাদেবীর শিলামূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, সেই 'কৈওরের নালা' এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জয়দত্ত বণিকের কাহিনী

জয়দত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদি দ্বারিকার জলপ্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে (বীরভূম) ঢেকার রাজা রামজীবন বহু অর্থব্যয়ে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং মহাসমারোহে নবনির্ম্মিত মন্দিরে শিলামূর্ত্তির গৃহ-প্রবেশ-উৎসব সম্পাদন করেন।

রাজা রামজীবনের মন্দির-নির্ম্মাণ

আজিও সে উৎসবের স্মৃতি-প্রবাদ পল্লীবৃদ্ধগণের নয়নে অশ্রু সঞ্চার করিয়া দেয়। এই কীর্ত্তিমান ব্রাহ্মণ ভূস্বামী প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার দ্বারা তারাপুরের বহু উন্নতি সাধিত হয়। পঞ্চ পর্ব্বে বলিদানপ্রথা রাজা রাম জীবনের প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

দ্বারিকার তীরে নিম্নভূমি ভরাট করিয়া রাজা রামজীবন যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, নদীর ধ্বংসে মাটি বসিয়া গিয়া অল্প দিনেই তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ভগ্ন-স্তূপের উপরে বঙ্গাব্দ ১২২৫ সালে দেবীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মল্লারপুর-নিবাসী স্বনামধন্য দানশীল স্বর্গীয় জগন্নাথ রায় মহাশয় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতিতে কুমার সদ্গোপ ছিলেন। চাউলের ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া এইরূপ বহু সৎকার্য্যে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

জগন্নাথ রায়

তারাপুর রাজা রামজীবনের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরভূমের তদানীন্তন অধীশ্বর দেওয়ান আসদ উজ্জমানের (ভ্রাতা ও) সেনাপতি আলিনকী খাঁ ঢেকা আক্রমণ করিয়া রামজীবনের ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক তাঁহার জমিদারী বীরভূমরাজের রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তারাপুরও সেই সঙ্গে উক্ত মুসলমান নরপতির অধিকারভুক্ত হয়। পরে নাটোরের মহারাণী ভবানী আপনার রাজ্যান্তর্বর্ত্তী দ্বারিকার পশ্চিম-তীরস্থিত আটলা ও মহলা গ্রামের বিনিময়ে তারাপুর গ্রহণ করেন। এই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী ও তাঁহার সাধক-সন্তান রাজ-বৈরাগী মহারাজ রামকৃষ্ণের ব্যবস্থিত বিধানানুযায়ী আজিও তারা-দেবীর পূজা-কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে।

রাজা রামকৃষ্ণ

তারাদেবীর নিকট বলি প্রদানে নিম্নলিখিত রূপ ক্রমপর্য্যায় রক্ষিত হইয়া থাকে। ১ম বলি রাজা রামজীবনের বংশধর এড়ালের রায় চৌধুরীগণের। ২য় বলি জেমোর এবং ৩য় বলি বাঘডাঙ্গার রাজবংশীয়গণের। এড়োল, জেমো ও বাঘডাঙ্গা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। ৪র্থ বলি (বীরভূমের অধীশ্বর) রাজনগররাজের প্রতিনিধি স্বরূপ সাংপুরের জমিদারগণের, ৫ম বলি রাণী ভবানীর প্রদত্ত। মলুটীর রাজবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ নাটোরের সহিত বিবাদ করিয়া দ্বারিকার অপর তটে নিজের অধিকৃত ভূমিতে তারা দেবীর পূজা করেন, সেই অবধি মলুটীর পূজা পূর্ব্বোক্ত স্থানেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।[১]

তারাদেবীর বলিক্রম

১ তারা-দেবীর মন্দিরে বর্ত্তমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা মোট ৭ জন—১ জন পূজক, ১ জন পরিচারক, ১ জন পাচক, ১ জন গোমস্তা, ১ জন পাটয়ারী ও ১ জন পরিচারিকা। এতদ্ভিন্ন যে পাণ্ডার

৬৮ পৃষ্ঠা

ভদ্রপুরের নিকটবর্ত্তী দেবগ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্ত্তি।

১২০ পৃষ্ঠা
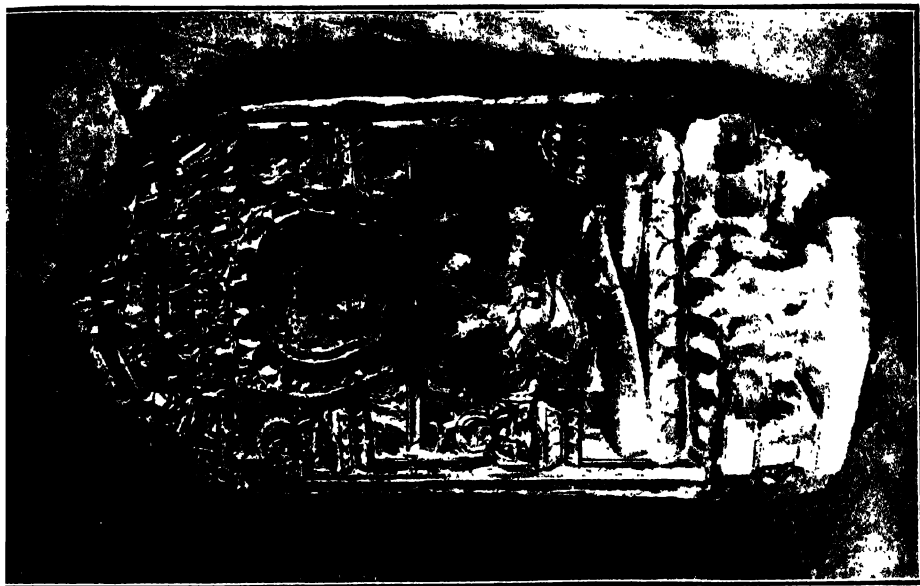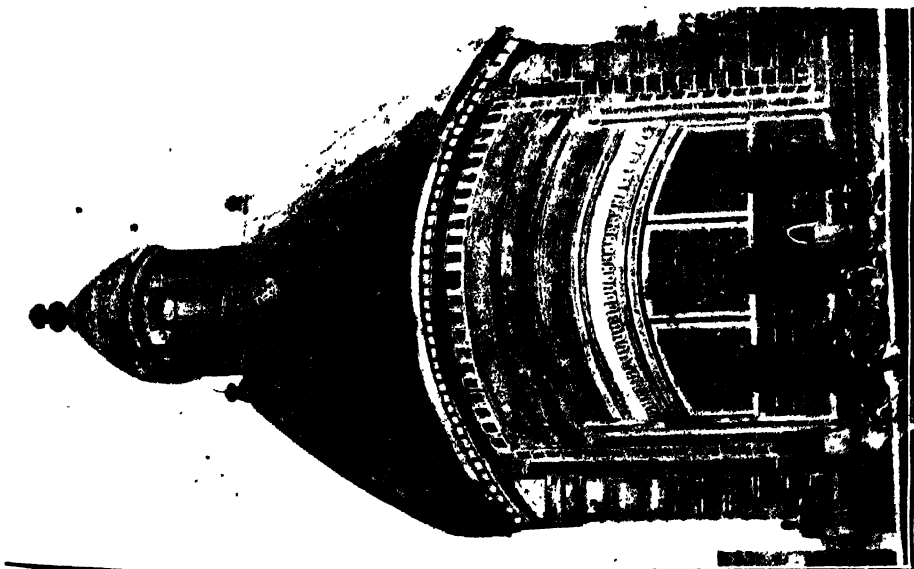
তারাপুরে তারাদেবীর মন্দির।

বশিষ্ঠ ও বণিক্‌-সম্বন্ধীয় প্রবাদ উল্লিখিত হইল। বণিক্ জয়দত্তের প্রবাদ-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু বশিষ্ঠের নামে তারাপুরে যে সমস্ত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মূল্যহীন। রঘুকুলগুরু ঋষি বশিষ্ঠ তারাপুরে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। হয়তো এ বশিষ্ঠ অন্য কোনো বশিষ্ঠ হইতে পারেন। যাহা হউক আমরা একে একে পুরাণ ও তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই সমস্ত প্রবাদ আদির বিচার-আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কালিকাপুরাণের কথা

কালিকাপুরাণ সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় হইতে একপঞ্চাশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঁচটি অধ্যায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে ঐ পুরাণোক্ত উপাখ্যান-মালাই রূপান্তরিত হইয়া তারাপুর ও বশিষ্ঠ-সম্বন্ধীয় প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কালিকাপুরাণের উপাখ্যান—"একদা হর-গৌরী নির্জ্জনে বিশ্রম্ভালাপে রত ছিলেন, দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন ভৃঙ্গী ও মহাকাল। কৌতুকাবসানে দেবী বিপর্য্যস্ত বেশ-বাস লইয়া বাহিরে আসিতেই দ্বাররক্ষকদ্বয় তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। ভৃঙ্গী ও মহাকাল জননীর বসন-ভূষণাদি অসংযত দেখিয়া বদন অবনত করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার

যে দিন পূজার পালা পড়ে সে সেইদিন দেবীকে স্নান করাইয়া দেয়, ফুল তুলিয়া আনে, নৈবেদ্য সাজাইয়া দেয় ইত্যাদি। পূজক, পাচক, রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তান। পাণ্ডাগণ কেবল ব্রাহ্মণ পূজা করিতে কি ভোগস্পর্শ করিতে পায় না। ইহাদের আদি পুরুষ ভৈরব ঠাকুর, জয়দত্ত সওদাগরের আনীত এবং প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডীপুরে এখন ১৫ ঘর পাণ্ডা আছে। বীরভূমে মল্লারপুর (রাণীশ্বর), ভাণ্ডীরবন, কলেশ্বর, হরুকা, ঘোষগ্রাম প্রভৃতি স্থানের পাণ্ডাগণের সহিত ইহাদের বৈবাহিক আদান-প্রদান কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। দেবীর নিকট প্রত্যহ ঢাক ও নহবৎ বাদ্য হয়। পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা—

প্রত্যহ নিত্য পূজায় একসের আতপের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। তৎসঙ্গে নৈবেদ্যের উপকরণ থাকে,—কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও ফল, কিছু ছোলা ভিজা এবং মিষ্ট পানীয় (সরবৎ)। নিত্য-ভোগের জন্য দশ সের আতপ ও তদনুরূপ ব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা আছে। পায়সান্ন মৎস্য এবং মদ্য নিত্য-ভোগের প্রধান উপকরণ। পঞ্চ পর্ব্বে অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে এবং উভয় পক্ষান্তে রাত্রিতে দশসের আতপান্নের ভোগ ও একটি ছাগবলি দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে শনি ও মঙ্গলবার দিনেও বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় এক সের ময়দার লুচির নৈবেদ্য নিবেদিত হয়। একদিনের (হিন্দুর) অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতি পর্ব্বাহেই পূজার কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে।

অসম্বদ্ধ অবস্থা দেখিয়াছেন বলিয়া দেবী ক্রোধিতা হইয়া তাহাদিগকে শাপ-প্রদান করিলেন যে "তোমরা মনুষ্য লোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। মাতৃ-অবেক্ষণ-দোষে তোমাদের মুখ বানরাকৃতি হউক।" শাপ শুনিয়া ভৃঙ্গী এবং মহাকালও দেবীকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে "আমরা আপনার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিব, আমাদের জন্য আপনাকেও গিয়া মানবীরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে, যে হেতু আপনিই আমাদিগকে দ্বাররক্ষা-কার্য্যে নিয়োগ করিয়া গিয়া, আমরা দ্বারে রহিয়াছি জানিয়াও এই অসংযত-বেশে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন; এবং আমরা সংযতাবস্থায় রহিয়াছি দেখিয়াও আমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন"। অনন্তর কিঞ্চিৎ কাল গত হইলে ভবিষ্যৎ কার্য্য জানিতে পারিয়া সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর স্বয়ং মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি দক্ষের পৌত্র ও পৌষ্য-নরপতির পুত্র হইয়া জনক-জননীর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের পর ব্রহ্মাবর্ত্ত মধ্যে দৃশদ্বতী-নদী-তীরে করবীরপুরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ললাটে সহজাত চন্দ্রলেখা থাকায় তাঁহার নাম হইয়াছিল চন্দ্রশেখর। এদিকে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী-নগরীতে রাজা ককুৎস্থের ঔরসে রাজ্ঞী মনোন্মাথিনীর গর্ভে দেবী গৌরী গিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। বক্ষে স্বভাবজ নক্ষত্রমালা চিহ্ন থাকায় (স্বাভাবিক হারচিহ্ন) তাঁহার নাম হয় তারাবতী। স্বয়ংবর সভায় অন্যান্য রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া তারাবতী রাজা চন্দ্রশেখরের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আনন্দিত হইয়া পত্নী তারাবতী সহ স্বরাজ্য করবীরপুরে উপস্থিত হইলেন। নরনাথ ককুৎস্থ বিবাহের যৌতুক স্বরূপ অষ্টাবিংশতিসহস্র দাসী এবং ষট্‌সহস্র সৌরভী গো-দান করিলেন। ককুস্থের তারাবতীতুল্যা রূপবতী চিত্রাঙ্গদা নাম্নী অপরা তনয়া দাসীগণের অধীশ্বর হইয়া জ্যেষ্ঠার অনুগমন করিল। চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইয়াছিল উর্ব্বশীর গর্ভে। অষ্টাবক্র মুনির শাপে ইহার এই দাসীত্ব সংঘটিত হয়। বিবাহের পর কিছুদিন বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন তারাবতী দৃশদ্বতী-নীরে স্নান করিতে গিয়াছেন। তীর-তপোবনবাসী ঋষি কপোত তাঁহাকে দেখিয়া স্মরশরে মোহিত হইলেন এবং তারাবতীর সকাশে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। অনেক কথার পর তারাবতী বলিলেন, মুনি! আপনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন আমি সখীদিগকে বলি। মুনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তারাবতী আসিয়া চিত্রাঙ্গদাকে সমস্ত কথা বলিলেন, চিত্রাঙ্গদা বলিল—তুমি তোমার এক মনোহারিণী দাসীকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনি সমীপে প্রেরণ কর, কামমোহিত মুনি কিছুই

ভৃঙ্গী, মহাকাল ও গৌরীর পরস্পর অভিশাপ

তারাবতীর কথা

বুঝিতে পারিবে না। প্রস্তাব শুনিয়া তারাবতী বলিলেন, আমার সমান রূপ আর কাহার? তবে তুমি যাও, আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। অনুরোধে পড়িয়া কুমারী চিত্রাঙ্গদাকে সম্মতি দিতে হইল। কপোতের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বলিতে ভুলিয়াছি এই ঋষি প্রাণিনাশভয়ে বহুদিন কপোতরূপ ধরিয়া উড়িয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম হয় কপোত। যাহা হউক চিত্রাঙ্গদা-তো কপোতের আশ্রমেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে কিছুদিন পরে আবার একদিন তারাবতী নদী স্নানে আসিয়াছেন, এদিনও কপোত তাঁহাকে দেখিলেন, দেখিয়া চিত্তবেগ দমন করিতে না পারিয়া চিত্রাঙ্গদাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রাঙ্গদা ভয়ে ভয়ে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলিলেন শুনিয়া ঋষি অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া উঠিলেন। দারুণ ক্রোধে তারাবতীকে শাপ দিলেন—"যেমন ছলনা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছিস্, তেমনি বীভৎস-বেশধারী বিরূপ ধনহীন নর-কপালশোভী পলিতকেশ কোনো ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবেন, অদ্য হইতে একবৎসরের মধ্যে তোর গর্ভে সদ্য দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা দেখিতে কুৎসিৎ হইবে, অপিচ তাহাদের মুখ হইবে বানরের মত"। শাপ শুনিয়া অবধি চন্দ্রশেখর মহিষীর সঙ্গছাড়া হইতেন না, দৈবাৎ একদিন তিনি নিকটে নাই, তারাবতী প্রাসাদশিখরে বসিয়া কখনো স্বামির চিন্তা কখন মহাদেবের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় হর-পার্ব্বতী আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। উভয়েরই তখন ভৃঙ্গী ও মহাকালের কথা মনে পড়িয়া গেল। গৌরী আসিয়া তারাবতীর দেহে প্রবিষ্ট হইলেন, মহাদেবও মুনিবাক্য সফল করিবার জন্য বীভৎস-বেশ ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন। সদ্যই দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল—দেখিতে কদাকার, মুখ বানরের মত। নারদ আসিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ ভৈরব, কনিষ্ঠ বেতাল। ইহারাই পূর্ব্বজন্মেও ভৃঙ্গী ও মহাকাল। সদ্য-প্রসূতা রাণী ও সদ্যোজাত পুত্র দুইটিকে দেখিয়া চন্দ্রশেখরের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে দৈবাদেশে, পরে নারদের বাক্যে সমস্ত রহস্য অবগত হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বসংশয় অপনোদিত হয়। কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে, চন্দ্রশেখরের উপরিচর, অলর্ক ও দমন নামে অপর তিনটি পুত্র ছিল। তিনি তাহাদিগকেই সমধিক স্নেহ করিতেন। এইজন্য ভৈরব ও বেতাল যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইত্যবসরে একদিন কপোত মুনির সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। মুনি তখন

ভৈরব ও বেতালের জন্ম

সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া চিত্রাঙ্গদা ও পুত্রদ্বয়ের ভার চন্দ্রশেখরের উপর অর্পণ করিয়া তপস্যার জন্য অন্য কোনো তপোবনে গমন করিতেছিলেন। তিনিই ভৈরব ও বেতালকে তাঁহাদের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জন্ম-রহস্য অবগত করাইয়া কামরূপ পর্ব্বতে গিয়া হর-গৌরী উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দান করেন। ভৈরব ও বেতাল উপাসনা-পদ্ধতি জানিতে চাহিলেন। কপোত বলেন যে তোমরা কামরূপের সন্ধ্যাচলে ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠের নিকট গমন কর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিই তোমাদিগকে সরহস্য মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিবেন। বেতাল ও ভৈরব কামরূপে উপস্থিত হন এবং বশিষ্ঠের উপদেশ অনুসারে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক শিবসাক্ষাৎকার লাভ করেন। সাধনার ফলস্বরূপ ভৈরব ও বেতাল গণাধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।"

কালিকা-পুরাণোল্লিখিত এই উপাখ্যান এবং তারাপুরপ্রচলিত প্রবাদ প্রায় একরূপ। তবে পুরাণের কপোত প্রবাদে বুদ্ধ হইয়াছেন, চিত্রাঙ্গদা হারাবতী হইয়াছেন। চন্দ্রশেখর চন্দ্রচূড়, দৃশদ্বতী, দ্বারিকা, করবীরপুর বোধ-হয় কবিনন্দবন ইত্যাদি দুইচারি-বিষয়ে রূপান্তর ঘটিয়াছে। বেতাল ও ভৈরবের জন্মকথা ও কপোতের শাপ, প্রভৃতি প্রবাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং চিত্রাঙ্গদার দুইটি পুত্র এক হইয়া গিয়া প্রবাদের বশিষ্ঠে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই প্রবাদ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অনুমান হয়, বশিষ্ঠদেবই তারাদেবীকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তারা-পূজাকে (কামরূপে) বামাচারপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, পুরাণে আরো দেখিতে পাইতেছি ভৈরব ও বেতাল বশিষ্ঠের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তন্ত্রে উল্লিখিত আছে তারা আরাধনার জন্য বশিষ্ঠ চীন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এখন তারাপুরে তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং এইখানেই বশিষ্ঠদেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং কালিকা-পুরাণের উপাখ্যান বশিষ্ঠকে জড়িত করিয়া লোকের মুখে মুখে বিকৃত হইয়া সে যে রূপান্তর ধারণ করিবে ইহা অসম্ভব নহে। পৌরাণিক বশিষ্ঠের সহিত প্রবাদের বশিষ্ঠে জীবন-কাহিনী আরো দুই একটি অসামঞ্জস্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

অধিকাংশ পুরাণের মতেই বশিষ্ঠ ব্রহ্মার অনুজ্ঞাত সৃষ্টি-কার্য্যের বিরোধী হন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধেও তারাপুরপ্রচলিত প্রবাদের কোনো মূল্য নাই। পুরাণে কথিত আছে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার ভিন্ন)—অপর সকলের মুখপাত্রস্বরূপে নারদই সৃষ্টিকার্য্যের

৮৫ নং অজয়তীরবর্ত্তী দণ্ডেশ্বরের ফুলঝোড়ের ফুলেশ্বরী-দেবী

সহায়তায় অস্বীকৃত হন এবং বিধিশাপে একবার উপবর্হণ গন্ধর্বরূপে, দ্বিতীয় বার দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি অপর সকলেই পিতৃনির্দেশানুসারে প্রজাবৃদ্ধির আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার রসনা হইতে বশিষ্ঠের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে—(ব্রহ্মখণ্ড দ্বাবিংশ অধ্যায়) "যে বালক বিধাতার বশীভূত শিষ্য ও পরমপ্রিয় তিনি বশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত"। স্বারোচিষ মনুর অধিকার সময়ে "দত্তোত্র সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, আয় ও স্মর এই সপ্ত বশিষ্ঠপুত্র সপ্ত প্রজাপতি বলিয়া বিখ্যাত হন"। (মৎস্য-পুরাণ ৯ম অধ্যায়) "বশিষ্ঠ নারদের ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন, (২) সেই বরারোহার গর্ভে তাঁহার শক্তি নামে পুত্র জন্মে"। (মৎস্যপুরাণ একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়)। মহাভারতে বশিষ্ঠের সাত পুত্রের কথা উল্লিখিত আছে। শক্তি-শাপে রাজা সৌদাস রাক্ষস হইয়া বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় বশিষ্ঠের (শক্তি সহ) শত পুত্রকে বিনষ্ট করেন। (আদিপর্ব্ব ১৭৫—১৭৭ অধ্যায়) মৎস্য-পুরাণে কথিত হইয়াছে—"ক্লান্তি বশতঃ বশিষ্ঠদেব নিমিরাজের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিতে অস্বীকৃত হইলে নিমিরাজ অন্য যাজককে পৌরোহিত্যে বরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় ক্রোধিত হইয়া বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন "যে তুমি বিদেহ হও"। নিমিরাজও বশিষ্ঠকে শাপ দেন "আপনিও বিদেহ হইবেন"। পরস্পরের শাপে উভয়েই বিদেহ হন। পরে ব্রহ্মার বরে নিমিরাজ জীবগণের নেত্রপক্ষে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বশিষ্ঠদেব মিত্রাবরুণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা লাভ

বশিষ্ঠের নাম ও বিদেহ হইবার কথা

(২) কালিকা পুরাণ মতে "ব্রহ্মার মানসকন্যা চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে তপস্যার্থ গমন করেন। পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে বশিষ্ঠের সাক্ষাৎ লাভে তাঁহার নিকট তারা-উপাসনা প্রাপ্ত হন। পরে তপস্যায় নারায়ণ আরাধনা করিয়া সিদ্ধি-লাভপূর্ব্বক নারায়ণবরে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞ-কুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। মেধাতিথি যজ্ঞকুণ্ড হইতে কামরূপে তাহাকে লাভ করিয়া তাঁহার নাম রাখেন অরুন্ধতী। তিনি কোনো কারণেই ধর্ম্মরোধ করেন না এই জন্য ত্রৈলোক্যবিধাতা সেই অরুন্ধতী নাম অর্থ পূর্ণ হইল। কৈশোরে ইনি সাবিত্রী, বহুলা, গায়ত্রী, সরস্বতী ও চারুপদা এই পঞ্চে সতীর, বিশেষ ভাবে সাবিত্রী ও বহুলার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। যৌবনে একদিন বশিষ্ঠকে দেখিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্টা হন। বলা বাহুল্য যজ্ঞ-কুণ্ডে তনুত্যাগের সময় (পূর্ব্বজন্মে) ইনি মনে মনে বশিষ্ঠকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সাবর্ণি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর সাক্ষাৎকারের কথা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মাকে সংবাদ দেন, ব্রহ্মা অপরাপর-দেবগণ সহ মানস-পর্ব্বতে আসিয়া বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অবশ্য মেধাতিথিই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। (কালিকা-পুরাণ ২২—২৩ অধ্যায়)

করেন। সেই সময় মিত্র ও বরুণ (ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ছিলেন। মৎস্য পুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায়) বদরিকাশ্রমে যজ্ঞ করিতেছিলেন। একদা বসন্তকালে আশ্রম যখন পুষ্পিত সৌন্দর্য্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, বন গন্ধভারে অলস মারুতমন্দগতিতে বহিয়া চলিয়াছে, এ হেন সময়ে বিশ্ববন্দিতা সুন্দরী উর্ব্বশী আপনার বরতনু সূক্ষ্ম রক্ত-বসনে আবৃত করিয়া লীলান্বিতগমনে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ইন্দুবদনা নীলাব্জ-নয়নাকে দেখিয়া ঋষি দুইজন ইন্দ্রিয়সংযমে অসমর্থ হইলেন। মৃগচর্ম্মাসনোপরি স্খলিত তাঁহাদের অপ্রমিততেজ একজল-পূর্ণ মনোহর কলসে স্থাপন করিলেন। সেই কলস হইতেই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। (মৎস্য-পুরাণ ২০১ অধ্যায়)। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কোনো কোনো পুরাণের মতে বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বেই যুবরাজ ইন্দ্রের শতবার্ষিকী যজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন বলিয়া নিমির যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহার যজ্ঞে ব্রতী হইবেন বলেন। নিমি সে সময় নীরব থাকায় বশিষ্ঠ মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ জানিয়া স্বর্গে চলিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন নিমি অন্য ঋত্বিক্ দ্বারা যজ্ঞ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এই জন্যই নিমিকে শাপ প্রদান করেন। পরে নিমিও তাঁহাকে অভিশাপ দেন ইত্যাদি। কালিকা পুরাণেও নিমি-শাপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। (৭৯ অধ্যায়) পূর্ব্বকালে ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ নিমিরাজার শাপে দেহহীন হন, রাজর্ষি নিমিও বশিষ্ঠ-শাপে দেহহীন হন। তখন বশিষ্ঠ ব্রহ্মার উপদেশে নির্জ্জন কামরূপপীঠে সন্ধ্যাচলে তপস্যা করেন। তাহাতে বিষ্ণু তাঁহার প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া বরদান করিলে মহর্ষি সেই বরপ্রভাবে সন্ধ্যাগিরিপ্রস্থে অমৃতানয়ন পূর্ব্বক মহাকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্নান ও তদীয় জলপান করিবা মাত্র পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ শরীর প্রাপ্ত হন।

আগমবাগীশ-সংগৃহীত তন্ত্রসারে দেখিতে পাই,—তারার্ণব তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

বশিষ্ঠশাপোদ্ধার

"বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্র ফলা যতঃ।
অগস্ত্যেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ॥
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ"।

শাপোদ্ধারমাহ—

"চন্দ্রবীজং ত্রপান্তস্থ বীজোপরি নিয়োজিতং।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং বধূরিব যশস্বিনী॥

ফলিনী সর্ব্ববিত্তানাং জয়িনী জয়কাঙ্ক্ষিণাং।
বিষক্ষয়করী বিত্তা অমৃতত্বপ্রদায়িনী॥
মন্ত্রস্ত জ্ঞানমাত্রেণ বিজয়ী ভুবি জায়তে"।

(তারাপ্রকরণম্)

অর্থাৎ "বশিষ্ঠ মুনি বহুকাল তারা-দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, এই নিমিত্তই মুনিবর কুপিত হইয়া দেবীকে সুদারুণ শাপ প্রদান করেন। তদবধি তারিণী-দেবী কোনো ব্যক্তিকে ফল প্রদান করিতে পারেন না। তৎপরে উক্ত মুনি শাপোদ্ধার করিয়াছিলেন,—সেই শাপোদ্ধার মন্ত্র কথিত হইতেছে। যথা—শ্রী এই বীজের সহিত সকার যোগ করিয়া হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্রে তারা-দেবীর আরাধনার ব্যবস্থা করিলেন তদবধি তারা-দেবী বধূর ন্যায় যশস্বিনী হইলেন। এই বিত্তা সর্ব্ববিত্তার ফল-প্রদায়িনী, জয়ার্থী ব্যক্তিদিগের জয়কারিণী, বিষপীড়িত সাধকের বিষক্ষয়কারী ও মৃত্যুবিনাশিনী। উক্ত মন্ত্রের জ্ঞানমাত্র সাধক পৃথিবীতে বিজয়ী হয়।"

(৺প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীকৃত অনুবাদ)।

কামরূপে বশিষ্ঠের অপমান ও ম্লেচ্ছ-প্রভাব

কালিকা-পুরাণে বর্ণিত আছে মহাপীঠ কামরূপের নদীতে স্নান বা নদী-জলপান এবং (তথাকার) দেবতা-পূজা করিয়া লোকে স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। কাহারো কাহারো নির্ব্বাণ মুক্তি-লাভ এমন কি শিবত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটিতে লাগিল। যমপুরিতে কেহ আর যায় না। ব্যাপার দেখিয়া যম-রাজ কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং বিধির নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বিধাতা যমকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গিয়া যমের দুঃখের কথা বলিলেন। বিষ্ণু, যম ও বিধাতাকে সঙ্গে লইয়া শিবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব তাঁহাদের নিকট সমস্ত শুনিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া কামরূপে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেবী উগ্রতারাকে এবং নিজগণদিগকে আদেশ দিলেন; যে সত্বর কামরূপপীঠ হইতে লোকসকল দূর করিয়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে (কামরূপ-পীঠকে গোপনীয় করিবার জন্য) আদেশানুসারে কাজ চলিতে লাগিল। চতুর্ব্বর্ণ এমন কি দ্বিজাতি পর্য্যন্ত উৎসারিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাচলে ছিলেন বশিষ্ঠ-মুনি; কাণ্ড দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া উঠিলেন। তারপর উগ্রতারা আসিয়া—তাড়াইবার জন্য যখন তাঁহাকেও ধরিলেন, তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া অভিসম্পাত দিয়া তিনি বলিলেন—"হে বাম! আমি মুনি, তথাপি তুমি যে আমাকে তাড়াইবার জন্য ধরিলে, এই কারণে তুমি মাতৃগণ সহ বামভাবে পূজ-

নীয়া হইবে। তোমার প্রমথগণ মদমত্তচিত্তে ম্লেচ্ছের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া, ইহারা এই কামরূপক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ হইয়া থাকিবে। আমি শমদমসম্পন্ন তপোধন মুনি; মহাদেবও যে ম্লেচ্ছবৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া আমাকে নিঃসারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইজন্য তিনিও ম্লেচ্ছপ্রিয় ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া এখানে অবস্থিতি করুন। এই কামরূপক্ষেত্র ম্লেচ্ছ-সংকুল হউক। স্বয়ং বিষ্ণু যতদিন এখানে না আইসেন, ততদিন ইহা এইরূপভাবে থাক। কামরূপের মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক তন্ত্র সকল বিরল প্রচার হউক। তবে যে পণ্ডিত বিরল প্রচার কামরূপ-তন্ত্র অবগত হইবে, সেই ব্যক্তিই যথাকালে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবে। বশিষ্ঠ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।"(৩) বশিষ্ঠ-শাপে কামরূপে প্রমথগণ ম্লেচ্ছ হইল, উগ্রতারা বামা হইলেন, মহাদেব ম্লেচ্ছরত হইলেন, কামরূপ-মাহাত্ম্য প্রতি-পাদক তন্ত্র বিরলপ্রচার হইল। কামরূপ বেদমন্ত্রহীন ও চতুর্ব্বর্ণশূন্য হইল।(৪) কালিকা-পুরাণে (৫) অন্যত্র বর্ণিত আছে—"সেই স্থানে—(সুরস-পর্ব্বতের নিকটে, এই পর্ব্বত কামরূপের অংশ) বশিষ্ঠ-মুনি নির্ম্মিত একটি বশিষ্ঠ-কুণ্ড আছে, যে স্থানে বশিষ্ঠ-ঋষি নরক কর্ত্তৃক কামরূপ গমনে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠঋষি নীল-পর্ব্বতে যাইতে না পারিয়া সেই নরককে শাপ দিয়াছিলেন। তিনি আপনার স্নানের নিমিত্ত সেই স্থানেই দেবগণের পূজ্য একটি কুণ্ড নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে যথেচ্ছাক্রমে স্নান করিলেও মনুষ্য স্বর্গে গমন করে।" কালিকাপুরাণ ৫১ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—"অনন্তর যোগিরূপধারী বেতাল ভৈরব * * * * * যে ভাগে সন্ধ্যাচল আছে সেই দক্ষিণদিকেই গমন করিলেন। সেইখানে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আনীতা কান্তানদী রহিয়াছে, সেই নদীর তীরে ছায়াপ্রধান বৃক্ষ-লতাদিতে পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ পর্ব্বত, ব্রহ্মার মানস-পুত্র এই পর্ব্বতে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা ইহার নাম সন্ধ্যাচল রাখিয়াছেন। এইখানে যাইয়া তাঁহারা তপঃপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় সূর্য্য সদৃশ শিব-পূজা-পরায়ণ ধ্যানাসক্তচিত্ত মূর্ত্তিমান্ অগ্নি-স্বরূপ বশিষ্ঠ-ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।"

সন্ধ্যাচল

(৩) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃতানুবাদ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)।

(৪) কালিকা-পুরাণ ৮১ অধ্যায়।

(৫) ঐ ৭৮ অধ্যায়।

তন্ত্রসারে বশিষ্ঠের তারা আরাধনা এবং তাহাতে লব্ধকাম হইতে না পারিয়া তারামন্ত্রে শাপ প্রদানের উল্লেখ পাওয়া গেল। কিন্তু এই বশিষ্ঠ ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ কিনা সুস্পষ্ট জানা গেল না। কালিকা-পুরাণের নিমিশাপে দেহহীন বশিষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি সন্ধ্যাচলে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। উগ্রতারা যাঁহাকে তাড়াইয়া দেন, এবং নরক যাঁহাকে কামরূপ-গমনে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাঁরা হয়তো একই বশিষ্ঠ হইতে পারেন। ৫১অধ্যায়ে বেতাল-ভৈরব যাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন সেই শিব-পূজা-পরায়ণ ধ্যানাসক্তচিত্ত বশিষ্ঠও ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কপোত-ঋষি বেতাল ভৈরবকে বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ-ঋষি সন্ধ্যা-পর্ব্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন, তোমরা তাঁহার নিকট গমন কর"। কিন্তু একবার বিষ্ণুর আরাধনা, একবার সন্ধ্যা বন্দনা, একবার উগ্রতারা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়া, একবার নরক কর্ত্তৃক অবরোধ, পুনরায় শিব-পূজা-পরায়ণতা ও ধ্যানাসক্তি প্রভৃতি জটিল পৌরাণিক-কাহিনীর রহস্যোদ্ভেদ করিতে আমরা অক্ষম। যাহা হউক তন্ত্রসার বা কালিকা-পুরাণাদিতে বশিষ্ঠের দাসী-পুত্রত্ব লাভ কি তারা-পুরে আগমন প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চীনে বশিষ্ঠের গমন কথা

কোনো কোনো তন্ত্রে বশিষ্ঠের চীন-গমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। "রুদ্র-যামল" ও চীনাচারসার-তন্ত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। চীনাচারসার তন্ত্রে বর্ণিত আছে,—(৬)

"ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং বশিষ্ঠো সঃ মহামুনিঃ।
জগামাচারবিজ্ঞানবাঞ্ছয়া বুদ্ধরূপিণং।
ততো গত্বা মহাচীনে দেশে জ্ঞানময়ো মুনেঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বরসুসেবিতং।
কামিনীনাং সহস্রেন পরিবারিতমীশ্বরং।
মদিরাপানসঞ্জাতমদমন্থরলোচনং।
দুরাদেব বিলোক্যৈনং বশিষ্ঠো বুদ্ধরূপিণং
বিস্ময়েন সদাবিষ্ট স্মরন্ সংসারতারিণীং।
কিমিদং ক্রীয়তে কর্ম্মং বিষ্ণুণা বুদ্ধরূপিণা।
দেবদেব বিরুদ্ধোঽয়ং আচারসম্মতো ময়া।

(৬) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-সংকলিত ময়ূরভঞ্জের রিপোর্টধৃত শ্লোক।

নীয়া হইবে। তোমার প্রমথগণ মদমত্তচিত্তে ম্লেচ্ছের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া, ইহারা এই কামরূপক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ হইয়া থাকিবে। আমি শমদমসম্পন্ন তপোধন মুনি; মহাদেবও যে ম্লেচ্ছবৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া আমাকে নিঃসারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইজন্য তিনিও ম্লেচ্ছপ্রিয় ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া এখানে অবস্থিতি করুন। এই কামরূপক্ষেত্র ম্লেচ্ছ সংকুল হউক। স্বয়ং বিষ্ণু যতদিন এখানে না আইসেন, ততদিন ইহা এইরূপভাবে থাক। কামরূপের মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক তন্ত্র সকল বিরল প্রচার হউক। তবে যে পণ্ডিত বিরল প্রচার কামরূপ-তন্ত্র অবগত হইবে, সেই ব্যক্তিই যথাকালে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবে। বশিষ্ঠ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।"(৩) বশিষ্ঠ-শাপে কামরূপে প্রমথগণ ম্লেচ্ছ হইল, উগ্রতারা বামা হইলেন, মহাদেব ম্লেচ্ছরত হইলেন, কামরূপ-মাহাত্ম্য প্রতি-পাদক তন্ত্র বিরলপ্রচার হইল। কামরূপ বেদমন্ত্রহীন ও চতুর্ব্বর্ণশূন্য হইল।(৪) কালিকা-পুরাণে (৫) অন্যত্র বর্ণিত আছে—"সেই স্থানে—(সুরস-পর্ব্বতের নিকটে, এই পর্ব্বত কামরূপের অংশ) বশিষ্ঠ-মুনি নির্ম্মিত একটি বশিষ্ঠ-কুণ্ড আছে, যে স্থানে বশিষ্ঠ-ঋষি নরক কর্ত্তৃক কামরূপ গমনে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠঋষি নীল-পর্ব্বতে যাইতে না পারিয়া সেই নরককে শাপ দিয়াছিলেন। তিনি আপনার স্নানের নিমিত্ত সেই স্থানেই দেবগণের পূজ্য একটি কুণ্ড নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে যথেচ্ছাক্রমে স্নান করিলেও মনুষ্য স্বর্গে গমন করে।" কালিকাপুরাণ ৫১ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—"অনন্তর যোগিরূপধারী বেতাল ভৈরব * * * * * যে ভাগে সন্ধ্যাচল আছে সেই দক্ষিণদিকেই গমন করিলেন। সেইখানে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আনীতা কান্তানদী রহিয়াছে, সেই নদীর তীরে ছায়াপ্রধান বৃক্ষ-লতাদিতে পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ পর্ব্বত, ব্রহ্মার মানস-পুত্র এই পর্ব্বতে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা ইহার নাম সন্ধ্যাচল রাখিয়াছেন। এইখানে যাইয়া তাঁহারা তপঃপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় সূর্য্য সদৃশ শিব-পূজা-পরায়ণ ধ্যানাসক্তচিত্ত মূর্ত্তিমান্ অগ্নি-স্বরূপ বশিষ্ঠ-ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।"

সন্ধ্যাচল

(৩) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃতানুবাদ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)।

(৪) কালিকা-পুরাণ ৮১ অধ্যায়।

(৫) ঐ ৭৮ অধ্যায়।

তন্ত্রসারে বশিষ্ঠের তারা আরাধনা এবং তাহাতে লব্ধকাম হইতে না পারিয়া তারামন্ত্রে শাপ প্রদানের উল্লেখ পাওয়া গেল। কিন্তু এই বশিষ্ঠ ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ কিনা সুস্পষ্ট জানা গেল না। কালিকা-পুরাণের নিমিশাপে দেহহীন বশিষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি সন্ধ্যাচলে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। উগ্রতারা যাঁহাকে তাড়াইয়া দেন, এবং নরক যাঁহাকে কামরূপ-গমনে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাঁরা হয়তো একই বশিষ্ঠ হইতে পারেন। ৫১অধ্যায়ে বেতাল-ভৈরব যাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন সেই শিব-পূজা-পরায়ণ ধ্যানাসক্তচিত্ত বশিষ্ঠও ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কপোত-ঋষি বেতাল ভৈরবকে বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ-ঋষি সন্ধ্যা-পর্ব্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন, তোমরা তাঁহার নিকট গমন কর"। কিন্তু একবার বিষ্ণুর আরাধনা, একবার সন্ধ্যা বন্দনা, একবার উগ্রতারা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়া, একবার নরক কর্ত্তৃক অবরোধ, পুনরায় শিব-পূজা-পরায়ণতা ও ধ্যানাসক্তি প্রভৃতি জটিল পৌরাণিক-কাহিনীর রহস্যোদ্ভেদ করিতে আমরা অক্ষম। যাহা হউক তন্ত্রসার বা কালিকা-পুরাণাদিতে বশিষ্ঠের দাসী-পুত্রত্ব লাভ কি তারা-পুরে আগমন প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চীনে বশিষ্ঠের গমন কথা

কোনো কোনো তন্ত্রে বশিষ্ঠের চীন-গমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। "রুদ্র-যামল" ও চীনাচারসার-তন্ত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। চীনাচারসার-তন্ত্রে বর্ণিত আছে,—(৬)

"ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং বশিষ্ঠো সঃ মহামুনিঃ।
জগামাচারবিজ্ঞানবাঞ্ছয়া বুদ্ধরূপিণং।
ততো গত্বা মহাচীনে দেশে জ্ঞানময়ো মুনেঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বরসুসেবিতং।
কামিনীনাং সহস্রেন পরিবারিতমীশ্বরং।
মদিরাপানসঞ্জাতমদমন্থরলোচনং।
দূরাদেব বিলোক্যৈনং বশিষ্ঠো বুদ্ধরূপিণং
বিস্ময়েন সদাবিষ্ট স্মরন্ সংসারতারিণীং।
কিমিদং ক্রীয়তে কর্ম্মং বিষ্ণুণা বুদ্ধরূপিণা।
দেবদেব বিরুদ্ধোহয়ং আচারসম্মতো ময়া।

(৬) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-সংকলিত ময়রভঞ্জের রিপোর্টধৃত শ্লোক।

ইতি চিন্তয়তস্তস্য বশিষ্ঠস্য মহামুনেঃ।
আকাশবাণী প্রাহাস্থ এবং চিন্তয় সুব্রত।
আচার পরমার্থোহয়ং তারিণীসাধনে মুনেঃ।
এতদ্ বিরুদ্ধাচারস্য মতেনাসৌ প্রসীদতি।
যদি তস্যা প্রসাদস্তং অচিরে নাভিবাঞ্ছসি।
এতেন চীনাচারেণ তদন্তং ভজ সুব্রত।

* * * * * *

অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহ ভক্তিনম্রমহামুনিঃ।
প্রযুক্তং তারিণীদেব্যা নিজারাধনহেতবে।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বুদ্ধস্তত্ত্ব জ্ঞানময়ো হরিঃ।
বশিষ্ঠং প্রাহ সুজ্ঞানচীনাচারাধিকারবান্।
অপ্রকাশ্যোহয়মাচার স্তারিণ্যা সর্ব্বদা মুনেঃ।
তব ভক্তিবশাদস্মিন্ প্রকাশ্যামিহ তৎপরঃ।"

অতঃপর ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তারা-উপাসনার যে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, (লতাসাধন প্রভৃতি) সেই সমস্ত গূঢ়বৃত্তান্ত বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এই সমস্ত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় যে বশিষ্ঠ চীন-দেশে গমন করিয়াছিলেন, তিনি ত্রেতাযুগের রঘু-বংশের কুল-পুরোহিত ঋষি বশিষ্ঠ হইতে পারেন না। কারণ ইহা বুদ্ধ অবতারের পরবর্ত্তী কালের ঘটনা বলিয়াই অনুমিত হয়।

পঞ্চজন সিদ্ধগুরু

"তন্ত্রসারে" দেখিতে পাই তারা-প্রকরণে পীঠন্যাসে, "মূলাধারে কামরূপ-পীঠ, হৃদয়ে জালন্ধর-পীঠ" প্রভৃতি ন্যাস করিবার বিধি রহিয়াছে। কামরূপেই তারা-পূজা-পদ্ধতি বামাচার পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তৎপরে অক্ষোভ্য পূজান্তে পীঠের চারিকোণে যে গুরু-পংক্তিপূজার বিধি রহিয়াছে, তাহাতে উর্দ্ধে কেশানন্দনাথ প্রভৃতি চারিজন দিব্যগুরু পূজিত হইয়াছেন। অতঃপর পঞ্চজন সিদ্ধগুরু পূজার বিধি আছে, ইহাঁদের নাম—"বশিষ্ঠানন্দনাথ' 'কূর্ম্মনাথানন্দনাথ', 'মীননাথানন্দনাথ', 'মহেশ্বরানন্দনাথ', ও 'হরিনাথানন্দনাথ"। তন্ত্রসার তারা-প্রকরণের বিধি—

'আনন্দনাথ' শব্দান্তা গুরবঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ

সুতরাং প্রকৃত নাম বশিষ্ঠ, কূর্ম্মনাথ প্রভৃতি নামের সঙ্গে আনন্দনাথ শব্দ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গুরুগণ 'দিব্যৌঘাঃ', ইহাঁরা 'সিদ্ধৌঘাঃ'

এবং পরবর্ত্তী ভানুমতী প্রভৃতি দেবী ও সুখানন্দ প্রভৃতি দেব 'মানবৌঘাঃ' রূপে উক্ত হইয়াছেন। তন্ত্রসারোদ্ধৃত প্রমাণ,—তথাচ তারাতন্ত্রে—

অথ তারাগুরূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
ঊর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠ বৃষধ্বজঃ॥
দিব্যৌঘাঃ সিদ্ধিদা বৎস সিদ্ধৌঘান্ শৃণু তত্ত্বতঃ।
বশিষ্ঠঃ কূর্ম্মনাথশ্চ মীননাথো মহেশ্বরঃ॥
হরিনাথো মানবৌঘান্ শৃণু বক্ষ্যামি তদ্‌গুরূন্।
তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরী॥
সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ।
বিরূপাক্ষ ফেরবী চ কথিতং তারিণীকুলং॥

দিব্যৌঘ গুরু চতুষ্টয় যে, ভগবান শঙ্করেরই মূর্ত্তিভেদ, তাহা নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সিদ্ধৌঘগণ তন্ত্রসিদ্ধ-যোগী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। মানুষ ভিন্ন দেবতার নামের সঙ্গে 'সিদ্ধ' আখ্যা সংযুক্ত হইতে পারে না, এবং বশিষ্ঠ, মীননাথ প্রভৃতি নামও তাহাদের এই পরিচয়ই প্রদান করিতেছে। ভানুমতী, তারাবতী আদি ও সুখানন্দ প্রভৃতি গুরুগণ যে তান্ত্রিক-যোগিনী ও যোগী এবং ইঁহারা যে সিদ্ধগুরু পদবীতে উন্নীত হইতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

নেপালের বৌদ্ধ-সমাজে মৎস্যেন্দ্র নামে এক যোগীর পূজা আজিও প্রচলিত আছে। ইনি শৈব-সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষতঃ কনফট্ যোগীগণের উপাস্য 'গোরক্ষনাথের' গুরু। (৭) তন্ত্রসারেও ইহার উপাসনা-পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মৎস্যেন্দ্রনাথ ও মীননাথ দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সি, আই, ই মহোদয়ের মতে 'প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মীননাথ বঙ্গদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং সপ্রমাণ হইতেছে, যে বশিষ্ঠ তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য একজন তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। আমাদের অনুমান হয় এই বশিষ্ঠই তারাপুরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সাধনার অস্পষ্ট স্মৃতি পরবর্ত্তীকালে কালিকাপুরাণের রূপান্তরিত কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হইয়া নাম-সাদৃশ্যে রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠের তারাপীঠে আগমন—আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে এদেশে কালিকা-পুরাণ-পদ্ধতি প্রচারিত

মৎস্যেন্দ্র-পূজা

(৭) সুপ্রসিদ্ধ 'ময়নামতীর গানে' এই গোরক্ষনাথের নাম পাওয়া যায়।

হওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। (৮) হইতে পারে সেই সময়সময়েই,—সাধনোপযোগী স্থান দেখিয়া—তান্ত্রিকগণ কেহ হয় তো তারাপুরে একটি সাধন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তিনিই তন্ত্রোক্ত ঐ বশিষ্ঠানন্দনাথ।

তারাপুরে বশিষ্ঠানন্দনাথ

নলহাটী আজিমগঞ্জ শাখা রেল পথের সাগরদীঘি ষ্টেসন হইতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে গুড়ে ও পাশলা নামে পাশাপাশি ছুইখানি গ্রাম আছে। পাশলা গ্রামের উত্তর হইতে পশ্চিমদিক্ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত একটি বিল দেখিতে পাওয়া যায়। বিলের কোনো অংশের নাম কালী গঙ্গা কোনো অংশের নাম পাতাল-গঙ্গা কোনো অংশের নাম মগড়াদহ ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণতঃ বিলটি "বসিয়ে" বিল অর্থাৎ বশিষ্ঠ-বিল নামে খ্যাত। গুড়ে গ্রামের দক্ষিণপশ্চিম কোনো বিলের মধ্যে একস্থানের নাম বশিষ্ঠকুণ্ড। এখনো সেই কুণ্ডে লোকে বশিষ্ঠ দেবের পূজা দেয়। গ্রীষ্মকালে বিলের মধ্যস্থিত বহু উৎস হইতে অবিশ্রান্তধারে জল নির্গত হয়। জল যেমন নির্ম্মল তেমনি শীতল। উৎসের চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকারাশি গঙ্গামৃত্তিকার ন্যায় পেলব এবং বালুকণাগুলিও গঙ্গার বালুকার মত। বর্ষার সময় খেয়া-ডিঙ্গি ভিন্ন এই বিল পার হইবার উপায় থাকে না। বর্ষার জল কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা বিলগর্ভে নানাবিধ ফসলের চাষ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে রবি-শস্যের ভাগই অধিক। চৈত্রমাসে এই বিলের নানাস্থানে চাষআবাদ হয়। বিলে জল থাকে না, অথচ ক্ষেত সেচিতে ও কৃষক-দিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। উৎসসমূহ সঞ্চিত-জলরাশি একত্রিত হইয়া কোনো কোনো সময়ে হঠাৎ কয়েক দণ্ডের জন্য বিলমধ্যস্থিত পয়োনালি-গুলি পূর্ণ করিয়া বহিয়া যায়, কৃষকেরা সেই সময়ে সেই জল তুলিয়া আপন আপন ক্ষেত্র সেচন করিয়া লয়। কৃষকগণ ইহাকে বিলের জোয়ার-ভাটা বলে। অনেক সময় বিলের জোয়ার দিনে বহে না। তাই কৃষকগণ রাত্রিকালে নালার উপর কম্বলাদি পাতিয়া নালার মাঝে পা রাখিয়া বসিয়া থাকে, মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়ে। কখন একসময় জোয়ার আসে, জোয়ারের জল ধীরে ধীরে বহিয়া কৃষকগণের পা ধরিয়া যেন নাড়া দিতে থাকে, অমনি তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ক্ষেত সেচিয়া লয়। অনেকে নাকি সেই সময় অত্যুজ্জ্বল আলোক প্রভৃতি বিলের মধ্যে নানারূপ অলৌকিক ব্যাপর দেখিতে পায়। বিলের মধ্যে একটি স্থানের নাম 'জাহাজ-ডুবি' অনেকে সেখানে ভাঙা জাহাজের মাস্তল প্রভৃতিও দেখিয়াছে। বিলের পশ্চিম তীরে 'ঠাকুরুণ

বশিষ্ঠ বিল

(৮) বাস্তা-কাহিনী।

নং গুড়েপাশলার নিকটবর্ত্তী ঠাকরুণ-পাহাড়ের মারিচী-মূর্ত্তি

ভূম-বিবরণ

১৩৩ পৃষ্ঠা
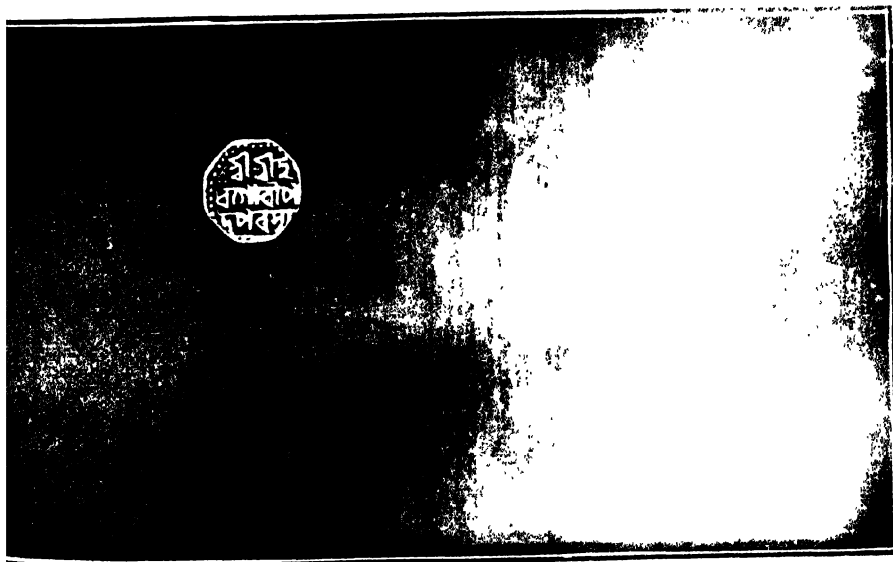
নং কড়কড়ে গ্রামের রৌপ্য-মুদ্রা

পাহাড়' নামে একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ,—পুরাতন ভগ্নইষ্টকের রাশি ও নানাবিধ তরু-লতা-তৃণ-গুল্মে পরিপূর্ণ, এখন কতকগুলি "গৃহস্থ বৈষ্ণবের" (!) বাস-ভবন। প্রবাদ—তথায় সুপ্রসিদ্ধ চাঁদসওদাগরের বাণিজ্য-তরণীর বিশ্রাম-নিকেতন (গোলাবাড়ী) ছিল। ঠাকুরুণ-পাহাড়ের পশ্চিমে অনতিবৃহৎ এক প্রাচীন জলাশয় "চাঁদসওদাগরের দীঘি" নামে বিখ্যাত। অধুনা দীঘিটি মজিয়া আসিয়াছে, তাই কেহ কেহ ইহাকে পচাফেনা বলে। প্রবাদ,—এই চাঁদই—সেই মনসা-মঙ্গলের খ্যাতনামা সওদাগর চন্দ্রধর। ঠকুরুণ-পাহাড়ে এক দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এখন ব্রাহ্মণে তাঁহার পূজা করিলেও তিনি হিন্দুর দেবতা নহেন। কতকাল হইতে তিনি এই পাহাড়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন, কেহই বলিতে পারে না। সপ্তশূকরবাহনাসীনা, অষ্টভুজা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপাস্যা মারীচি-দেবী কিরূপে ব্রাহ্মণের হস্তে আসিয়া পতিতা হইলেন, আজি আর সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার কোনোই উপায় নাই। মূর্ত্তিটির অনেকাংশ ভগ্ন সুতরাং বিকৃত হইয়াগিয়াছে। দুইটি মুখ প্রায় অবিকৃত আছে একটি বানরের মত, অপরটি প্রায় ভল্লুকের মত। নিম্নে কল্লোক্ত মারীচি-সাধন হইতে দেবীর ধ্যান উদ্ধৃত হইল:—

ঠাকুরুণ-পাহাড়

মরীচি-দেবী

গৌরীং ত্রিমুখীং ত্রিনেত্রাং অষ্টভুজাং রক্ত দক্ষিণমুখীং, নীল বিকৃত বাম বরাহ-মুখীং, বজ্রাংকুশ শরসূচীধারী দক্ষিণ চতুঃ করাং অশোকপল্লব চাপ সূত্র তর্জ্জনী-ধর বামচতুঃ করাং বৈরোচন মুকুটিনাং নানাভরণবতীং চৈত্যগর্ভস্থিতাং রক্তা-ম্বর কঞ্চুকোত্তরীয়াম্ সপ্তশূকর রথারূঢ়াং প্রত্যালীঢ়পদাং পংকারজ বায়ুমণ্ডলে হংকারজ চন্দ্রসূর্য্যগ্রাহী মহোগ্র রাহু সমধিষ্ঠিত রথমধ্যাং দেবী চতুষ্টয় পরিবৃতাং

মরীচি-দেবীর ধ্যান

দেবীচতুষ্টয়ের পরিচয়—

১। অত্র পূর্ব্বদিশি বর্ত্তনাং রক্ত বরাহমুখীং চতুর্ভুজাং সূচ্যঙ্কুশধারী দক্ষিণ হস্তাং পাশাশোকধারী বাম হস্তাং রক্তকঞ্চুকীং চেতি

২। তথা দক্ষিণে বদালাং পীতাং অশোকসূচী বাম দক্ষিণ ভুজাং বজ্রপাশ বাম্ দক্ষিণ করাং কুমারীরূপিণীং নবযৌবনালঙ্কারবতীং

দেবীচতুষ্টয়ের পরিচয়

৩। তথা পশ্চিমে বরালাং শুক্লাং বজ্রসূচীবদ্দক্ষিণভুজাং পাশাশোকধরা বাম করাং প্রত্যালীঢ়পদাং স্বরূপিণীং চেতি

৪। তথোত্তরদিকভাগে—বরাহমুখীং রক্তাং ত্রিনয়নাং চতুর্ভুজাং বজ্রশর-বদ্দক্ষিণ করাং চাপাশোকধরা বাম করাং দিব্যরূপিণীং ধ্যাত্বা।

পার্শ্বের সেই চারিটি মূর্ত্তি কোথায় বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে। দেবীর কিঞ্চিৎ সম্পত্তি

আছে। পূজারী-ঠাকুরের বোধ হয় তাহাই জীবিকাবলম্বন। দেবীর নিত্য-পূজা ভিন্ন ভোগাদির কোনো ব্যবস্থা নাই। দুর্গা-পূজার সময় মহাষ্টমীর দিনে দেবীর সম্মুখে একটি ছাগবলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে পুরুষ-দেবতাকে ঠাকুর এবং স্ত্রী-দেবতাকে ঠাকুরুণ আখ্যায় অভিহিত করে। সুতরাং মারীচি-দেবী হইতে স্থানটির নাম যে ঠাকুরুণ পাহাড় হইয়াছিল তাহা বলা বহুল্য।

বীরনগর-কাহিনীতে গঙ্গার যে প্রাচীন-স্রোতের উল্লেখ করিয়াছি, এই বশিষ্ঠ-বিল তাহারই অংশমাত্র, গঙ্গা মজিয়া গিয়া কালক্রমে বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। কতদিন পূর্ব্বে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে সে বিষয়ে কোনো প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠের সিদ্ধস্থান ও বশিষ্ঠ-কুণ্ডের নামানুসারে কালে সমস্ত বিলটি বশিষ্ঠ-বিল নামে পরিচিত হইয়াছে। এই বশিষ্ঠ যে কোন্ বশিষ্ঠ তাহা জানিবার উপায় নাই। তারাপুর এখান হইতে বেশী দূরে নহে, সুতরাং তারাপুরের বশিষ্ঠ এবং এই বশিষ্ঠ বোধ হয় একজন হইতে পারেন। মুর্শিদাবাদ-কহিনীতে—(৮৭ পৃষ্ঠা) চম্পানগর হইতে আসিয়া চাঁদসওদাগরের রাঙ্গামাটীতে বাসের প্রবাদ উল্লিখিত আছে। চাঁদসওদাগরের নামেই নাকি চাঁদপাড়া গ্রাম। বহরমপুরের ছয় সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে রাঙ্গামাটী বা কাণ-সোণায় আসিয়া বাস করিলে—চাঁদের গোলাবাড়ী ঠাকুরুণ-পাহাড়ে থাকা কিছু অসম্ভব নহে। গুড়ে-পাশলা গ্রামও মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। বুঝিতে পারাযাইতেছে, যে চাঁদসওদাগরের প্রবাদ এ অঞ্চলে একসময় বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মারীচি-মূর্ত্তি বৌদ্ধ-প্রধান্যের নিদর্শন। যুয়ানচোয়াঙ্গের বর্ণনায় কর্ণসুবর্ণে ১০টি সংঘারাম ও ২০০০ আচার্য্যের অবস্থিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঠাকুরুণ পাহাড়েও বোধ হয়, একটি বৌদ্ধ সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাহা হউক এই সমস্ত নিদর্শন হইতে রাঢ়ে বৌদ্ধ-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বৈদেশিক আক্রমণকারীগণের প্রভাবে রাঢ়ে হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রসার লাভ করিলেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই ঠাকুরুণ-পাহাড়ের মারীচি-মূর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। কোন্ সময়ে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অনুমান করিয়া বলা কঠিন। চাঁদসওদাগরের প্রবাদের আলোচনায় মনে হয় কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে ঠাকুরুণ-পাহাড়ের কোনো সম্বন্ধ ছিল। পাল-নরপতিগণের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বশিষ্ঠ-বিলের উৎপত্তি

ঠাকুরুণ-পাহাড়ে মারীচি-মূর্ত্তি

তারা-উপাসনা কোন্ সময়ে এতদ্দেশে প্রথম প্রচলিত হয়,—অনুমান করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই। তবে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময় বৌদ্ধ-তারা-উপাসনার যে বহুল প্রসার ঘটিয়াছিল তৎসময়ে রচিত বহু গ্রন্থাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে অনাচর প্রবেশলাভ করিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল দীপঙ্করের যত্নে তাহার সংস্কার সাধিত হয়। কিন্তু সমাজে একবার ভাঙ্গন ধরিলে তাহাকে রক্ষা করা বড় শক্ত। দীপঙ্কর তিব্বত গমন করিলেন ক্রমে ক্রমে পাল-রাজত্বের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিল সুতরাং দেশে অনাচারের স্রোত আবার ভীষণ আকার ধারণ করিলে হিন্দু-বৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষে তান্ত্রিক-সাধনার নামে উৎকট ব্যভিচারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। এই প্রবাহ পরিবর্ত্তিত করিতে সেনরাজগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গের তাৎকালিক অবস্থা-সম্বন্ধে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন,—"লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ পিতার শেষ অভিপ্রায় অনুসারেই বৈদিক ও তান্ত্রিকগণের সমন্বয়-চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, যদিও শেষাবস্থায় বল্লালসেন নাস্তিক বা বৌদ্ধ-উচ্ছেদ ও বেদাভ্যুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিকতায় হিন্দু-সমাজে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার প্রসারিত হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত মন্ত্রী ও সচিবগণের সহিত যুক্তি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তান্ত্রিক-কুলাচারের প্রশ্রয় দিলে কঙ্কালসার বৈদিক-ধর্ম্ম নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইবে; অবৈদিক ভোগ-বিলাসময় প্রচ্ছন্ন-তান্ত্রিক-বৌদ্ধাচার সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তাই তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পশুপতি ও হলায়ুধের সাহায্যে ধীরে ধীরে সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তান্ত্রিকগণ তন্ত্র ব্যতীত অপর কোনো শাস্ত্রই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সুতরাং লক্ষ্মণসেনকেও প্রথমে তন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী ও রাজ-পণ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরণ ও তন্ত্রের সার-সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই সময়ের উপযোগী মৎস্য-সূক্ত নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার করিলেন। হিন্দু-সমাজে সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই মৎস্য-সূক্ত মহাতন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রথমেই বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা-দেবীর পূজাক্রম, মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধ তন্ত্রানুমোদিত মহাচীন ক্রমে তারাদেবীর সাধন ও নীলসারস্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধ তন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে"।(১)

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও বৌদ্ধ-তারার উপাসনা

লক্ষ্মণসেনের বৈদিক ও তান্ত্রিকগণের সমন্বয় চেষ্টা

(১) রাজন্য-কাণ্ড অষ্টম অধ্যায় সেনরাজ বংশ।

বৌদ্ধ-তন্ত্রমতে তারা লোকেশ্বর বুদ্ধের সুতা এবং তাঁহার অপর একটি নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। মৎস্য-সূক্ত-তন্ত্রে সপ্তম পটলে উল্লিখিত আছে—

"লোকেশস্য সুতাপ্যথমতা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহা স্বধা বিধেয়া"

ঐ পটলে—অন্যত্র—

জয় জয় তারে দেবি নমস্তে, প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে।

প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে, প্রণতজনানাং দুরিতক্ষয়িতে॥ (১০)

ইতিপূর্ব্বে গোরক্ষনাথও বোধ হয় এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই বৌদ্ধ-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সমাজের অন্যতম আচার্য্য মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ আজিও একসম্প্রদায় শৈবের উপাস্য-রূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। আমাদের অনুমান, তন্ত্রের বশিষ্ঠও হয়তো এই উদ্দেশ্যেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এবং তারাপুর তাঁহার সেই কার্য্যের কেন্দ্র ছিল। তাই প্রবাদ—তাঁহাকে রঘুকুল-গুরুর আসনে বসাইয়া ঋষিত্বে বরণ করিয়াছে, তাই হিন্দু-তান্ত্রিকগণ আজিও আদরে তাঁহাকে ভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। হিন্দু-তান্ত্রিকতার সঙ্গে বৌদ্ধ-আচার ও উপাসনা-পদ্ধতি যে কিরূপ অবিমিশ্রভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে বর্জ্জন করা যে কিরূপ সমস্যা-সংকুল হইয়া পড়িয়াছিল, এক মৎস্য-সূক্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। উপরিদ্ধৃত শ্লোকাংশ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্যাপার কত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দু-তান্ত্রিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও বশিষ্ঠের চীন-গমন বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না।

তারাপীঠ

প্রবাদের মূল্য যাহাই হউক, তারাপীঠ যে তান্ত্রিক-সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তন্ত্রে তারা সাধনার যে যে ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে 'শ্মশান' অন্যতম। তারাপুরের মত এমন 'জীবন্ত' শ্মশান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সে ভয়াবহ দৃশ্য ভাষায় চিত্রিত করা যায় না। তারাপুর দেখিলে সত্য সত্যই ত্রিভুবনেশ্বরীর সেই ভীষণ মধুর পীঠ-চিত্র স্মৃতি-বক্ষে উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মনে পড়ে—

শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ।
তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতং॥
নানালঙ্কার ভূষাঢ্যং মুনি দেবৈশ্চ ভূষিতং।
শিবাভি র্বহুমাংসাস্থি মোদমানাভিরন্ততঃ॥

(১০) রাজন্য-কাণ্ড অষ্টম অধ্যায় ১১১ পাদ-টীকা।

চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ড চিতাঙ্গারাভিভূষিতং।
তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবী যথোক্ত ধ্যানযোগতঃ॥

শ্মশান! বুকে তার কল্পবৃক্ষ। বৃক্ষমূলে নানা মণিভূষিত মণিপীঠ। চতুর্দ্দিকে সাধনোচিতবেশে সজ্জিত মুনিগণ, দেবগণ। অদূরে অস্থি—মাংস-লাভে প্রহৃষ্ট শিবাদল ফিরিতেছে। ইতস্ততঃ নরমুণ্ড চিতাঙ্গার ছড়ানো রহিয়াছে। কি সুন্দর! আবার কত ভীষণ! একদিকে আরম্ভ, অন্তদিকে সমাপ্তি, একদিকে বর্ত্তমান, অন্তদিকে পরিণাম্। মন্দিরে তারা, তারা, মা মা রব। শ্মশানে 'বল হরি হরিবোল'-ধ্বনি। মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার মধুর রোল, শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুরের কঠোর চীৎকার। উভয়ের মধ্যস্থলে মাতৃধ্যান-পরায়ণ সাধক সমাধিমগ্ন। এই কান্ত-ভীষণ-দৃশ্য তারাপুরে যেমন, এমন-টি আর কোথাও দেখি নাই। তারাপুর যে দেখিয়াছে, সে জীবনে কখনো ভুলিবে না। তারাপুর প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাকিবার উপযুক্ত স্থান। মাতৃহারার শান্তি নিকেতন।

তন্ত্রের চিত্রও তারাপুর

অতি প্রাচীনকাল হইতেই তারাপুর তান্ত্রিক-সাধকগণের সাধনভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তারাপুরকে তান্ত্রিকগণ উপপীঠ ও সিদ্ধপীঠ বলিয়া অভিহিত করেন। বিশেষত্বপুর্ণ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মনোহারিত্বে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভগবতসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশে—যে স্থান মহিমান্বিত, তাহাই উপপীঠ নামে অখ্যাত হয়। আর সিদ্ধ সাধকের সাধনার আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, ভগবান যথায় নিত্যাধিষ্ঠানে প্রতিশ্রুত, তাহাই সিদ্ধপীঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তারাপীঠে এই দুয়েরই সাকর্য্য ঘটিয়াছে। তাই তারাপুর কি সাধক, কি সংসারী সকলেরই সমান শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। নাটোরের রাজ-যোগী সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণ যখন সাধনার জন্য তারাপুরে আগমন করেন, তখন তারাপুরে আনন্দনাথ নামে একজন তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী বাস করিতেন। মহারাজ তাঁহার পাণ্ডিত্যে, আচারনিষ্ঠতা, তান্ত্রিকী সাধনার রহস্যজ্ঞতা ও সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট তাঁহাকে মাতৃমন্দিরের সর্ব্বাধ্যক্ষতা প্রদান করেন। আনন্দনাথ মন্দিরের প্রধান কৌলিকের পদে বৃত হইয়াছিলেন। তদবধি পূজাদির তত্ত্বাবধান ঐরূপ এক একজন কৌলিকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। শনি মঙ্গলবারের বিশেষ পূজা আনন্দনাথের প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। আনন্দনাথ তারাপুরে তন্ত্র-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্ত্রের বিশুদ্ধমত প্রচারই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের পর কয়েকজন উন্মার্গ-

তারাপুর-উপপীঠ ও সিদ্ধপীঠ

মহারাজ-রামকৃষ্ণ ও তান্ত্রিক আনন্দনাথ

গামী ব্যক্তি, তাঁহার মতের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া এতদঞ্চলে মদ্যপানের অবারিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। ফলে শাক্ত-বৈষ্ণবে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছিল। আনন্দনাথের কয়েকজন শিষ্য সেই গড্ডলিকাস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে (২য়) আনন্দনাথ নামে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া এই দ্বন্দ্বের সমাধান করেন। এতদঞ্চলে তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি তিনি শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ দূরীভূত করিয়া গিয়াছিলেন।

২য় আনন্দনাথ

মোক্ষদানন্দ

(২য়) আনন্দনাথের পর প্রধান কৌলিকের পদ লাভ করেন মোক্ষদানন্দ। ইহার নিবাস বীরভূম জেলার রাৎমা গ্রামে। তারাপুরের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে রাৎমা। মোক্ষদানন্দের পূর্ব্বনাম মাণিকরাম। পাঠাভ্যাসের সময় হইতেই অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া তিনি অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠেন। বহুদিন পরে জীবনের প্রায় প্রান্তসময়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়। অনুতাপে মাণিকরাম গৃহত্যাগী হন। লোকে বলে তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে। নানাদেশে ফিরিয়া শেষে কাশীধাম গিয়া দণ্ডগ্রহণ করিয়া তিনি যখন দণ্ডী হইয়াছেন, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন পত্নীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। পত্নী আছেন জানিতে পারিয়া দণ্ডী-সমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। মোক্ষদানন্দ পত্নীসহ ভ্রমণ করিতে করিতে তারাপুরে উপস্থিত হন। (বলা বাহুল্য পত্নীও স্বামীর আদর্শে তখন সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন) ২য় আনন্দনাথ মোক্ষদানন্দকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। মোক্ষদানন্দ আপনার কৈশোর-জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছিলেন যে, সন্তানগণকে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে কর্ম্মে শিক্ষা-দিক্ষায় সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে হিন্দু সমাজের ভবিষ্যত অচিরেই শোচনীয় হইয়া উঠিবে। এই জন্য তিনি সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে হিন্দু-বালকগণের আশ্রমোচিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান—আবহাওয়া তাঁহার সাধু-সংকল্পের বীজিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এই মোক্ষদানন্দের প্রধান শিষ্য ভৈরবাবধূত বামাচরণ। বীরভূমির বরপুত্র—জগজ্জননীর আদরের-দুলাল—তারাপুরের বামাক্ষ্যাপা।

মোক্ষদানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বামাক্ষ্যাপা

বামাচরণের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস তারাপুরের নিকটবর্ত্তী আটলা গ্রাম। জন্ম বঙ্গাব্দ ১২৪১ সালে। বামাচরণের অপর দুইটি ভগ্নি ও একটি ভ্রাতা ছিলেন। ভ্রাতার নাম রামচরণ। পল্লীর পাঠশালে বামাচরণের অক্ষর-পরিচয় হইয়াছিল মাত্র। লেখাপড়ায় তাঁহার তেমন মনোযোগ ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই খেলাধূলায় মাতিয়া থাকিতেন। তবে

বামার-জীবনি

১১ নং তারাপুরের বামা ক্ষ্যাপা।

১১৮ পৃষ্ঠা
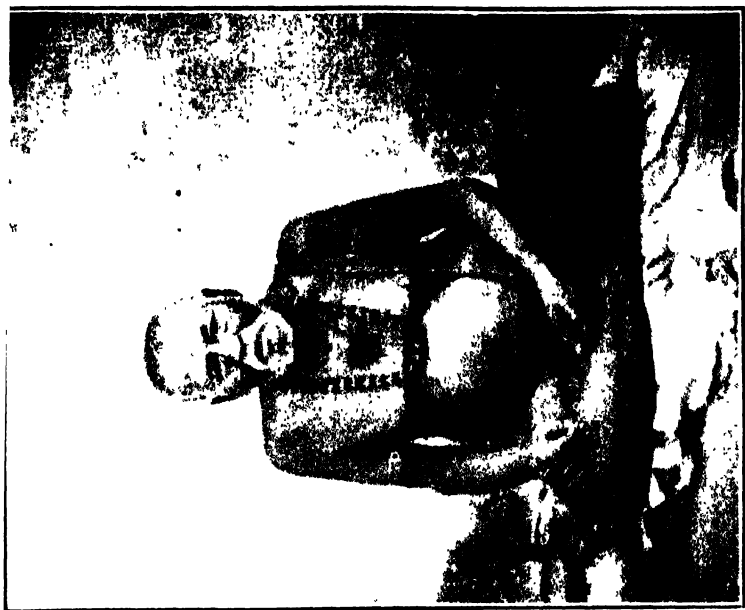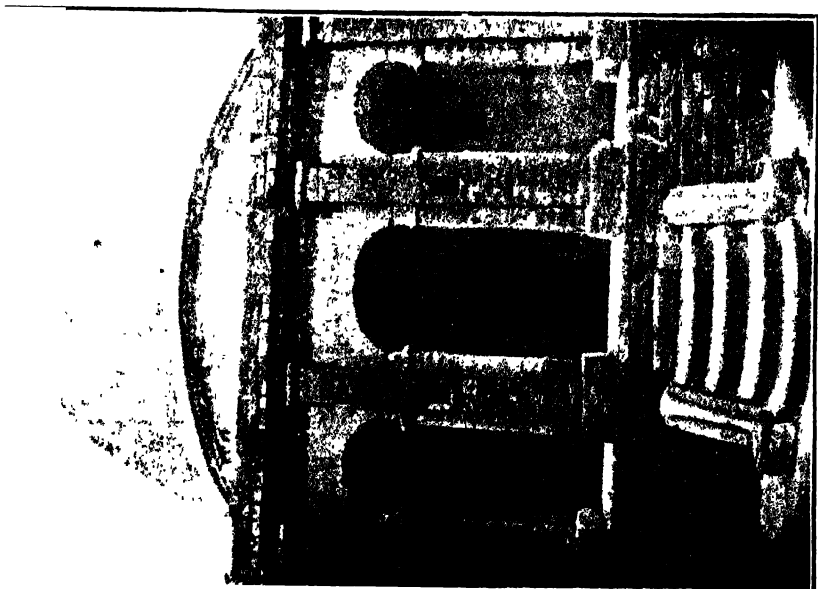
কোটাসুরে মদনেশ্বর শিব-মন্দির।

খেলার একটু বিশেষত্ব ছিল। খেলিতেন—মাটির ঠাকুর গড়িয়া, বনের ফুলে পূজা করিয়া, ধূলার নৈবেদ্য দিয়া, মুখে মুখে ঢাক-ঢোলের বাজনার বোল আওড়াইয়া, একটু নূতন রকমের খেলা খেলিতেন। বাল্যকাল এইরূপেই কাটিল। সর্ব্বানন্দ দেহত্যাগ করিলেন, বিধবা, পুত্রদের লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন গেল। বামাচরণ পঞ্চদশ-বর্ষে উপনীত হইলেন। সংসারের অবস্থা কিছু কিছু বুঝিতে শিখিলেন। অভাব যখন প্রবল হইয়া উঠিল, জননীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বামাচরণ মলুটীর-রাজবাটীতে গিয়া পূজকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। আজন্ম-পাগল—জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলে ভগবদ্ভাবে আত্মহারা—ভক্তিতে পাগল, শিশুর ন্যায় সরল-বামাচরণ, অতশত ব্যবসায় ফন্দির ধার ধরিতেন না, তাই তাঁহার পূজা নিয়োগকর্ত্তার মনোমত হইল না। বামাচরণ মলুটী ত্যাগ করিলেন, কিছু দিন হরিষাড়া গ্রামে তাঁহার ভগিনীর বাড়ীতে কাটিল। অবশেষে দিন কতকের জন্য যে তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই কিছু জানিতে পারিল না। বাড়ীতে রামচরণকে লইয়া অতি দুঃখে কোনো প্রকারে জননী দিনযাপন করেন। পাগল বামাচরণের জন্য তাঁহার ভাবনার আর অবধি নাই। হঠাৎ একদিন তিনি শুনিলেন বামাচরণ তারাপুরে আসিয়া মোক্ষদানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্র সন্ন্যাসী হইলেন, জানিনা—মাতা তাহাতে দুঃখিতা হইয়াছিলেন কিনা; কিন্তু এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বামাচরণের বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর। শুনিয়াছি,—দ্বারিকার কুল-প্লাবী-বন্যাকে উপেক্ষা করিয়া,—নদী পার হইয়া,—পরপারস্থ জননীর শব তারাপুরে আনিয়া—বামাচরণ স্বহস্তে তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরো শুনিতে পাওয়া যায়, মাতৃ-শ্রাদ্ধের দিনে প্রবল মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রামচরণ যখন কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, বামাচরণ তাঁহাকে সাহস দিয়াছিলেন। লোকে বলে—আসন্ন-বর্ষণোন্মুখ-মেঘ বামাচরণের কথায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল।

বামার চাকুরী

সন্ন্যাস গ্রহণ

দুইটি প্রবাদ

মোক্ষদানন্দের পরলোকগমনের পর বামাচরণই প্রধান কৌলিকের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পবয়স্ক ও বিদ্যাবুদ্ধিহীন পাগল বলিয়া কর্ম্মচারীগণ পূজাদির তত্ত্বাবধান-কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বামাচরণ কোনোরূপ কর্ত্তৃত্বের প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা তারা-নামেই বিভোর হইয়া থাকিতেন। আপনার মাতাকে হারাইয়া বিশ্ব-মাতার জন্য ব্যাকুলতায় তিনি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় নিশিদিন তিনি তারা তারা তারা জপ করিতেন। বামার মুখে 'মা'-নাম

পীঠের কর্ম্মচারী ও বামাচরণ

শুনিয়া অতি বড় পাষণ্ডের নয়নও অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত। উন্মুক্ত আকাশ তলে দ্বারিকার-তীরে মাতৃহারা-বালকের মত বিহ্বলপ্রাণে বুকভাঙ্গা ব্যাকুলতা লইয়া তিনি যখন মা মা বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেন, মনে হইত মাটির মর্ত্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্বর্গের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে। এই সময়েই তিনি বশিষ্ঠের-সিদ্ধাসন অধিকার করেন। আসনে বসিয়া জপ করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। লোকে বিস্ময়—নির্নিমেশে চাহিয়া দেখিত - তাঁহার সাধন তন্ময়তা! মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া আসিত। কিয়দ্দিনের মধ্যেই কি জানি কেমন করিয়া জন সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল, "বামা-ক্ষ্যাপা" সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অমনি দিনে-দিনে দলে-দলে নর-নারী আসিয়া তারাপুরে উপস্থিত হইতে লাগিল। অনেকে সত্য সত্যই সাধুকে শুধু শ্রদ্ধার অঞ্জলিই নিবেদন করিতে আসিত। কত সংসার-দাব-দগ্ধ হতভাগ্য, কত নিরাশাপুর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট মরু-জীবন, কত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী—যে এই পাগলের পদপ্রান্তে আসিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে, জুড়াইয়াছে, তৃপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। আবার অনেকে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে, ঔষধাদি প্রাপ্তির আশায়ও আসিত, কিন্তু বামাকে কখনো কেহ বুজরুক্ সাজিতে দেখে নাই। একটি গান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল,—আপনার মোটা গলায় তালে বেতালে যখন তখন তিনি এই গানটি গাহিতেন—

বামার সিদ্ধি ও প্রসিদ্ধি

বামার গান

"পদ্মমধু আনরে মন, তারামায়ের চোখে দিব
মার' হয়েছে দৃষ্টির অভাব
জলছানি তায় কাটাইব"।

বামার উত্তরোত্তর খ্যাতিবৃদ্ধি দেখিয়া কতকগুলি লোক ঈর্ষা পরবশ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটনা করে এবং মন্দির হইতে মায়ের প্রসাদ পাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। তিন দিন বামাচরণকে উপবাসে কাটাইতে হইয়াছিল। চতুর্থ দিনে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ সময়ে নাটোর—রাজবাড়ী হইতে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকাশ করিলেন রাজধানীতে স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, আপনারা দেবীর পূজা-ভোগ আদি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সকলেই অবাক! কেন-বেশ নিয়মিত ভাবেই তো দেবীর পূজা ভোগাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে। কথায় কথায় কর্ম্মচারী মহাশয় শুনিলেন, বামাকে প্রসাদ দেওয়া আজ তিন দিন ধরিয়া বন্ধরাখা হইয়াছে, সন্ন্যাসী উপবাসী আছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, কেন ভক্ত-বৎসলা জগজ্জননীর এই স্বপ্নাদেশ। তিনি তৎক্ষণাৎ নূতন করিয়া বিবিধ-উপচারে দেবী-পূজার ব্যবস্থা করিলেন এবং বামাচরণকে সাদরে-আহ্বান করিয়া পরিতোষ

বামার প্রসাদ বন্ধ ও নাটোরে স্বপ্ন

তারাপুরে ৺বামা ক্ষ্যাপার সমাধি।

তারাপুরের পার্ব্বতী ও সূর্য্য-মূর্ত্তি

সহকারে ভোজন করাইয়া—আপনি প্রসাদ-প্রাপ্ত হইলেন, অবশেষে বামার চরণে পড়িয়া গত অপরাধের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সদাপ্রফুল্ল বামাচরণ নির্ব্বিকার। উপবাসেও যেমন ছিলেন, এখনো তেমনি, অপরাধ গ্রহণ করিলে তবে তো ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক সেই অবধি বামাচরণকে আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না। কতলোক তাঁহাকে কতভাবে পরীক্ষা করিয়াছে, কেহ তিন—দিবারাত্রি ধরিয়া মদ্য-পান করাইয়াছে, কেহ শবদেহের গলিত-মাংস ভোজন করিতে দিয়াছে, কেহ স্বর্ণালঙ্কার দান করিতে আসিয়াছে, কিন্তু কোনো প্রকারেই তাঁহার ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া শেষে আপনারাই লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গত সন ১৩১৮ সালের ৩রা শ্রাবণ রাত্রিকালে বীরভূমির অলঙ্কার, তারা-মায়ের আদরের সন্তান—বামাচরণ, তাঁহার নির্ম্মল অনাড়ম্বর-জীবনের কার্য্য-শেষে, এই ধূলারধরণী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধনোচিত-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

বামার পরীক্ষা।

তিরোধান

শারদ (আশ্বিনের) শুক্লাচতুর্দ্দশীতে তারাপুরে একটি মেলা হয়। নানা স্থান হইতে বহু নর-নারী আসিয়া মেলায় যোগদান করেন। প্রবাদ আছে—এই তিথিতেই বণিক্ জয়দত্তের পুত্র তারাপুরের জীবিত কুণ্ডের জলস্পর্শে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন। সেই অদ্ভুত ঘটণার স্মরণোৎসব জন্যই এই মেলার অনুষ্ঠান। এই দিন মায়ের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। বামাচরণের মহাপ্রস্থান-দিনের স্মরণ জন্যও এখন তারাপুরে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ক্ষ্যাপার ভক্তগণই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। তারাপুরে তন্ত্র-শিক্ষার জন্য একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেই, বোধ হয় বামাচরণের উপযুক্ত স্মৃতি সংরক্ষিত হইতে পারে। আশা করি তাঁহার ভক্তগণ এবিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

তারাপুরে উৎসব

বামার স্মৃতি

তারাপুরের পশ্চিমে 'সাতসতীনে-দীঘি' নামে একটি অনতিবৃহৎ জলাশয় আছে, দীঘির উত্তরপাড়ে "চতুরো" নামে একটি ডাঙ্গায় এখনো পরিখা-প্রাকারের বিলুপ্তাবশেষ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। প্রবাদ, তথায় 'চতুরো' নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজা-কে, তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইত্যাদি বিষয় কিছুই জানা যায় নাই।

তারাপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান

তারাপুরের নাতিপূর্ব্বে জয়সিংহপুর নামে একখানি গ্রাম। প্রবাদ, তথায় জয়সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। জয়সিংহপুরের উত্তর-পশ্চিমে, গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে "দাঁড়কের" (ভালকথায় দণ্ডকের) মাঠ নামে এক প্রান্তর—শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যথায় রাজবাড়ী ছিল, এথায় তকটী

জয় সিংহ রাজা

উচ্চ-স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে বহুদূর-বিস্তৃত নিম্নজলাভূমিগুলিকেই লোকে গড়খাইএর চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কতকগুলি জমিতে প্রায় বারমাস জল থাকে। বর্ষায় দেখিতে বিলের মত বোধ হয়। রাজবাটীর নিকটে নির্ণয়কুঁড়ে নামক একটি নীচু জমি দেখাইয়া লোকে বলে ঐ স্থানে নির্ণয়কুণ্ড নামক সরোবর ছিল। ঐ জমি হইতে অনেক ব্যক্তিই অর্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। নিকটেই আর একটি স্থান বাণডাঙ্গা নামে খ্যাত। প্রবাদ তথায় বিশ্বেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। চড়কের সময় "বাণফোঁড়া" হইত, তাই বাণডাঙ্গা নাম। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকস্তূপ মন্দিরের অতীত—অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দাঁড়কের মাঠ দণ্ডেশ্বর রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

দাঁড়কের-মাঠ

এখান হইতে কিয়দ্দূরে মৌরাক্ষী নদীতীরে দাঁড়কা নামক গ্রামে দণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। দাঁড়কার প্রায় কুড়ি ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয়নদের তীরে দণ্ডেশ্বর নামে অপর একস্থানেও দণ্ডেশ্বর শিব বিদ্যমান্ আছেন। মন্দির সন্নিধানে দুইটি পুষ্করিণী আছে। একটির নাম 'গজমাতা' ও অপরটির নাম সন্ন্যাসী পুষ্করিণী। নিকটেই একখানি গ্রাম—নাম বুদ্ধবিহার, সাধারণ-লোকে চলিত কথায় বলে 'বিদবার'। গ্রামের মধ্যে রাজমাতা নামে একটি পুষ্করিণী আছে। মন্দিরের অনতি-পশ্চিমে যে দুইখানি গ্রাম আছে, তাহার একটির নাম রাজহাট, অপরটির নাম রাণীপুর। এই দণ্ডেশ্বরের নাতিদূরে রাজহাট গ্রামের দক্ষিণে, ফুলঝোড় নামক গ্রামপ্রান্তে ফুলেশ্বরী নামে এক দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। আবার দাঁড়কা গ্রামের অনতি-দূরবর্ত্তী ঝলকা নামক গ্রামে ঐরূপ—অনেকটা প্রায় একই প্রকারের দেবী মূর্ত্তি বিদ্যমান্ আছেন। (১১) এইসমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া মনে হয় তারাপুরের পূর্ব্বস্থিত দাঁড়কের মাঠের দণ্ডেশ্বর রাজাই দাঁড়কারও অধিপতি ছিলেন। রাজহাট, রাণীপুর গ্রামের নাম ও সংস্থান দেখিয়া (বলিতে ভুলিয়াছি রাজহাট, রাণীপুর ও দণ্ডেশ্বরকে বেড়িয়া এক বিশাল বিল বা জলাভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের বিলের নাম দণ্ডেশ্বরের বিল। ইহা প্রায় দুই মাইল দূরে গিয়া অজয়ে মিশিয়াছে) এবং রাজমাতা পুষ্করিণীর নাম শুনিয়া মনে হয় অজয়-তীরবর্ত্তী দণ্ডেশ্বরও সেই নৃপতির অধিষ্ঠান-ভূমি ছিল। বুদ্ধবিহার হয় তো বৌদ্ধবিহারের অপভ্রংশ হইবে। দাঁড়কের মাঠে, দাঁড়কায় এবং দণ্ডেশ্বরে তিন স্থানেই শিব-প্রতিষ্ঠিত (দাঁড়কের মাঠের বাণডাঙ্গার শিব এখন জয়সিংহপুরের নিকটবর্ত্তী সাহাপুরগ্রামে আছেন) দেখিয়া—রাজাকে শৈব-ধর্ম্মা-

দাঁড়কা ও দণ্ডেশ্বর

(১১) অজয় তীরবর্ত্তী দণ্ডেশ্বর এখন বর্দ্ধমানজেলায় অন্তর্ভুক্ত।

মাড়ুকের মাঠে প্রাপ্ত মুদ্রার অপর দিক।

নং দাড়কা গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি।

বলশী বলিয়াই মনে হয়। দণ্ডেশ্বরের নিকটেই কিছুদূরে সেনপাহাড়ি, লাউ-সেনের রাজধানী। লাউসেন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, বিহার তাঁহারই প্রতি-ষ্ঠিত হইতে পারে। পরে দণ্ডেশ্বর রাজার অভ্যুদয় হয় এবং তিনি স্বধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারের জন্য বিহারের নিকটেই নিজ নামে শিব-প্রতিষ্ঠা করেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

উপরে জয়সিংহপুরের জয়সিংহ রাজার প্রবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি হয়তো দণ্ডেশ্বর রাজার বংশধর হইতে পারেন। আমরা এই জয়সিংহ-নৃপকে সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম-চরিতের "সিংহ ইতি দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুতপ্রভা-বাকর কমলযুগল তুলিতোৎকলেশ কর্ণকেশরী সরিদ্বল্লভকুম্ভসম্ভবোজয়সিংহ" বলিয়া মনে করি। এই জয়সিংহই কৈবর্ত্তপতি দিব্বোকের বিরুদ্ধে পালবংশীয় গৌড়েশ্বর রামপালকে সৈন্য-সাহায্য দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ঐতিহা-সিকগণ মেদিনীপুর জেলার দাঁতনকে প্রাচীন দণ্ডভুক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হইতে পারে দণ্ডভুক্তির সীমা উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পর কেশরী বর্ম্মা রাজেন্দ্র চোলের সহিত যুদ্ধে দণ্ডভুক্তি-পতি ধর্ম্মপাল নিহত হইলে (১০২৪ খৃঃ) হয়তো সিংহ উপাধিধারী কেহ আসিয়া এতদঞ্চলে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, রাজেন্দ্র চোল, গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণদেব এবং চালুক্য-রাজ বিক্রামাদিত্য প্রভৃতি বৈদেশিক রাজগণের আক্রমণে গৌড়েশ্বর পালরাজগণ ও বঙ্গেশ্বর বর্ম্ম-রাজগণ প্রতি নিয়তই যেরূপ ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাতে তাঁহাদের সামন্তরাজরূপে এইরূপ একটি রাজ্যস্থাপন—কোনো বাহুবলসম্পন্ন সুচতুর ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কষ্টকর ছিল না। অথবা দণ্ডভুক্তির প্রাচীন সীমা রাঢ়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহারই উত্তরাধিকারী সিংহবংশীয় কেহ দণ্ডভুক্তি ত্যাগ করিয়া এই অঞ্চলেই দণ্ডভুক্তির রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ সম্বন্ধে সন্দেহ

তারাপুরের নিকটবর্ত্তী কড়কড়িয়া গ্রামে একটি রৌপ্য মুদ্রা পওয়াগিয়াছে। (১২) মুদ্রার এক পৃষ্ঠে বাঙ্গালা অক্ষরে "শ্রীশ্রীহরগৌরী পদ পরস্য" ও অপর পৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীগৌরীনাথ সিংহ নৃপস্য" এই কথা কয়টি ক্ষোদিত আছে। এই গৌরীনাথ সিংহের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। জয়সিংহ, বা দণ্ডেশ্বর নৃপতির সঙ্গে ইহাঁর কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না, জয়সিংহ বা দণ্ডেশ্বর বা তদ্বংশীয়গণের মুদ্রা মুদ্রণের কোনো অধিকার ছিল কিনা, এ সমস্ত তথ্যই

কড়কড়িয়ার রৌপ্য-মুদ্রা

(১২) কড়কড়িয়া গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত কুড়ারাম রায় মহাশয়ের নিকট এই মুদ্রাটি আছে। তিনি ইহার ফটো লইতে দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, এজন্য আমার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বিস্মৃতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাম-চরিতে ঢেকরিয়রাজ-প্রতাপসিংহ ও ভাস্কর-পতি-ময়গলসিংহ নরপতির নাম পাওয়া যায়। একই সময়ে এতগুলি সিংহ, পরস্পর কোনো সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। দণ্ডভুক্তির নাম যদি দাঁতন হইতে পারে, তবে আমাদের বীরভূম জেলার দাঁতন-দীঘি,— (দুবরাজপুরের অনতি পশ্চিমস্থিত এক প্রকাণ্ড জলাশয়; দাঁতন-দীঘির নিকটে যেমন দুবরাজপুর, তেমনি আবার দণ্ডেশ্বরের নিকট এক দুবরাজপুর আছে) তাহারও তো দণ্ডভুক্তির সহিত কোনো সম্বন্ধ থাকা উচিত! তারাপুরের দাঁড়কের মাঠে বিন্ধেশ্বর শিব, আবার দণ্ডেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বিদ্‌বার গ্রাম, দণ্ডেশ্বরের ফুল-ঝোড়, দাঁড়কার ঝলকা, উভয় স্থানের শিব, প্রায় একই রকমের দেবী মূর্ত্তি, আর দুই দুইটি দণ্ডেশ্বর—সমস্ত গুলিই সন্দেহজনক। বিদবার সাধু-ভাষায় বুদ্ধবিহার হইতে পারে, এ দিকে বিন্ধ্যেশ্বর যে বুদ্ধেশ্বর ছিলেন না, আর পূর্ব্বে তথায় শিব মূর্ত্তি কি বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, বুদ্ধ বিহার বিন্ধা(!) বিহার ছিল কিনা, তাহাই বা কে বলিবে? মোটের উপর এই নাম—রূপে-সাদৃশ্যগুলি বড়ই জটীল, ইহার মধ্য হইতে তত্ত্ব-নিরূপণও দেখিতেছি অত্যন্ত শক্ত। কাহিনী অনেক শুনিয়াছি, কয়েকটি লিপিবদ্ধও করিয়াছি, কিন্তু এমন হাঙ্গামায় ইতিপূর্ব্বে পড়ি নাই। এই কাহিনীর মধ্য হইতে যোগসূত্র খুঁজিয়া, টানিয়া-বুনিয়া জোড় মিলাইতে কল্পনাও হারি মানিয়া যায়। অতএব কাহিনীর উপরে কাহিনী-রচনা করিতে নিরস্ত হইতেছি।

দণ্ডভুক্তি ও বীরভূমি

তারাপুরের সূর্য্য-মূর্ত্তিটি বোধ হয় কোনো সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছিল। কারণ এ অঞ্চলে ওরূপ মূর্ত্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ রকমের মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। সূর্য্যের পার্শ্বে পৃথক্ যে মূর্ত্তিটি রহিয়াছে, পাণ্ডারা তাহাকে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দান করেন। গঠন প্রণালী দেখিয়া এ মূর্ত্তিটিও পশ্চিমাঞ্চলের বলিয়া অনুমিত হয়। দাঁড়কার মূর্ত্তিটি অপরিচিত। ঝলকা ও ফুলঝোড়ের—"শুষ্ক মাংসাস্তি ভৈরবা" মূর্ত্তি দুইটি যে শক্তি-মূর্ত্তি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। দুইটি মূর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। ১ম হাতের সংখ্যা লইয়া, ঝলকার মূর্ত্তিটি দশভুজা, ফুলঝোড়ের মূর্ত্তিটি অষ্টভুজা। ঝলকার মূর্ত্তির মাথায় সাপের মুকুট; মূর্ত্তিটি একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। হস্তের অস্ত্র-নিচয় এবং অস্ত্র ধরিবার ভঙ্গীও সম্পূর্ণ পৃথক্। মাত্র তরবারী দুইটি দেখিলেই অস্ত্রের প্রকৃতি-ভেদ বুঝিতে পারা যাইবে। ফুলেঝোড়ের মূর্ত্তির বাম-হস্তে

তারাপুর প্রভৃতি স্থানের বহুবিধ দেবমূর্ত্তি

২ নং ঝলকা গ্রামের দশভুজা-মূর্ত্তি
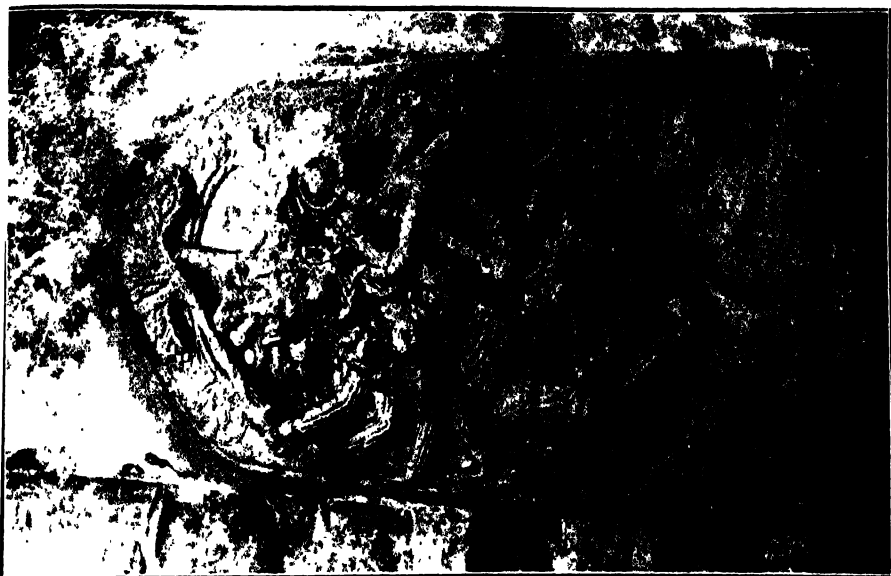
৫৩ নং গর্ভবাসে নিত্যানন্দ প্রভুর সূতিকা-গৃহ।

পাশ-অস্ত্রের সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান্ রহিয়াছে। চতু-র্বিংশতি প্রকার চামুণ্ডার মধ্যে এই দুইটি দুই রকমের চামুণ্ডার মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। মার্ক-ণ্ডেয়-চণ্ডীতে

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসি-পাশিনী
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা
দ্বিপীচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা
অতি বিস্তার বদনা জিহ্বাললন ভীষণা
নিমগ্না রক্ত-নয়না নাদা-পুরিত দিঙ্ মুখাঃ"

চণ্ডীর-চামুণ্ডার ধ্যান

চামুণ্ডার ধ্যান পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব অসি, পাশ ও খট্বাঙ্গ। ভুজ সংখ্যার উল্লেখ নাই। প্রাগুক্ত মূর্ত্তি দুইটির এই ধ্যানের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কালিকা-পুরাণে (৬১ অধ্যায়) "নীলোৎপলদল শ্যামা চতুর্ব্বাহু সমন্বিতা" চামুণ্ডার উল্লেখ আছে। ইনিও মুণ্ডমালাভূষিতা, কৃশোদরী, দীর্ঘ দংষ্ট্রা, নিম্ন রক্তনয়না, আরাব-ভৈরবা, বিস্তার শ্রবণাননা এবং ভীষণা। চন্দ্র-হাস, খট্বাঙ্গ, চর্ম্ম ও পাশ ইঁহার অস্ত্র। ইঁহার সঙ্গে ভুজ সংখ্যায় মিল না হইলেও অপরাপর বিষয়ে যেন ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। ফুলঝোড়ের মূর্ত্তিটি ফুলেশ্বরী-দেবী নামে পরিচিতা। ঝলকার মূর্ত্তিটি একটি শিব-মন্দিরের একপার্শ্বে কোনো রকমে দুই একটি বিল্বপত্র প্রাপ্ত হয়। সাধারণে এ মূর্ত্তির নাম কেহ জানে না, মূর্ত্তির বিষয়ে কিছুই বলিতে পারে না। কিন্তু একদিন ছিল—দেশে যখন ধর্ম্ম ছিল, সমাজ ছিল, জাতির সজীবতা ছিল, তালপাতার খাঁড়া গড়িয়া দেবতার হাতে দিয়া অনুকল্প করিতে হইত না, তখন মানুষ এ মূর্ত্তির রহস্য বুঝিত, মর্ম্মাবধারণ করিত, পূজা জানিত। জীবন্ত জাতি আপনার প্রাণ দিয়া জড়বস্তুকেও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে পারিত, তাই পাথরের মূর্ত্তি হইতে তখন ভাবের সাড়া মিলিত, বিভূতির উপলব্ধি হইত, তখন মানুষ এ ভৈরবভাব ধ্যানে বরণ করিয়া লইত, ধারণায় ধরিয়া রাখিতে তাহার সাহসে কুলাইত। আজি আর সে দিন নাই, সে মানুষ নাই, তাই পাথরের মূর্ত্তি এখন শুধু পাথর হইয়া আছে।

ঝলকা ও ফুলঝোড়ে চামুণ্ডামূর্ত্তি

একচক্রা-কাহিনী

বীরভূমির নয়নানন্দ-নন্দন মধুরাবদান শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ। অক্রোধ-পরমানন্দ-প্রেমোদ্দাম ধর্ম্মবীর, করুণাময় শ্রীমন্নিত্যানন্দ। বীরভূমির পুণ্যভূমি একচক্রা তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। বীরভূমের প্রধান নগর সিউড়ি হইতে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত, অতীতের সেই বিভবৈশ্বর্য্যে-গৌরবময়ী নগরী, এখন খলৎপুর বা গর্ভবাস, বীরচন্দ্রপুর, ডবাক বা ডাবুক, মৌড়েশ্বর, কোটাসুর, অসুরালয় বা অসুর্লা প্রভৃতি কয়েকখানি অনতিবৃহৎ গ্রামের সমষ্টি মাত্র। প্রবাদ—মৌরাক্ষী-নদীর উত্তর-তীর হইতে রামপুরহাট-মহকুমার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামের সীমান্তস্থিত বিল পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে প্রায় দশ ক্রোশ; এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ষ্টেশন মল্লারপুরের পশ্চিমস্থ শিবপাহাড়ী নামক পাহাড় হইতে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমেও প্রায় দশ ক্রোশ, প্রাচীন একচক্রার এই বিপুলায়তন স্থান-সংস্থান, দর্শকের হৃদয়ে বিস্ময়োৎপাদন করিত। এতদঞ্চলের জনসাধারণের বিশ্বাস, এই 'একচক্রাই' সেই 'ভারত'-খ্যাত পুণ্যভূমি;—যথায় মানবী-দেবী কুন্তির অমানুষী করুণা-স্বর্গের দেবতাকেও বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল! যথায়—এক সামান্য ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বিপদে ব্যথিতা হইয়া করুণাময়ী রাজ-জননী আপনার জীবনাধিক পুত্রকে রাক্ষসের মুখে সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিতা হন নাই! কিন্তু জতুগৃহদাহের পর মাতৃসহ পঞ্চ-পাণ্ডব যে এই একচক্রাতে আসিয়াই বাস করিয়াছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ কি,—জনসাধারণ তাহা বলিতে পারেন না। তাঁহারা 'পাণ্ডবতলা' নামক এক ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকে নির্দ্দেশ করিয়া একচক্রায় পাণ্ডবাবাসের প্রমাণস্বরূপ তাহারই উল্লেখ করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দিকে ধান্যক্ষেত্র, মধ্যে নিম্ব, গুলুঞ্চাদি বৃক্ষ সমাকীর্ণ ন্যূনাধিক দশ কাঠা-পরিমিত স্থান 'পাণ্ডবতলা'! এতদ্ভিন্ন 'কোটাসুর' বা 'অসুরকোট্' এবং অসুর্লা বা অসুরালয়, বক-রাক্ষসের আবাসভূমি বলিয়া উল্লিখিত হয়। প্রাচীনগণ বলেন—'রাক্ষস' এবং অসুর' প্রায় এক পর্য্যায়-ভুক্ত বলিয়া সাধারণ লোকে "কোটাসুর প্রভৃতি নামের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছে। অসুর্লায় একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ এবং কোটাসুরে মদনেশ্বর-শিবলিঙ্গ, কয়েকটি বাসুদেব-মূর্ত্তি ও মৃত্তিকানিয়ে প্রোথিত বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টক খণ্ড মাত্র তত্তৎস্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোটাসুরের

একচক্রার বর্ত্তমান বিভাগ

প্রাচীন সীমা

মহাভারতের একচক্রা

পাণ্ডবতলা

রাক্ষস ও অসুর

সুবিপুল পরিখা-প্রাকারের শেষচিহ্ন সমূহও দর্শনযোগ্য। (১) কোটাসুরে মদনেশ্বর-মন্দির হইতে অদূরে পতিত অনতিবৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ড অসুরের "হাড়" বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় হইতে প্রমাণিত হয় না যে, এই একচক্রাই সেই মহাভারতোল্লিখিত একচক্রা। মহাভারতে একচক্রার কোনো ভৌগোলিক সংস্থান নির্দ্দেশিত হয় নাই। কথিত আছে "বারণাবত" নগরে জতুগৃহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটনের পর পলায়িত পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে 'একচক্রায়' আসিয়া উপস্থিত হন। কৌরব-রাজধানী 'হস্তিনার' অদূরেই এই বারণাবত নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বারণাবত হইতে ভাগীরথী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়া পাণ্ডবগণ 'হিড়িম্ববনে' প্রবেশ করেন। তাপস-বেশ ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইয়া "ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, মৎস্য, কীচক" প্রভৃতি দেশের মধ্যবর্ত্তী আরণ্য-প্রদেশে পর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশে তাঁহারা "একচক্রা" নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। (২) কোষকার হেমচন্দ্রের মতে (লাহোরের অন্তর্গত) জালন্ধরের অপর নাম 'ত্রিগর্ত্ত'। পূর্ব্বকালে—বর্ত্তমান শাহাবাদ অঞ্চল 'উত্তর পাঞ্চাল' এবং বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল 'দক্ষিণ পাঞ্চাল' নামে অভিহিত হইত, অনেকেই এইরূপ অনুমান করেন। প্রাচীন 'মৎস্যদেশ' (বিরাট) বোধ হয় বর্ত্তমান (রাজপুতানা) জয়পুররাজ্য। 'কীচক' (বিরাট-শ্যালকের নামানুসারে) মৎস্যদেশের নিকটবর্ত্তী কোনো স্থান হইতে পারে। ঐতিহাসিকগণের এই সমস্ত অনুমান সঙ্গত হইলে—'একচক্রা' যে ঐ ঐ রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী বনানী—সীমান্তস্থিত কোনো স্থানে অবস্থিত ছিল, ইহাই অনুমিত হয়। (৩) একচক্রার অদূরবর্ত্তী

মহাভারতের একচক্রার স্থান নির্ণয়

(১) (পাটনা, বাঁকীপুর) কুমরাহারে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ হইতে যে সমস্ত ইষ্টকখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোটাসুরের ইষ্টকগুলির আকৃতি ও গঠন ঠিক সেই রকমের। ইষ্টকগুলি বহু পুরাতন বলিয়া মনে হয়।

(২) মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৫৩ অধ্যায়।

(৩) পাণ্ডবগণের একচক্রা হইতে পাঞ্চাল-যাত্রা-পথের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—একচক্রা হইতে তাঁহারা উত্তরাভিমুখে গমন করেন এবং দিবারাত্রি মধ্যে 'সোমাশ্রয়ণ' নামক তীর্থে উপস্থিত হন। এই তীর্থ গঙ্গাতীরে ছিল। তৎপরে পাণ্ডবগণ গঙ্গা ও রাকী নদীর মধ্যে অঙ্গারপর্ণ বন পার হইয়া 'উৎকোচকতীর্থে' ধৌম্যের আশ্রমে গিয়া ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। তথা হইতে ধৌম্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা দক্ষিণপাঞ্চালে দ্রুপদের রাজধানীতে উপস্থিত হন। (আদিপর্ব্ব—১৭০—১৮৩ অধ্যায়) উদ্ধৃত বিবরণী হইতেও একচক্রার ভৌগোলিক সংস্থান নিরূপণে বিশেষ কোনো সহায়তা পাওয়া যায় না। অগত্যা অনুমান করিতে হয় যে, একচক্রা ঐ ত্রিগর্ত্ত পাঞ্চাল মৎস্য কীচকের সন্নিহিত কোনো স্থানেই অবস্থিত ছিল।

"বেত্রকীয় গৃহ" নামক স্থানে এক রাজা বাস করিতেন ; মহাভারতে সেই 'বুদ্ধিহীন নীতি-অজ্ঞ" রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই। সেই সময় নগরের 'অতিদূরে'—'বক' নামে এক রাক্ষস বাস করিত। (মহাভারতে এই রাক্ষসের কাহিনী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (৪)) প্রকৃতপক্ষে বক-রাক্ষসই তখন একচক্রা ও বেত্রকীয় গৃহ প্রভৃতি স্থানের অধীশ্বর ছিল। স্থানীয় গৃহস্থগণের বাড়ী হইতে পঞ্চক (পালা) অনুসারে এই রাক্ষস আপন আহার্য্য গ্রহণ করিত। রাক্ষসের আহার্য্য ছিল প্রত্যহ "দুইটা মহিষ, কুড়ি খারী চাউল, (বৈদ্যক পরিভাষা মতে পাঁচশত বার সেরে এক খারী কুড়ি খারী অর্থাৎ দুইশত ছাপ্পান্ন মণ চাউল) এবং একটা মানুষ" ! ! ! একচক্রার গৃহস্থগণ এক এক দিন এক এক জন এই আহার্য্য সরবরাহ করিতেন। একদিন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এই পঞ্চক পড়িয়াছে ; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী এবং তাঁহাদের এক পুত্র ও এক কন্যা, চারিজনের মধ্যে কে রাক্ষসের মুখে প্রাণ দিতে যাইবেন, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা যখন ক্রন্দন করিতেছিলেন, সেই সময়, জীবন-মরণের সেই মহাসমস্যায়—মূর্ত্তিমতী দয়ারূপিনী কুন্তিদেবী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপনীত হন, এবং রাক্ষসের মুখে আপনার পুত্র-দান করিয়া আর্ত্তকে আসন্ন-বিপদ হইতে রক্ষা করেন। দানের এই মহিমান্বিত গৌরবে মণ্ডিত হইয়া 'একচক্রার' নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই বিভিন্নকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী নর-নারী আপন আপন জন্মভূমির নামে এই গৌরবের দাবী করিয়াছে। হইতে পারে বক—পাণ্ডব সম্বন্ধীয় একইরূপ প্রবাদ এইরূপে নানাস্থানের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। (৫) কিন্তু বীরভূমির একচক্রা এ গৌরবে বঞ্চিত হইলেও

একচক্রার মহা-ভারতীয় কাহিনী

(৪) আদিপর্ব্ব ১৫৭—১৬৪ অধ্যায়।

(৫) বীরভূমে "নলহাটী-আজিমগঞ্জ রেলওয়ে"র লোহাপুর ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল উত্তরে 'বারা' নামক গ্রামে 'বক' রাক্ষসের প্রবাদ প্রচলিত আছে। গ্রামের লোকে 'রাক্ষসডাঙ্গা' নামে একটি অনতিবৃহৎ প্রান্তর দেখাইয়া বলে যে এই স্থানেই 'বক-রাক্ষস' বাস করিত। অনেকে এই প্রবাদের সমর্থন করিয়া 'একচক্রার' অন্তর্গত 'কোটাসুর'কে বলে 'বেত্রকীয় গৃহ'। 'বারা' গ্রামে আজিও 'বকের পঞ্চক'-সম্বন্ধীয় প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

মেদিনীপুর জেলায় প্রবাদ (মেদিনীপুর) 'বগড়ী' নামক স্থানে বক-রাক্ষসের বাড়ী ছিল। শুনিয়াছি তথায় নাকি 'গড়বেতা অঞ্চলে বকের হাড় আছে। অনেকে অনুমান করেন—বিহারে আরা জেলায় প্রাচীন (মহাভারতীয়) একচক্রা অবস্থিত ছিল।

বীরভূমে পাণ্ডবাগমন-সম্বন্ধীয় প্রবাদের অভাব নাই। "অণ্ডাল সাঁইথিয়া" রেলপথে "পাণ্ডবেশ্বর নামে একটি ষ্টেশন আছে। ষ্টেশনের অদূরেই যুধিষ্ঠিরের কুণ্ডীবাদ প্রভৃতি কয়েকটি নিদর্শন

তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে না। কারণ তাহার পুত্র-দান কাহিনীও মহিমাময়! এই একচক্রার হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র বালক নিত্যানন্দকে এক অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসীর প্রার্থনায়, তাহার করে চিরতরে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অতুলনীয় দান বঙ্গের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে, বীরভূমিকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

বীরভূমির একচক্রার দান

প্রবাদ-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একচক্রার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, কুলগ্রন্থাদি পাঠে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা হইতে অনুমিত হয়, যে বর্ত্তমানকাল হইতে ন্যূনাধিক প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহার নাম বহু বিশ্রুত ছিল। পঞ্চাননের কুলকারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে—

কুলপঞ্জিকায় বীরভূমির একচক্রা

"* * * সোম ঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ।
পুত্রান্তে অরবিন্দাখ্য পৌত্রানাং দ্বয়মেবচ।
আদিত্যশূর নৃবরৈঃ দত্তান্তে বাসমুত্তমং।
জয়জানো নাম গ্রামো বাসার্থেন দদৌ নৃপঃ।
ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশ শতানিচ।
সামন্তরাস্বরূপেণ একচক্রাবধিং দদৌ।
পঞ্চদশ সহস্রানাং স্বর্ণমুদ্রাং প্রযচ্ছতে।
পুত্রপৌত্রাদি ভোগেন মমাজ্ঞয়া অধীশ্বরঃ।"

বিদ্যমান্। "দ্রৌপদীশ্বর"ও আছেন। নিকটেই ভীমগড়া নামক গ্রাম। 'ভীমগড়ে' পরিখা-প্রাচীরের চিহ্ন ও পাওয়া যায়। প্রবাদ, পাণ্ডবগণ তথায় কিয়দ্দিন বাস করিয়াছিলেন। জতুগৃহ দাহের পর যে অজ্ঞাতবাস, সে সময় জননী কুন্তিদেবী সঙ্গে ছিলেন। আর পাশায় হারিয়া যে বনবাস—তাহার সঙ্গিনী ছিলেন দ্রুপদনন্দিনী। সুতরাং একই স্থানে "কুন্তীশ্বর" ও "দ্রৌপদীশ্বর" দেখিয়া সময়ে সময়ে সন্দেহ হয় যে, পাণ্ডাগণ হয়তো মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। তবে যদি অনুমান করা যায় যে—পাশায় হারিয়া বনবাসকালে পাণ্ডবগণ তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত স্থান গুলি প্রিয়তমা পত্নীকে দেখাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিবার কিছু থাকে না বটে। যাহা হউক এই সমস্ত প্রবাদপরম্পরা আলোচনা করিলে মনে হয়, এদেশ যে "পাণ্ডব বর্জ্জিত" ছিল না ইহা সপ্রমাণ করাই হয়তো উপরোক্ত প্রবাদগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে (মহাভারত সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়) অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থ-যাত্রা-বিবরণে (বনপর্ব্বে ১১৩ অধ্যায়) সাগর সঙ্গমের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পাণ্ডবগণ এদেশে আসিয়াছিলেন, এবং এইরূপ কোনো ঘটনার স্মৃতি লইয়া এতদঞ্চলে পাণ্ডবাগমন-সম্বন্ধীয় প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। পরে আর-সাদৃশ্যে 'একচক্রা' প্রভৃতি স্থানের সহিত জড়িত প্রবাদগুলি নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

কুলকারিকার মতে ৮০৪শকে ফাল্গুনমাসে নৃপবর আদিত্যশূরের সভায় এই সোম ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থের শুভাগমন হয়। ৮০৪ শক খৃষ্টাব্দ ৮৮২, সুতরাং সে আজ ১০৩৩ বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী। যজ্ঞানে (মুর্শিদাবাদ জেলা) আজিও সোমেশ্বর-শিবলিঙ্গ, সর্ব্বমঙ্গলা-দেবী এবং গঙ্গাতীরস্থ সোমপাড়া গ্রাম (ঘোষজার গঙ্গাবাসের বাটী) সোম ঘোষের অস্তিত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। "রাঢ়ীয় শাকল দীপিকা" নামক অপর একখানি কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

কুলপঞ্জিকার একচক্রা

"পৃথু র্নৃসিংহো বিষ্ণুশ্চ-লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
কেশবো কৃত্তিবাসশ্চ নারায়ণ নরোত্তমৌ।
দণ্ডপানি র্মহানন্দঃ গৌড়দেশে সমাগতাঃ"।

ইহাদের মধ্যে পৃথুর উপাধি ছিল 'বৃহজ্জ্যোষী', নৃসিংহের 'কাশপটী' ও লোকনাথের 'আচার্য্য'। কৃষ্ণনান্দ রচিত গ্রহ-বিপ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে অবগত হওয়া যায়—'পৃথু বৃহজ্জ্যোষী কোট মৌড়েশ্বরে', 'নৃসিংহ কাশপটী ময়ূরভঞ্জপুরে', এবং 'লোকনাথ আচার্য্য মধ্যরাঢ়ে' আসিয়া বাস করেন। গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা তাঁহাদের রাঢীয়-সমাজের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

কুলপঞ্জিকার কোট মৌড়েশ্বর

"গঙ্গার পশ্চিমভাগে বালিগ্রাম সীমে,
আশিক্রোশ মৌড়েশ্বর তাহার পশ্চিমে"॥

কুলাচার্য্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে রাঢ়ে গ্রহবিপ্রাগমন অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। মৌড়েশ্বরে তখন 'কোট্' অর্থাৎ প্রাচীর পরিখাদি পরিবেষ্টিত 'দুর্গ' ছিল।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চক্রপাণি দত্তের জন্মস্থান মৌড়েশ্বর। মৌড়েশ্বরের দত্ত-বংশের একসময় যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল (৬) স্থানীয় লোকের নিকট শুনিয়াছি, মুসলমান-বিপ্লবে জাতিনাশের ভয়ে দত্তগণ মৌড়েশ্বর ত্যাগ করেন। এই ঘটনা প্রায় বর্গীর হাঙ্গমার সম-সাময়িক বলিয়া কথিত হয়। সেই অবধি মৌড়েশ্বরে দত্তবংশের অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পাইয়াছে। চক্রপাণি দত্তের পিতার নাম নারায়ণ, জ্যেষ্ঠের নাম ভানু। (৭) তাঁহার অধ্যাপকের নাম মহাকবি নয়দত্ত। 'নিদানের' মাধবকর চক্রপাণির সম-সাময়িক। চক্রপাণি

মৌড়েশ্বরের চক্রপাণি দত্ত

(৬) প্রবাদ অনুসারে ইহারা বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত। চক্রপাণি দত্তের জাতি বিচার লইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশে বিরত থাকিলাম।

(৭) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গলার ইতিহাসে (২৩৩ পৃঃ) "বৈদ্য-গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্ত নয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চক্রপাণির প্রণীত পুস্তক-বলী

প্রণীত 'চক্রদত্ত' ও 'দ্রব্যগুণ' আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলরত্ন। এতদ্ভিন্ন তিনি সর্ব্বসার সংগ্রহ, শব্দচন্দ্রিকা অভিধান এবং চরক ও শুশ্রুতের টীকা প্রণয়ন করেন। চক্রপাণি আপনার পিতা নারায়ণকে গৌড়েশ্বরের 'রসবত্যধিকারীপাত্র' অর্থাৎ খাদ্য-পরীক্ষক অমাত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (৮) এমন একদিন ছিল, যখন গৌড়ের সম্রাট্ও বীরভূমিকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। বীরভূমবাসীকে অতি বড় বিশ্বস্ত কর্ম্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিতেন। চক্রদত্ত ও দ্রব্যগুণের টীকাকার শিবদাস সেন তৎসাময়িক গৌড়পতিকে, 'নয়পাল' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে নরপতি নয়পাল ১০২৫ খৃঃ অঃ গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেকের অনুমান, তিনি প্রায় বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রায় সার্দ্ধ-অষ্টশত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত চক্র-পাণি দত্ত বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার মহিমময়ী মাতৃভূমি বীরভূমির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। নয়পালের রাজত্বের পঞ্চদশবর্ষে গয়ার বিষ্ণুপদ-মন্দিরে শূদ্রক-পুত্র বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক নৃসিংহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে শিলা-প্রশস্তি রচিত হয় তাহার রচয়িতার নাম বৈদ্য শ্রীবজ্রপাণি; তৎপরে ২য় বিগ্রহ-পালের রাজত্বকালে বিশ্বরূপ গয়ায় আর একটি মন্দির-প্রতিষ্ঠা করেন, তদুপলক্ষে বৈদ্য শ্রীধর্ম্মপাণি তাহার প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন ('রাজন্য-কাণ্ড ১৮৮ পৃঃ।) বজ্রপাণির ও ধর্ম্মপাণি সহিত চক্রপাণির কোনো সম্বন্ধ ছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। চক্রপাণি আপনার জ্যেষ্ঠের নাম উল্লেখ করিয়াছেন 'ভানুদত্ত"। ভানুদত্তের অপর নাম বজ্রপাণি ছিল কিনা কে বলিবে? (৯)

প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় মৌড়েশ্বরে মুকুটরায় নামে একজন রাজা ছিলেন। (১০) পণ্ডিত বলিয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। অনেকেই বলেন ইহারই কন্যা

কিন্তু চক্রদত্তে চক্রপাণি তাঁহার পিতাকে গৌড়েশ্বরের রসবত্যধিকারি পাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নারায়নই নয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন।

(৮) চক্রদত্তের টীকা।

(৯) কেহ কেহ বলেন মুকুটরায়ের নাম হইতেই মুকুটেশ্বর অপভ্রংশে মৌড়েশ্বর নাম হই-য়াছে। কিন্তু মৌড়েশ্বর নাম যে অত্যন্ত পুরাতন চক্রপাণি দত্তের পরিচয়েই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মৌর্য্যের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা জানিবার উপায় নাই।

(১০) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন জনার্দ্দন-মন্দিরের প্রশস্তি-রচয়িতার নাম "বাগ্মী বৈদ্য মহদেব"। (বাঙ্গালার ইতিহাস ১৩৩ পৃঃ)।

পদ্মাবতীর সঙ্গে হাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ হইয়াছিল। মুকুট রায় পাণ্ডিত্যের সম্মান বুঝিতেন, তাই দরিদ্র হাড়াই পণ্ডিতকে কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মণবড়াগ্রামনিবাসী পণ্ডিত নিমাইচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের নিকট শুনিয়াছি তিনি পঠদ্দশায় 'কিরাতার্জ্জুনীয়ের রায়মুকুট প্রণীত হাতের লেখা টীকা পাঠ করিয়াছিলেন। রায়মুকুটের 'অমরকোষ অভিধানের' টীকাও তিনি দেখিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ বলেন "উক্ত টীকায় রায়মুকুটের আত্ম-পরিচয়ে 'মৌড়েশ্বর বাড়ি, কন্যাগতকুল, এবং দীর্ঘিকা দানের' কথা উল্লিখিত আছে, ইহাও তাহার স্মরণ হয়"। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও রায়মুকুটের ভারবীর টীকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 'বিশ্বকোষে' উল্লিখিত আছে—"রায়মুকুট,—জনৈক প্রসিদ্ধ টীকাকার। তিনি "পদচন্দ্রিকা" নামে অমর কোষের প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৩ শক) তিনি বিদ্যমান্ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার নাম 'বৃহস্পতি' রাখেন। 'রায়মুকুট-পদ্ধতি' নামে তাঁহার রচিত একখানি স্মৃতি-গ্রন্থও পাওয়া যায়। রঘুনন্দন-শ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গৌনকুলীন হইলেও অমর-কোষ টীকায় আপনাকে কুলীনাগ্রণী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন"। (বিশ্বকোষ 'র', রায়রি শব্দ ৫৫৬পৃঃ) বর্ত্তমান ১৮৪২ শকাব্দা হইতে ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। রায়-মুকুট বর্ত্তমান ছিলেন ৪৮৭ বৎসর পূর্ব্বে। সুতরাং হাড়াই পণ্ডিতকে রায়-মুকুটের সম-সাময়িক ধরিয়া লইলেও বিশেষ কিছু অন্যায় করা হয় না। কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণ যখন কিছু পাওয়া যাইতেছে না তখন এ বিষয়ের আলোচনা করা বৃথা। কোট মৌড়েশ্বরের ধ্বংসস্তূপ আজিও তাহার অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। এতদঞ্চলে 'কুলু' জাতির একটি শ্রেণী "মৌড়েশ্বরী থাক্" নামে পরিচিত। (১১) গ্রহবিপ্র ও বৈদ্যজাতির মৌড়েশ্বর পূর্ব্বসমাজ। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, সেকালে মৌড়েশ্বরের সামাজিক সম্মানও বড় কম ছিল না।

কোটাসুরে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে পূর্ব্বকাল 'দুর্দ্দম সেন' নামে কোনো রাজা-কোটাসুরে রাজত্ব করিতেন। কোটাসুরের নাম ছিল তখন 'দুর্জ্জয় কোট'। অনপত্য দুর্দ্দমসেন 'মদনেশ্বর' শিবের আরাধনা করিয়া এক পুত্র লাভ করেন, তার নাম রাখেন 'মদনদাস'। দুর্দ্দমসেনের পরলোকগমনের পর মদনের রাজত্ব-

(১১) কলুজাতির মধ্যে ইহারা কুলীন বলিয়া বিখ্যাত। বীরভূমে মৌড়েশ্বরী থাকের—কলুজাতি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

কালে রাজ্যমধ্যে দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। জনপ্রবাদ,—এই বিপ্লবের অধিনায়ককে 'বক-রাক্ষস' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কোটাসুর দেখিলেই অত্যন্ত প্রাচীন স্থান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কোটাসুরবাসী গ্রামের কোনো তথ্যই অবগত নহেন। কোটাসুর এবং অর্জ্জুনার ধ্বংসস্তূপ হয়তো ইহার কিছু সদুত্তর দিতে পারিত।

একচক্রার গৌরব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ। একচক্রায় 'যমুনানাম্নী' একটি ক্ষুদ্র সরিৎ প্রবাহিত রহিয়াছে। যমুনার এক পার্শ্বে 'বীরচন্দ্রপুর' ও অপর পার্শ্বে 'গর্ভবাস' নামে গ্রাম। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থানই একচক্রা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র প্রভু বীরচন্দ্রপুর গ্রামখানির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ যেখানে জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থানই গর্ভবাস নামে খ্যাত। গর্ভবাসেই হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী ছিল। গর্ভবাসের পূর্ব্বনাম ছিল খলৎপুর। একটি ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষকে গোস্বামীগণ, হাড়াই পণ্ডিতের আবাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একটি জীর্ণ ইষ্টকালয় ও কতকটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থান শ্রীনিত্যানন্দের সূতিকা-গৃহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী। (১২) বিদ্যাবত্তার জন্য হাড়াই, 'ওঝা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কতকাল হইতে খলৎপুরে তাঁহাদের বাস, অবগত হইবার উপায় নাই। ইঁহারা রাঢ়ীয়-সমাজের সিন্দুরামল্ল গ্রামীন (গাঞী) সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ। উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। কুলাচার্য্যগণ বলেন—

"কশ্চিৎ বড়ালঃ কশ্চিৎ সিন্দুরামল্ল বন্দ্যঃ ইতি দ্বিধাতো বীরভদ্রী সংকেতঃ"।

নিত্যানন্দের পূর্ব্বপরিচয়

(১২) প্রেমবিলাসে হাড়াই পণ্ডিতের বংশ বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

নারায়ণ ভট্ট শাণ্ডিল্যগোত্র চতুর্ব্বেদী হন।
তাঁর পুত্র-আদি বরাহ জানে সর্ব্বজন।
তাঁর পুত্র বৈনতেয় সুবুদ্ধি তাঁর তনয়।
সুবুদ্ধির বিবুধেশ তাঁর পুত্র গুহ হয়।
গুহের পুত্র গঙ্গাধর তাঁর তনয় সুহাস।
তাঁর পুত্র শকুনি যাঁর সর্ব্ব শাস্ত্রাভ্যাস।
তাঁর পুত্র মহেশ্বর হইল কুলীন।
তাঁর পুত্র মহাদেব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
মহাদেবের পুত্র তিন্থু তাঁর পুত্র মেজুর।
মেজুরের বড়পুত্র পণ্ডিত-প্রবর।

নিতাই তনয় বীরভদ্র নাম তার।
স্বনামে হইল তার ভাবের সঞ্চার॥
সিন্দুরামল্ল গাঞী আছিল নিতাই।
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঞী॥
বংশগাঞী হ'লে করি কুলে অপচয়।
উদাসীন হ'লে কভু জাতি নহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে বীর সংকেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রটনা করিল॥"

(কুল-কল্পতরু)

কুলপরিচয়

অবধৌত নাহি ছিল জাতির কথাটি।
হরিবোল দেয় কোল এই পরিপাটী॥
মহাপুরুষের কার্য্যদোষ বলা নয়। (১৩)
ইহা বলি কুলাচার্য্য কুলে রাখি দেয়॥

(কুলার্ণব)

গাঙ্গ সোম বিধু লখাই মিহির।
মিহির-কন্যা বিয়ে করিল বংশজের॥
কুল গেল হৈল সমাজে অচল।
মিহির-পুত্র ভাস্কর পণ্ডিত প্রবল॥
বংশজ বলিয়া তারে সকলে বোলয়।
তার সঙ্গে ভোজনাদি কেহ না করয়॥
ভাস্করের পুত্রের নাম হয় পুষ্কর।
তার পুত্র সৃষ্টিধর তাঃপুত্র মালাধর॥
মালাধরের পুত্র-নাম বৃষকেতু হয়।
তার পুত্র চন্দ্রকেতু জানহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রকেতুর পুত্রের নাম সুন্দরামল্ল নকড়ি বাঁড়রি।
তার পুত্র হাড়ো ওঝা মুকুন্দ নাম ধারি।

(প্রেমবিলাস চতুর্বিংশ বিলাস)

প্রেমবিলাস কিঞ্চিদধিক প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

(১৩) সন্ন্যাসীর সন্তানে বান্তাসী বলি কয়।
নিতায়ের সন্তানেও এই দোষ আরোপয়॥

কেহ কেহ বলেন হাড়াই পণ্ডিত মৌড়েশ্বর শিবের সেবায়েৎ ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার 'যাজকতার' উল্লেখ পাওয়া যায়।

"কিবা কৃষিকর্ম্মে কিবা যজমান ঘরে"

(চৈতন্য-ভাগবত মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়)

হাড়াই পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম ছিল 'পদ্মাবতী'। পদ্মাবতীর পিত্রালয় বা তাঁহার পিতা-মাতার নামের কোনো প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

কিঞ্চিদূন প্রায় সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ১৩৯৫ শকাব্দার মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দের জন্মতিথি

"ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তানে করি পিতৃব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥"

(চৈঃ ভাঃ আদিখণ্ড)

হাড়াই পণ্ডিত বংশ সর্ব্ব লোকে জানে।
বন্দ্যঘটী গাঁই তার জানে সর্ব্বজনে॥
এই দোষত্বয় বীরভদ্রী নামে খ্যাত।
ঘটকেরা বীরভদ্রী দোষ বলে অবিরত॥
নিত্যানন্দের কন্যা বিয়ে মাধবচট্ট করে।
বীরভদ্রের কন্যা পার্ব্বতী মুখুটীরে বরে॥
তা সবার কুল রক্ষা করিবার তরে।
বীরভদ্রে বটব্যাল বোলে দেবীবরে॥
বীরভদ্র প্রভুর পুত্র শ্রীল রামচন্দ্র।
দেবীবরের সভায় বৈসে যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র॥
তারে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয়।
সে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয়॥
গোপীজন বল্লভ রামকৃষ্ণ প্রভু। (বীরভদ্রের অপর পুত্রদ্বয়)

পুনশ্চ—

"পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায়॥
হাড়ো ওঝা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

বৈষ্ণবগণ শ্রীনিত্যানন্দকে অনন্তদেব বলরামের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। বাল্যে ইঁহার শিক্ষার বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। চৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে—দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ইনি সমবয়সী শিশুগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাদির অভিনয় ক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন।

* * * * * * * *

"এই মত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায়॥"

(আদিখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়)

নিত্যানন্দের বাল্যলীলা

একচক্রায় শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যক্রীড়া সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। ১ম 'কুণ্ডলতলা'। "এখানে একটি মন্দিরে একখণ্ড প্রস্তর আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন ইহা শ্রীনিত্যানন্দের কর্ণের কুণ্ডল। একটা অজগর সর্প আপনার গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া মাঝে মাঝে বড় উপদ্রব করিত। শ্রীনিত্যানন্দ সেই জন্য আপনার কর্ণের কুণ্ডল দিয়া সেই গর্ত্ত-মুখ রোধ করিয়া দেন। কুণ্ডল পাষাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অজগরের আবাস গর্ত্তটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ—ভীমসেন যখন বককে বধ করিতে গিয়াছিলেন, অর্জ্জুন সেই সময় ভীমের অন্বেষণে ক্লান্ত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে যেখানে একটা শর নিক্ষেপ করেন, সেই স্থানে ঐ গর্ত্তটীর সৃষ্টি হয়। কালে সেই গর্ত্ত অজগর আসিয়া অধিকার করে। ২য় সিদ্ধ-বকুল। এই গাছে চড়িয়া সঙ্গীগণ সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যখেলা খেলিতেন। গোস্বামীগণ বলেন শেষা-বতার শ্রীনিত্যানন্দের পাদস্পর্শে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলির আকার সর্পের ন্যায়

দেবীবরের সভায় তাঁরা না আসিল কভু।
তাঁহারা বংশজ রৈল কন্যাপতি পাই।
ঘটব্যাল বাঁড়ুরী এই দুই পাই॥ (প্রেমবিলাস চতুর্ব্বিংশ বিলাস)

হইয়া গিয়াছে। বকুলবৃক্ষটী আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, যে জন্তই হউক, তাহার অনেক শাখা-প্রশাখার আকার সর্পের স্তায়"।

৩য় হাঁটুগাড়া কুণ্ড। কথিত আছে, "হাড়াই পণ্ডিত নিজে মাঠে গিয়া কৃষি-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। কখনো পিতার সঙ্গে, কখনো একাকী—বালক নিতাইও মাঠে গিয়া ঘুরিয়া আসিতেন। কৃষাণেরা জমিতে নিড়ান দিতেছে। নিতাই গিয়া বলিলেন,—কাজ করিতে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, আচ্ছা তোমরা একটু বিশ্রাম কর, আমি তোমাদের কাজ শেষ করিয়া দিতেছি। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে কৌতুক দেখিবার জন্য কৃষাণেরা কাজ বন্ধ করিল, বালক নিমেষে সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রের নিড়ান-তোলার কার্য্য শেষ করিয়া দিলেন। কার্য্যান্তে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া যেখানে নিতাই গায়ের কাদামাটি ধুইয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী কুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই কুণ্ডই 'হাঁটুগাড়া' নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে"। ইত্যাদি।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নিতাই গৃহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ বালকের যে যথাসময়ে উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীনিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দের সন্ন্যাস

* * * * *

"পিতৃ-সুখ-ধর্ম্ম পালি আছে পিতা সনে॥
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ৩য় অধ্যায়)

হাড়াই পণ্ডিত পরম যত্নে তাঁহার আতিথ্য করিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ-কথানন্দে রাত্রি প্রভাত হইল। যাত্রাকালে সন্ন্যাসী এক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অতিথি বিমুখ হইয়া যাইবে, সুতরাং সন্ন্যাসীর প্রার্থনা-পূরণে পণ্ডিত অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন—

"সন্ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সঙ্গেতে আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।(১৪)
কথোদিন তরে দেহ সংহতি আমার॥

(১৪) প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দের অপর ছয় ভ্রাতার নাম পাও॥ যার—

বলদেবের প্রকাশ হাড়াই পণ্ডিত।
দৈবকী প্রকাশান্তরে হয় পদ্মাবতী॥

কি সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী একেবারে প্রাণ-ভিক্ষা করিয়া বসিলেন! প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র-নিত্যানন্দ,—ভিখারীকে দান করিতে হইবে? কিন্তু না দিলেও তো নয়। প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান যে মহাপাপ! তাঁহার দ্বারা দেশের অবমাননা হইবে,—জাতির অবমাননা হইবে, সনাতন আতিথেয়-গৌরব বিলুপ্ত হইবে, এ কলঙ্কের গুরুভারই-বা তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন?

"ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল"

*　　*　　*

এইরূপে সাত পাঁচ—

চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ গেলা ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥
আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
ন্যাসিরে দিলেন পুত্র নোঙাইয়া মাথা॥
নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়)

দ্বাদশবর্ষীয়-বালক পিতৃ-আজ্ঞায় এক সন্ন্যাসীর (১৫) পশ্চাতে নিরুদ্দেশ-

সপ্ত পুত্র হৈল তাঁর বড় গুণবান্।
নাম কহিয়ে শুন হঞা সাবধান॥
নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দ আর সর্ব্বানন্দ।
ব্রহ্মানন্দ পূর্ণানন্দ আর প্রেমানন্দ॥
বিশুদ্ধানন্দ এই পুত্র সপ্তজন।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ বলরাম হন॥ (চতুর্ব্বিংশ বিলাস)

প্রেমবিলাসে ইহাদের অপর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অপর কোনো গ্রন্থেও ইহাদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। একচক্রায়ও ইহাদের বংশাবলী ছিল বলিয়া কোনো প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না।

(১৫) অনেকে বলেন এই সন্ন্যাসীর নাম লক্ষ্মীপতি পুরি। ইনিও বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। প্রেমবিলাসে (সপ্তম বিলাস) ইহাকে ঈশ্বর পুরি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—

"আপনে ঈশ্বরপুরি সেই মহাশয়"

যাত্রা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন অপেক্ষা ইহার স্মৃতি যেন আরো মধুর!

প্রথমেই তাঁহারা (বীরভূমের) বক্রেশ্বর তীর্থে গমন করেন। পরে বৈদ্যনাথ-গয়া, কাশী প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে পথে কোনো স্থানে সন্ন্যাসী ও নিত্যানন্দ পরস্পর সঙ্গচ্যুত হন। শ্রীনিত্যানন্দ কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়াছেন, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত কিন্তু মিলন হইবার পর, রাত্রিতে শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহে সেই দণ্ড-কমণ্ডলু নিতাই নিজেই ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার অবধূত (১৬) খ্যাতি ছিল, এতদ্ভিন্ন সন্ন্যাসাশ্রমোচিত অপর কোনো নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বীরচন্দ্রপুরে নিত্যানন্দতনয় বীরচন্দ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিমরায় নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মন্দিরে একটি দশভুজা-মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি আজিও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। গোস্বামীগণ বলেন, হাড়াই পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে শাক্ত ছিলেন, দশভুজা তাঁহারই কুলদেবী। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শাক্ত ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ প্রভুর নাম 'নিত্যানন্দ স্বরূপ' বলিয়া বহুবার উক্ত হইয়াছে। ইহার ভিতর একটু রহস্য আছে মনে হয়। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য মহাশয় সন্ন্যাসগ্রহণ কালে যোগপট্ট গ্রহণ না করায় 'স্বরূপ' আখ্যায় আখ্যাত হইতেন। 'যোগপট্ট' অর্থাৎ আচার্য্য-শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গিরি, পুরি প্রভৃতি উপাধি। পুরুষোত্তম আচার্য্যের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম 'স্বরূপ দামোদর', গুরুদত্ত-নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য।

বীরচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ

> "সন্ন্যাস করিল শিখা সূত্র ত্যাগরূপ।
> যোগ পট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ"॥ (চৈঃ চরিতামৃত মধ্যলীলা দশম পরিচ্ছেদ)

(১৬) মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে চারি শ্রেণীর অবধূতের নাম পাওয়া যায় ১। ব্রহ্মাবধূত, ২। শৈবাবধূত, ৩। বীরাবধূত, ৪। কুলাবধূত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ব্রহ্মোপাসনা জন্য সন্ন্যাসী হইলে ব্রহ্মাবধূত নামে আখ্যাত হন। বিধিমত পূর্ণাভিষিক্ত সন্ন্যাসী শৈবাবধূত আখ্যা লাভ করেন। বীরাবধূত সন্ন্যাসী পঞ্চতত্ত্ব সাধনে বীরাচারী হইবেন, অসংস্কৃত লম্বমান মুক্তকেশ (জটা) ধারণ করিবেন। অস্থিমালা বা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিবেন। বিবস্ত্র থাকিবেন, বা কৌপিন পরিবেন।

কুলাচার মতে অভিষিক্ত গৃহী কুলাবধূত নামে খ্যাত। শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে দশ প্রকার অবধূতের উল্লেখ পাওয়া যায় (১) তীর্থ (২) আশ্রম (৩) বন (৪) অরণ্য (৫) গিরি (৬) পর্ব্বত (৭) সাগর (৮) সরস্বতী (৯) ভারতী (১০) পুরী। শ্রীনিত্যানন্দ ইহাদের কোনোটীরই অন্তর্ভুক্ত না থাকায় স্বরূপ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব অবধূতও আছেন। তাঁহারা রামানন্দের শিষ্য। (রামায়ৎ সম্প্রদায়ভুক্ত)।

সুতরাং স্বরূপ নাম দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় নিত্যানন্দও যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। অনেকেই অনুমান করেন, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি গৃহত্যাগ করেন, দীক্ষাও তাঁহার নিকটেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থপর্য্যটন কালে পাণ্ডুপুরে (বোম্বাই পুনার অন্তর্গত) শ্রীচৈতন্যাগ্রজ (ষোড়শ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক যিনি শঙ্করারণ্য নামে খ্যাত হন) শ্রীবিশ্বরূপের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের মিলন হইয়াছিল। বিশ্বরূপের বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর। বিশ্বরূপ পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করেন। (১৭) ভক্তমালে বর্ণিত হইয়াছে—

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপের মিলন

শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি॥
শ্রীমান ঈশ্বর পুরীতে নিজ শক্তি। (১৮)
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥

(১৭) শ্রীচৈতন্য দেব দক্ষিণ দেশ পর্য্যটন কালে—

* * * *

"তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।

* * * * *

ভিক্ষা করি তাঁহা একশুভ বার্ত্তা পাইলা॥
মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরি নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র গৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তারে দেখিবারে।

* * * *

জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তিঁহ যেন জগন্মাতা॥

* * *

তাঁর এক যোগ্যপুত্র করিল সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হৈলা।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিলা॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তিঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা।

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ)

(১৮) বৈষ্ণবগণ বলেন, বিশ্বরূপ হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াই ৺গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পণ্ডিত নিমাইকে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে—

নিত্যানন্দ প্রভুতে এক শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃ পুঞ্জরূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা"॥

সেন শিবানন্দ কিরূপে ইহা জানিতে পারেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। শিবানন্দ পুত্র কবি কর্ণপুর তাহার গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিয়াছেন—

"যথা শ্রীবিশ্বরূপোহয়ং তিরোভূতং সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্থিতঃ॥
ততো হবধূতো ভগবান বলাত্মা।
ভবন্ সদা বৈষ্ণব বর্গ মধ্যে।
জজ্বাল:তিগ্মাংশু সহস্র তেজাঃ
"ইতি ব্রুবো মে জনকো ননর্ত্ত॥

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ

(কথিত আছে,। শ্রীনিত্যানন্দের মথুরায় অবস্থান কালে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী দেহত্যাগ করেন। বিশ্বরূপ হইতে প্রাপ্ত তেজ পুরী সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দে আধান করিয়াছিলেন। তাহার পরই নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্য সহ সম্মিলিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এই অভেদাত্মা সহচরকে সত্য সত্যই অগ্রজের মত ভক্তি করিতেন)। এইরূপে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য,

নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্র পুরী

লো কাথ করে বিশ্বরূপের সেবন।
দৈবে ঈশ্বর পুরী তথায় উপস্থিত হন।
বিশ্বরূপ ঈশ্বর পুরীরে প্রণমিলা।
নিজ প্রাণ তেজ তিঁহ পুরীতে স্থাপিলা।
তথাহি চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে কলিবাক্য—
অত্রা প্রজ স্বকৃত দার পরিগ্রহঃসন।
সংকর্ষণঃ স ভগবান ভুবি বিশ্বরূপঃ।
যাঁরং মহঃ ক্ষিল পুরীশ্বর মাপয়িত্বা।
পূর্ব্বং পরিব্রাজি তত্রবতি যো বভূবঃ
(প্রেমবিলাস, চতুর্বিংশ বিলাস)

শ্রীঈশ্বর পুরী, প্রভৃতি প্রেমিক-মহানুভবগণ এই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। প্রেম-ভক্তির যে পবিত্র-প্রবাহ শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত পথে একদিন সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, যাহার মধুময়ী লহরী-লীলায় একদিন আসমুদ্র হিমাচল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীই তাহার আদি প্রস্রবণ।

মাধবেন্দ্র পুরী

"ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
গৌর চন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার॥

* * * *

মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভূত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশি কৃষ্ণ প্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥

(চৈঃ ভাঃ আদিখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয় বলেন—

"জয় জয় মাধব পুরী কৃষ্ণ প্রেম পুর।
ভক্তি কল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর"॥

(চৈঃ চরিতামৃত অদিলীলা নবম পরিচ্ছেদ)

"আকুল-নয়ানে, চাহে মেঘ-পানে, না চলে নয়ানের তারা"—শ্রীরাধিকার এই প্রেমোন্মাদ, কবি-কথিত এই অপূর্ব্ব-কাহিনী মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। (১৯) কিছু দিন একত্রে অবস্থানের পর পুরী সরযূ তীর্থে যাত্রা করেন, নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ উদ্দেশে প্রস্থান করেন। সেতুবন্ধ আদি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, নিতাই পুনরায় মথুরায় আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতঃপর মথুরা হইতেই তিনি বঙ্গের ব্রজভূমি নদীয়ায় আসিয়া উপনীত হন।

(১৯) নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্রের সম্প্রীতি সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—(আদিখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়)

"মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে, নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে।
মাধবেন্দ্র বোলে প্রেম না দেখিনু কোথা, এই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা।
জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি, নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।

* * * * * *

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ

নবদ্বীপে তখন নন্দন আচার্য্য নামে এক পরম-ভাগবত বাস করিতেন। নিত্যানন্দ প্রভু গিয়া তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করেন। নন্দন আচার্য্য-গৃহেই শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মধুর মিলন সংঘটিত হয়। নদীয়ার শ্রীবাস-প্রাঙ্গনে হরি-কীর্ত্তন—তখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। নিত্যানন্দের নদীয়ায় আগমনের পরদিন, নিমাই সানুচর গিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বম্ভরের ভুবন-ভুলানো রূপ নিতাইকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। শ্রীচৈতন্যের ইঙ্গিতে শ্রীবাস পণ্ডিত এক শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দ—

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ

নিতাই ও নিমাই

"শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া নাহিক চেতন॥

* * * * * *

গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘন শ্বাস।
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহাহাস॥

* * * * *

বিশ্বম্ভর বোলে শুভ দিবস আমার।
দেখিলাম ভক্তিযোগ চতুর্ব্বেদ সার॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এই গর্জ্জন হুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বর-শক্তি বই হয় আর॥

* * * * *

বুঝিলাঙ কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধারে।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে॥
মহাভাগ্যে দেখিলাঙ তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে যে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥

* * * * * *

প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে বাসি ভয়।
কোন দিক্ হৈতে শুভ করিলা বিজয়॥"

নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে উত্তর করিলেন—

* * * * *

"নদীয়ায় শুনি বড় হরিসংকীর্ত্তন।
কেহো বলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনুঁ মুই পাতকী হেথায়॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়)

নিতাই গৌরের মধুর মিলন

এইরূপেই প্রথম আলাপন পরিসমাপ্ত হইল। ভক্তগণ নির্ণিমেষ-নয়নে সে মিলনের পুণ্যচ্ছবি সন্দর্শন করিলেন। মানবের জীবনে নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়াগেল। নবজীবন-প্রভাতের অরুণরাগে-উদ্ভাষিত-বাঙ্গালার, গগনে-পবনে প্রতিধ্বনিত হইল—

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌতমোনুদৌ।"

নদীয়ায় ভক্ত সম্মিলন

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শুভ-সম্মিলনের পর দিন পৌর্ণমাসী ছিল। শ্রীবাস মন্দিরে নিতাই ব্যাস-পূজা করিলেন। ব্যাসের উদ্দেশে মাল্য দিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যের মস্তকে মাল্য সমর্পণ করিয়া বসিলেন। দুই চারি দিন মধ্যেই শান্তিপুর চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীঅদ্বৈতআচার্য্য, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি আদি ভক্তবৃন্দ আসিয়া নিতাই গৌরের সহিত সম্মিলিত হইলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে—উচ্চ হরিকীর্ত্তনে ভক্তমণ্ডলীর প্রাণ মাতিয়া উঠিল। কীর্ত্তনাবকাশে

নিতাইয়ের নদীয়া বিহার

শিশুপ্রকৃতি নিত্যানন্দ নদীয়ার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এই গঙ্গাবক্ষে সাঁতার কাটিতেছেন, পরক্ষণেই শচী-মাতার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইমাত্র শিশুগণ-সঙ্গে খেলায় মাতিয়াছিলেন, পরক্ষণেই দেখি জননীর কোলে তনয়ের মত, শ্রীবাস-পত্নী মালিনীর কোলে বসিয়া স্তন্যপান

হরিনাম প্রচার

করিতেছেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে—অতঃপর নদীয়ার দুয়ারে দুয়ারে প্রকাশ্যভাবে হরিনাম-প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। এই কার্য্যে প্রথম বহির্গত হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ ও যবন-হরিদাস। একজন অক্রোধ, আনন্দময়, মানাপমানাদি বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য, মানবের দুঃখে আজন্ম দরদী, চিরকরুণা-পরায়ণ। আর একজন নিষ্ঠা বিশ্বাসের জলন্ত-মূর্ত্তি, ভগবৎ-প্রেমে সদা বিভোর—'নাম' লইয়া উন্মত্ত, পরধর্ম্ম দ্বেষির প্রাণান্তকর-প্রহারে মৃতকল্প হইয়া ও আত্মবিশ্বাসে চির বলীয়ান্, অটল, অচল, অবোধ অপরাধীর প্রতি অহৈতুকী ক্ষমাশীল। একদিন শ্রীচৈতন্য দেব বলিলেন—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণভজ কৃষ্ণবল' কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ১৩শ অধ্যায়)

হরিনাম প্রচার

সন্ন্যাসী দুইজন নগরে বাহির হইয়া পড়িলেন। দুয়ারে দুয়ারে ভুবন-মঙ্গল হরিনাম বিলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়া লোকে ভিক্ষাদিতে আইসেন, তাঁহারা বলেন, "একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল" এই ভিক্ষা চাই। 'ভালমন্দ লোক' সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান আছেন। নদীয়ায় মন্দলোকের সংখ্যাও তখন বড় কম ছিল না। এমন কি মহা মহা পণ্ডিত—অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ব্যাকরণের ঘুরপাকে 'হয়কে নয় নয়কে হয়' করিয়া সে সময় ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল। নদীয়ার "সহর-কোতোয়াল" ছিলেন তখন জগন্নাথ ও মাধব রায় নামক দুইজন ব্রাহ্মণসন্তান। লোকে তাহাদের নাম দিয়াছিল 'জগাই মাধাই'। হেন কুকর্ম্ম নাই, যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। দুটী ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া একদিন রাজপথে পড়িয়া পরস্পরে মারামারি করিতেছিল, এমন সময় নিত্যানন্দ ও হরিদাস গিয়া তাহাদের নিকটে 'নাম ভিক্ষা' চাহিলেন; আর যাবেন কোথায়! জগাই মাধাই সন্ন্যাসীদ্বয়কে এমন তাড়া করিল যে, সেদিনকার মত তাঁহা-দিগকে 'পথ' দেখিতে হইল! লোকে বলিতে লাগিল, বাঙ্গালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুক্রিয়াসক্ত পাষণ্ড উহারা, 'সন্ন্যাসী'—হইয়া উহাদের নিকট যাওয়াই অন্যায় হইয়াছে, উহাদের কি আর জ্ঞান আছে? ইত্যাদি। যাহা হউক এইরূপেই নদীয়ার প্রচার কার্য্য চলিতে লাগিল।

নিত্যানন্দ
হরিদাস ও
জগাই মাধাই

নিতাই ও
জগাই মাধাই

নিত্যানন্দ হরিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িতেন। একদিন একাকী নিত্যানন্দ আবাসে ফিরিতেছেন, ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে; আত্মানন্দে বিভোর, বালক-স্বভাব নিত্যানন্দ—'নামগান' করিতে করিতে আসিতেছেন,—সহসা পশ্চাৎ হইতে কাহারা হাঁকিল, কে—রে? কে যায়—রে? কোথায় যাস'? নিত্যানন্দের সমাধি ভাঙ্গিয়াগেল। তিনি উত্তর দিলেন 'প্রভুর বাড়ী যাইতেছি'। পুনরায় কর্ক'শ-স্বরে কে প্রশ্ন করিল 'কে তুই'? নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন 'আমি অবধূত'। মাতাল দুই জনের একটু যেন জ্ঞান হইল। "অবধূত? ও—সেই সন্ন্যাসী; ইহারা কয়জনে মিলিয়াই

নগরটাকে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে। দিবারাত্রি কেবল হরিনাম—উচ্চ চীৎকার-উদ্দণ্ড নৃত্য, ইহাদের একটু শাস্তি দেওয়া উচিত"। আলোচনা করিতে করিতে দুই ভাই নিত্যানন্দের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল করুণা-পূর্ণ নেত্রে সন্ন্যাসী তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। রজনীর মলিনতা সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতাকে আবৃত করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসীর মুখে সেই কথা—যাহা-তাহারা শুনিয়া শুনিয়া উত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—

'ভজ কৃষ্ণ বল-কৃষ্ণ দেহ এই ভিক্ষা'

মাধাইয়ের মার' খাইয়াও নিতাইয়ের দয়া

স্বর যেন অশ্রু-গদগদ, আকুল আবেগে পরিপূর্ণ। জগাই—কিছুক্ষণের জন্য একটু স্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিয়া মাধাইয়ের ক্রোধ আরো বাড়িয়া উঠিল, সে ভূপতিত একটা ভাঙ্গা কলসির কানা উঠাইয়া লইয়া নিত্যানন্দের প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল। "মুটকী" খানা সজোরে গিয়া নিত্যানন্দের মাথায় লাগিল। মস্তক হইতে দরবিগলিতধারে ললাট বাহিয়া রক্তধারা ছুটিল। কিন্তু তথাপি নিতাইয়ের বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি আনন্দ-তন্ময়ভাবে তখনো তাহাদের বলিতেছেন—"ওরে তোরা একবার হরিবল্ ভাই, হরি বলিয়া আমায় কিনিয়া নে"। মাধাই আবার মারিতে যাইতেছিল, জগাই আসিয়া ধরিল, "আহা বিদেশী সন্ন্যাসী, উহারে মারিলে আর কি লাভ হইবে?" জগাইএর এই ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিতাইয়ের যেন চমক ভাঙ্গিল, "একটু পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না? তবে তো ইহাদের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব নয়!" তিনি তাহাদিগকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন—

"মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥"

সংবাদ শ্রীগৌরাঙ্গের কাণে গিয়া পৌঁছিল, তিনি শশব্যস্তে সদলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন পাষণ্ড দুইজন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, রক্তাক্ত-কলেবরে নিতাই তাঁহাদের ঘেরিয়া ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছেন।

গৌরাঙ্গের আগমন

"প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥
তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে॥"

"হ্যারে কেন আমার নিতাইকে মারিলি? আমার অক্রোধ আনন্দময় অভিমানশূন্য নিতাই, আপনার মনে নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়, কাহারোতো কোনো দোষ করে নাই।" বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইল। তিনি সদলে তাঁহাদের দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার দুটিহাতে ধরিলেন, "তুমি ওদের কিছু বলিও না, উহারা অবোধ, জানে না কি করিয়াছে, কই আমায় তো কিছুই লাগে নাই, এস বরং সকলে মিলিয়া উহাদের অনুরোধ করি, দেখি যদি হরি বলাইতে পারি"। আর কি পাপী স্থির থাকিতে পারে? সত্য সত্যই তো তাহারা অপরাধ করিয়াছে, তবু তাহাদের জন্য এ-কি করুণা! সন্ন্যাসী তো নিজের জন্য কিছু চাহে নাই, কই টাকা-কড়ির কথা তো ভ্রমে ও ইহাদের মুখে শুনি নাই, শুধুই বলিয়াছে 'হরিবল', শুধু ভিক্ষা চাহিয়াছে—"ওগো তোমরা পরমার্থের পথ দেখ,—কৃষ্ণভজ, বদলে তার মার' খাইয়াছে—তবু এত দয়া,—না,না,ও সন্ন্যাসী মানুষ নয় মানুষ নয়।" তাহারা অন্তরে অন্তরে অনুশোচনায় অস্থির হইয়া পড়িল। নিত্যানন্দ দেখিলেন নিমাই এখনো ক্ষমা করেন নাই, তখন তিনি বলিলেন—মাধাই আমায় মারিয়াছে, কিন্তু জগাই—তাহাকে ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। তখন শ্রীচৈতন্যের ভাব-পরিবর্ত্তন হইল, ক্রোধ দূরে গেল, 'আমার প্রাণের ভাইকে রক্ষা করিয়াছিস্' বলিয়া জগাইকে তিনি বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, জগাই অচৈতন্য হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়াগেল। এইবার মাধাইএর পাষাণ-প্রাণ গলিল। মাধাই আর থাকিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণতলে পতিত হইল। "আমায় ক্ষমা কর প্রেমময়! ওগো আর আমায় দণ্ড দিওনা, কত জন্ম-জন্মান্তর হইতে অবিশ্রান্ত এই দণ্ডের যাতনা সহিয়া আসিতেছি, এ জন্মেও সারাটী জীবন শুধু দণ্ডভোগই করিয়াছি; আর কেন দয়াময়, আর যে পারিনা, দণ্ডের ভরা পূর্ণ হইয়াছে, এইবার ভরা-ডুবি করিয়া দাও, এইবার ক্ষমা কর।" নিমাই বলিলেন,—মাধাই! অপরাধ যদি বুঝিয়া থাক, ক্ষমা লাভ করিতে যদি চাও, নিতাইয়ের কাছে যাও; তুমি তাঁহার মনে বেদনা দিয়াছ। তিনি দয়াময়, তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। তাহা হইলে আমারও ক্ষমা করা হইবে। এতক্ষণে মাধাইয়ের সাহস হইল, সে নিত্যানন্দের চরণে গিয়া শরণ-গ্রহণ করিল। করুণার আবেগে মাধাইয়ের হইয়া শ্রীচৈতন্য তখন শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন—

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট জগাই মাধাইয়ের জন্য নিতাইয়ের করুণা ভিক্ষা

জগাইয়ের উদ্ধার

"* * শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত॥"

আমাদের হরিপ্রেমে আপনভোলা নিতাই, তিনি তো ক্রোধ করেন নাই। তবে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু সে দুঃখতো অবসান হইতে চলিয়াছে। নিত্যানন্দ বলিলেন—

* * প্রভু কি বলিব মুঞী।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি॥
কোনো জন্মে থাকে যদি আমার স্বকৃতি।
সব দিনু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিতি॥
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপাকর তোমার মাধাই॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ১৬শ অধ্যায়)

মাধাইয়ের উদ্ধার

মাধাইকে ডাকিয়া বলিলেন—"আয় আয় মাধাই, একবার হরিনাম গ্রহণ করিবি আয়," বলিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। করুণার পীযূষ-প্রস্রবণে গিয়া মাধাইয়ের দাবদগ্ধ-প্রাণ চির-শীতলতায় স্নিগ্ধ হইয়া গেল। অক্ষয়-শান্তি, অমৃত-তৃপ্তি লাভে সে চিরদিনের মত চরিতার্থতা লাভ করিল। আজন্ম পাপাসক্ত মদ্যপ—দুটী ভাই, সেই দিন হইতে হরিপ্রেমরসে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। নিত্যানন্দের অপার করুণায়—আজিও তাহারা ভগবদ্ভক্তের আদর্শ-স্থান হইয়া রহিয়াছে। এমন কতশত জগাই মাধাইয়ের যে, তিনি উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। বীরভূমের শ্রীনিত্যানন্দের সেই মন্দার-সুন্দর অবদান পরম্পরা, আজ সমগ্র বাঙ্গালার জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনেচ্ছায়—(কাটোয়া হইতে) রাঢ়ে আসিয়া তিন দিন ভ্রমণ করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে—

রাঢ়দেশে শ্রীচৈতন্য

"সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥"

অপূর্ব্ব ভাবাবেশে এই তিন দিন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন, এমন কি আহার পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। চৈতন্য-ভাগবতকার বলেন—

রাঢ়ে সঙ্গীসহ শ্রীচৈতন্য

"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশবভারতী॥"

(মধ্যখণ্ড ১ম অধ্যায়)

চৈতন্য-চরিতামৃতকার বলেন—

"নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥"

(মধ্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ)

যাহা হউক সে সময় নিত্যানন্দ যে সঙ্গে ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এ সময় শ্রীনিত্যানন্দের পিতৃদেব হাড়াই পণ্ডিত ও মাতৃদেবী পদ্মাবতী জীবিত ছিলেন কি না জানিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পর বৎসরেই নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করেন;—তখন নিত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বৎসর। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিত্যানন্দের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর ছিল। রাঢ় ভ্রমণ সময়ে শ্রীচৈতন্যকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দ—তাঁহার জন্মভূমি একচক্রায়—গিয়াছিলেন কিনা, জানিবার কোনো উপায় নাই। বীরচন্দ্রপুরে প্রবাদ যে—"তাঁহারা আসিয়াছিলেন"। চৈতন্যদেব যাঁহাদের সুধা-সুমধুর সংগীত-কাকলির-কলতানে আত্মহারা হইতেন, বীরভূমের সেই মধুকণ্ঠ-কোকিল শ্রীজয়দেব ও প্রেম-করুণ-কণ্ঠ-পাপিয়া শ্রীচণ্ডীদাসের গীতিময়ী-ভূমি কেন্দুবিল্ব ও নান্নুর সন্দর্শন করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও জানিতে পারা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতের মিলন ঘটিয়াছিল, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—দুইটী সংগীত সুর-তরঙ্গিণী একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বীরভূমির ভাগ্যে চণ্ডীদাস-চৈতন্যের শুভ-সম্মিলনের সুযোগ ঘটে নাই।

রাঢ়ে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নাকি বলিয়াছিলেন—

(প্রভু বোলে) "বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথাই যাইমু মুঞী থাকিমু নির্জ্জনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

অতঃপর ভ্রমণ করিতে করিতে—

"দিন অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্য-বন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে॥

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ॥
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সভা ছাড়ি পলাইয়া গেলা কথোদূর॥"

ভক্তগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আসিয়া দেখিলেন "কৃষ্ণরে—প্রভুরে" বলিয়া এক প্রান্তরে তিনি রোদন করিতেছেন। 'নবানুরাগিণী গোপবধূর' মত তাঁহার সেই প্রেমবিহ্বল রোদনধ্বনি—দুঃখ-ক্লিষ্ট-মর্ত্ত্য মানবের কর্ণে, যেন কোন্ এক অজ্ঞাত-অমরার অক্ষয় আনন্দ লোকের বার্ত্তা-বহন করিয়া আনিতেছে। 'ক্রোশেক' ব্যাপিয়া রাঢ়ের গগনে পবনে সে রোদন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দলে দলে রাঢ়ের নরনারী আসিয়া প্রান্তর পরিপূর্ণ করিয়াছেন, ভক্তগণ আসিয়া প্রেমাশ্রুতে ভক্তিঅশ্রু মিশাইয়া দিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

রাঢ়ে হরিকীর্ত্তন

"শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সভে বেড়ি চারিভিতে॥
এই মত সর্ব্ব পথ নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিমমুখে আনন্দিত হইয়া॥
ক্রোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর॥"

বীরভূমের সিউড়ি হইতে দুবরাজপুর আসিবার একটি 'পাকা সড়ক' আছে। এই পথে—রাইপুর—মল্লিকপুরের পশ্চিমে একটি ইষ্টক বাঁধানো বেদী দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে—ঐ প্রান্তর হইতেই শ্রীচৈতন্যদেব ফিরিয়া যান,—তাহারই স্মৃতি নিদর্শন-স্বরূপ কোনো ভক্ত বেদীটি বাঁধাইয়া দিয়াছেন। রাইপুর মল্লিকপুর হইতে বক্রেশ্বর চারি পাঁচ ক্রোশের অধিক দূর হইবে না।

স্মৃতি নিদর্শন

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করেন, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র সে সময় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে নীলাচলে রাখিয়া, শ্রীচৈতন্যদেব—দক্ষিণ-দেশস্থ তীর্থ পর্য্যটনান্তে নীলাচলে আসিয়া তথা হইতে নিত্যানন্দাদি সঙ্গে গৌড়ে আগমন করেন। গৌড়ের পথে বৃন্দাবন যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু লোক সংঘট্ট দেখিয়া গৌড় রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কানাইর নাটশালা নামক গ্রাম হইতে শান্তিপুর হইয়া পুনরায় শ্রীচৈতন্য দেব নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই যাত্রায় শ্রীনিত্যানন্দ

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ

বোধহয় শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নীলাচলে গমন করেন নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর
দুইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল"॥

(মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ)

নীলাচল হইতে ঝাড়খণ্ডের পথে মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নীলাচলেই অবস্থিতি করেন।(২০)

একদিন মহাপ্রভু—

শ্রীচৈতন্য কর্তৃক নাম প্রচারার্থ নিতাইকে গৌড়ে প্রেরণ

'নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁহারে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে'॥

(চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ)

'প্রভুবোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে।
তুমি ও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥

*

এতেক আমার বাক্য সত্য যদি চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও"॥

(চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৫ম অধ্যায়)

রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথবৈদ্য ওঝা, কৃষ্ণদাসপণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতি নিজগণ লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়দেশের গ্রাম গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। নিত্যানন্দ হইতেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এতদ্দেশে বহুলরূপে প্রচারিত হয়।

(২০) সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রথম ছয় বৎসর এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, শেষ আঠার বৎসর তিনি নীলাচল হইতে অন্যত্র গমন করেন নাই। এতদ্দেশ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ বৎসর বৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে গিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতেন। তথায় চারিমাস অতিবাহিত করিয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞাক্রমে এই সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সর খেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা নিত্যানন্দের দুই পত্নী। শ্রীনিত্যানন্দের একপুত্র ও এককন্যা। পুত্রের নাম বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র, কন্যার নাম গঙ্গা (২১) কন্যা গঙ্গা বসুধা দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। জাহ্নবা দেবী দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজে তিনিই নেতৃস্থানীয়া ছিলেন।(২২)

শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ, পত্নী ও পুত্র-কন্যা

(২৩) ঝামটপুর নিবাসী যদুনন্দন পিপলাইএর দুইকন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীর সহিত বীরভদ্রের বিবাহ হয়। বীরভদ্রের তিনপুত্র গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র এবং একমাত্র কন্যার নাম ভুবন মোহিনী। (২৪) গৌড়ের বাদসাহের নিকট হইতে একখণ্ড কৃষ্ণ-প্রস্তর ভিক্ষা করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া বীরভদ্র খড়দহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিগ্রহের নাম শ্রীশ্যামসুন্দর। অবশিষ্ট প্রস্তর হইতে শ্রীনন্দদুলাল ও বল্লভজী বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীনন্দদুলাল স্বামীবনে এবং বল্লভজী বল্লভপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বীরচন্দ্রপুরের গোস্বামীগণ বলেন,—বীরচন্দ্রপুরের শ্রীবঙ্কিম রায় বিগ্রহ শ্রীবীরভদ্রের প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিম রায়ের দুই পার্শ্বে দুইটি শ্রীমতী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। গোস্বামীগণ বলেন ইঁহারা বসুধা ও জাহ্নবার প্রতিমূর্ত্তি। খড়দহ, মাড়গ্রাম, বীরচন্দ্রপুর, মালদহ প্রভৃতি বঙ্গের বহুস্থানে নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামী সন্তানগণ বাস করিতেছেন। মাঘ-মাসে শ্রীনিত্যানন্দের জন্মতিথিতে বীরচন্দ্রপুরে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বীরভদ্রের পত্নী ও পুত্র কন্যা

বীরভদ্রের কীর্ত্তি

নিত্যানন্দ বংশ

(২১) কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী মল্লাপুর নিবাসী ভগীরথ চট্টোপাধ্যায়ের পালক পুত্র মাধব চট্টোপাধ্যায়ের সহিত গঙ্গার বিবাহ হয়। গোস্বামীগণের মধ্যে গঙ্গাবংশীয়গণ কুলীন বলিয়া খ্যাত।

(২২) শ্রীনিত্যানন্দ দাস তাঁহার প্রেমবিলাসে লিখিয়াছেন—

আমার শ্রীঠাকুরাণীর আট পুত্র হয়।
অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ ত্যজয়॥
শেষ পুত্র বীরভদ্র বীরচন্দ্র নাম। (উনবিংশাধ্যায়)

(২৩) ইনি বৃন্দাবন যাত্রা পথে খণ্ডরাজয় একচক্রা দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। ভক্তি রত্নাকরে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। (ভক্তি-রত্নাকর ১ম ও ১১শ বিলাস) প্রথমবার বৃন্দাবনে গিয়া মদনমোহন বিগ্রহের বামে রাধা মূর্ত্তি নাই, দেখিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া রাধামূর্ত্তি গঠন করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার সময় খেতরীতে নরোত্তম-প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ বিগ্রহ দর্শন করিয়া যান।

(২৪) ভুবনমোহিনীর স্বামীর নাম পাবনীনাথ। তিনি "ফুলিয়া মুখুটি" ছিলেন।

তদুপলক্ষ্যে তথায় বহুলোকের সমাগম হয়। এই সময় বীরচন্দ্রপুরে কয়েক দিন ব্যাপি বৃহৎ মেলা বসে।

বীরচন্দ্রপুরে উৎসব

পূর্ব্বোল্লিখিত একচক্রার অন্তর্গত মৌড়েশ্বর প্রভৃতি স্থানে বহুদেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কোটাসুরে 'মদনেশ্বর শিবমন্দির, মৌড়েশ্বরে কুণ্ডলতলার মন্দির' বীরচন্দ্রপুরে বঙ্কিম রায়ের মন্দির প্রভৃতি ছোট বড় মন্দির সংখ্যা ও উল্লেখ যোগ্য। চৈতন্য ভাগবতে মৌড়েশ্বর শিবের নাম পাওয়া যায়।

"মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কতদূরে।
যাঁরে পুজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে" ॥

মৌড়েশ্বর শিব

ভক্তি রত্নাকরে লিখিত আছে জাহ্নবা দেবী

"মৌড়েশ্বরে গিয়া কৈলা শিবের দর্শন
যাঁরে পুজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন" ॥

আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও মৌড়েশ্বর শিবের কোনো সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে পুলিশ-থানার অদূরে মৌড়পুর নামে একখানি গ্রামে মৌড়েশ্বর নামে এক শিব আছেন, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ-পূজিত মৌড়েশ্বর কি-না নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। মৌড়পুর গ্রামের একটি পশ্চিম-দুয়ারি নবরত্নমন্দিরে মৌড়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। আবার গ্রামের নৈঋত-কোণাংশে শিব-পুষ্করিণী নামক এক পুষ্করিণীর জলমধ্যে যে একটি মন্দির আছে, তাহাতেও মৌড়েশ্বরের অপর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। দেয়াশীরা তিলি-জাতীয়। তাহারাই শিবপূজা করে। মাসের মধ্যে সবদিন পূজা করিতে নাই, অর্থাৎ শিবকে দুই একদিন অপূজিত রাখিবার বিধি আছে। নিত্য ভোগের ব্যবস্থা নাই। চৈত্র-সংক্রান্তির একাদশ দিন পূর্ব্ব হইতেই দুগ্ধ গঙ্গাজল দিয়া পায়স-ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে, সেই দিন পুষ্করিণীর শিবকে তুলিয়া আনিয়া গ্রামের মন্দিরস্থ শিবের সঙ্গে রাখিয়া একত্রে পূজা-ভোগাদি দিতে হয়। জলের শিব সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত গ্রামের মন্দিরেই থাকেন। সংক্রান্তির আগের দিন শিব-সম্মুখে একটি ছাগবলি অর্পিত হয়। সংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব্বে জাগরণ। জাগরণের রাত্রিতে নানারকম কাঁটা-গাছ বিছাইয়া ভক্তেরা তাহার উপর গড়াগড়ি দেন। তৎপর দিন 'বাণামো' বা মহাস্নান, কলাগাছে তরবারি রাখিয়া তাহার উপর একজন ভক্ত শুইয়া থাকেন, শায়িত ভক্তের উপর দেয়াশী বসিয়া যান, সংক্রান্তিতে শিবের গাজন। হোমের দিন রাত্রে ভক্তগণ আগুন লইয়া নানা রকম খেলা করেন। আগে চড়কের দিনে জিহ্বা

মৌড়পুরের শিব

এবং পৃষ্ঠদেশে বাণ-ফোঁড়া হইত। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। গাজনের দিন একটি মেলায় নানা স্থান হইতে প্রায় আট দশ হাজার লোকের সমাগম হয়। ১লা বৈশাখ পুকুরের শিবকে পুকুরে রাখিয়া আসিলে উৎসব শেষ হইয়া যায়। মৌড়পুরে শিব-দত্ত নানারূপ ঔষধ বিতরিত হইয়া থাকে। দেয়াশীদের পূর্ব্ব-পুরুষ সাধুরাম খাঁ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই শিবের প্রকাশ করেন ইহাই প্রবাদ। শ্রীনিত্যানন্দ পূজিত শিব, ৺তারকেশ্বর-লিঙ্গ প্রভৃতির মত হয়তো কালে মাটী চাপা পড়িয়া ছিলেন এবং সাধুরাম তাহা প্রকাশ করেন; অথবা ইহা সাধুরাম প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো শিব-লিঙ্গ, অনুমান করিয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারা যায় না।

পলাশবাসিনী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ

মৌড়েশ্বরে 'পলাশ বাসিনী' নাম্নী এক দেবী মূর্ত্তির পূজা হয়। শক্তি-মূর্ত্তি, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। কে বা কাহারা যেন মূল-মূর্ত্তির সমস্ত অংশ "চাঁচিয়া ছুলিয়া" তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। একখণ্ড কৃষ্ণ-পাষাণ মাত্র বর্ত্তমান। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির শেষ চিহ্ন নয়নপথ বর্ত্তী হয়। কিন্তু তাহাতে সমগ্র মূর্ত্তির সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অসম্ভব। মন্দিরের অদূরে একটি লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল-মূর্ত্তি, অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। বোম্বাই নির্ণয় সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত 'দুর্গাসপ্তশতী' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারাযায়, যে যেখানে যেখানে বিশেষ বিশেষ শক্তিমূর্ত্তি পূজিতা হইতেন তত্তৎ স্থানেই উক্ত লক্ষ্মী-হৃষিকেশের মত যুগল-মূর্ত্তির পূজা হইত। দুর্গা সপ্ত-শতীর প্রাধানিক রহস্যোক্ত সর্ব্বাদিভূতা মহালক্ষ্মী, মহাকালী, বা মহাসরস্বতী অথবা তাহাদের অংশরূপিনী অষ্টাদশ ভুজা মহিষমর্দ্দিনী, দশবদনা কালী, কিম্বা অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর পূজা করিতে হইলেই বিরিঞ্চী-বাণী, হর-গৌরি ও লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা বিধি মধ্যে গণ্য ছিল। (২৫)

৺বক্রেশ্বর পীঠ তীর্থে একটি অষ্টাদশভুজা মহিষ মর্দ্দিনী ও ঐরূপ একটি হর-গৌরির যুগল-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বক্রেশ্বরের পীঠাধিষ্ঠাত্রী সম্বন্ধে পীঠমালা মহাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 'বক্রেশ্বরে মনঃ পাতু দেবী মহিষমর্দ্দিনী'। সুতরাং উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় দৃষ্টে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে বক্রেশ্বরে দুর্গাসপ্তশতীর কথিত নিয়মানুসারে পীঠাধিষ্ঠাত্রী ও অপরাপর মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মৌড়েশ্বরে 'পলাশ-বাসিনী' শক্তিমূর্ত্তি এবং (বক্রেশ্বরের হরগৌরি মূর্ত্তির অনুরূপ) লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্ত্তি দেখিয়া, সেই জন্য অনুমান হয়, যে

(২৫) বীরভূম বিবরণ ১ম খণ্ড বক্রেশ্বর কাহিনী পরিশিঃ ৷৵০ –৸৵০ পৃষ্ঠা।

বক্রেশ্বরে প্রাপ্ত লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্ত্তি।

বীরভূম-বিবরণ ১৭৪ পৃষ্ঠা

বক্রেশ্বরে প্রাপ্ত হরগৌরীর যুগল-মূর্ত্তি

মৌড়েশ্বরে ও কোনো বিশেষ শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন এবং তৎসঙ্গে ঐ পলাশ-বাসিনী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা প্রাপ্ত হইতেন। দুর্গাসপ্তশতী কথিত শক্তিমূর্ত্তি-ষটকের যে কোনো একটির পূজা করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অপর পাঁচটী শক্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিতে হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারাযায় সে কালের শক্তিপূজা কেমন ছিল। মৌড়েশ্বর সেকালে বীরভূমির সেই বিচিত্র শক্তি-পূজার একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

বীরচন্দ্রপুরে একটি দশাবতার চিত্রযুক্ত ভগ্ন বাসুদেব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি বটবৃক্ষ মূলে অপর কতকগুলি ভগ্ন-মূর্ত্তির সহিত তিনি ষষ্ঠী-দেবী রূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বীরভূমে বাসুদেব মূর্ত্তির বাহুল্য বিস্ময় জনক! কৃষ্ণ-প্রস্তরে নির্ম্মিত, সুন্দর, সুঠাম, মনোরম মূর্ত্তিগুলি রাঢ়ীয় তক্ষণ শিল্পের—অত্যুৎকৃষ্ট উদাহারণ। আধুনিক ঐতিহাসিক গণের কাহারো কাহারো মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী গুপ্ত রাজন্যবর্গের সময়ে খৃঃ অঃ ৩২০ - ৪৮০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত হিন্দু ভাস্কর্য্য বিজ্ঞান পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রাচ্য সভ্যতার সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটিয়াছিল খৃঃ ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে। আমাদের অনুমান হয় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্তসভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বীরভূমের বাসুদেব মূর্ত্তিগুলি ঐ সময়ের মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। বীরভূমি যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা একরূপ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। এতদঞ্চলে যে বিষ্ণু-মূর্ত্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই বাসুদেবের অঙ্গ মন্ত্র ও প্রত্যঙ্গ মন্ত্রের মূর্ত্তি। তাঁহার বীজমন্ত্রের প্রকৃত মূর্ত্তি কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি-পুরাণ ও পদ্ম-পুরাণে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণু-মূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীবিনোদ বিহারি কাব্য তীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার বিষ্ণু-মূর্ত্তি পরিচয়ে উক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মূর্ত্তির লক্ষণ, চতুর্ব্যূহের মূর্ত্তি লক্ষণ, ও আরো নানা প্রকার সাধারণ মূর্ত্তির লক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও দশাবতার চিত্রযুক্ত বাসুদেব মূর্ত্তির কোনো উল্লেখ দেখিলাম না। অন্যান্য মূর্ত্তির সম্বন্ধেও পুরাণাদির মতৈক্য নাই। আমরা মৎস্য-পুরাণ হইতে বিষ্ণু মূর্ত্তির নির্ম্মাণ প্রণালী এবং কালিকা-পুরাণ হইতে বাসুদেবের বীজমন্ত্রের ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দশাবতার চিত্র যুক্ত বাসুদেব মূর্ত্তি

বীরভূমে বাসুদেব মূর্ত্তি

"বিষ্ণোস্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি যাদৃগরূপং প্রশস্যতে।
শংখ চক্রধরং শান্তং পদ্মহস্তং গদাধরম্॥

ছত্রাকারং শিরস্তস্য কম্বুগ্রীবং শুভেক্ষণম্।
তুঙ্গনাসং শুক্তিকর্ণং প্রশান্তোরু ভুজক্রমম্॥
কচিদষ্টভুজং বিত্তাচ্চতুর্ভুজ মথাপরম্॥
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা॥

বিষ্ণু মূর্ত্তির নির্ম্মাণ প্রণালী

দেবস্যাষ্টভুজস্যাস্য যথাস্থানং নিবোধত।
খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দিব্যং দক্ষিণতো হরেঃ॥
ধনুশ্চ খেটকঞ্চৈব শংখ চক্রো চ বামতঃ॥
চতুর্ভুজস্য বক্ষামি যথৈবায়ুধ সংস্থিতিঃ॥
দক্ষিণেন গদা পদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ।
বামতঃ শংখ চক্রেচ কর্ত্তব্যো ভূতি মিচ্ছতা॥
কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শংখ চক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ।
অধস্তাৎ পৃথিবী তস্য কর্ত্তব্যা পাদমধ্যতঃ।
দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদ্গরুত্মন্তং নিবেশয়েৎ॥
বামতস্তু ভবেল্লক্ষ্মীঃ পদ্মহস্তা শুভাননা।
গরুত্মানগ্রতো বাপি সংস্থাপ্য ভূতিমিচ্ছতা॥
শ্রীশ্চ পুষ্টিশ্চ কর্ত্তব্যো পার্শ্বয়োঃ পদ্মসংযুতে।

ইহা গেল মৎস্য-পুরাণের মত। নিম্নে কালিকা পুরাণোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইল

বাসুদেবের ধ্যান

"পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীত বস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীত দেহভৃৎ॥
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাংধত্তে তদধো বিকচাম্বুজং।
বামোর্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রাং ধত্তেঽধঃ শংখমেবচ॥
শ্রীবৎস বক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদি চাংশুমৎ।
ধত্তে স্কন্ধে হ্যধো বামে তুণীরং বাণ পূরিতম।
দক্ষিণে কোষগং খড়্গাং নন্দকং সশরাসনং।
শীর্ষে কিরীটং সুভোজং কর্ণয়ো কুণ্ডলদ্বয়ং॥
আজানু লম্বিনীং চিত্রাং বনমালাং গলেস্থিতাম।
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বেতু বিভ্রতম।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ বরদং হরিম্॥

গর্ভবাস (বীরচন্দ্রপুর) ও তারাপীঠের মধ্যবর্ত্তীস্থানে ডবাক বা ডাবুক নামে

গ্রামে। জানিনা ইহার সহিত বাঙ্গালার প্রাচীন-বিভাগ 'ডবাকের' কোনো সংস্রব আছে কিনা। এই গ্রামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে ডাবুকেশ্বর-শিব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রবাদ, তৃতীয় পাণ্ডব-অর্জ্জুন এই শিবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। একটি উচ্চ-স্তূপের উপর ক্ষুদ্র জীর্ণ-মন্দিরে এই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চতুর্দ্দিকে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ বাস করিয়া স্থানটিকে একরূপ হিন্দুর অগম্য করিয়া রাখিয়াছিল। কৈলাসানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়া, তথায় প্রকাণ্ড মন্দির ও অতিথি-শালা আদি নির্ম্মাণ করাইয়া এবং শিবের সেবা-ভোগাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া সত্য সত্যই স্থানটিকে এক মহিমান্বিত শ্রীসম্পদ-দানে তীর্থগৌরবে-গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে কম কষ্ট পাইতে হয় নাই। মুসলমানগণ তাঁহাকে নানারূপে বিপন্ন করিয়াছে, প্রাণ-সংশয়কর সাংঘাতিক-আঘাতে আহত করিয়া সংন্যাসীকে শয্যা-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে, মহাপ্রাণ সাধু তথাপি-লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়েন নাই। দ্বিগুণ-উদ্যমে, দৃঢ়-পদক্ষেপে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। শুনিতে পাই, ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল,—তাহাতেও কৈলাসানন্দ জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই বিরাট-মন্দির ও সুবিশাল-চত্বর দর্শকের হৃদয়ে বিস্ময়োৎপাদন করে। শুনিয়াছি এই কার্য্যে সন্ন্যাসী লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। সমস্ত অর্থই ভিক্ষালব্ধ, এবং ভিক্ষার অধিকাংশই বঙ্গের কৃষক-পল্লী হইতে সংগৃহিত। এই ধর্ম্মপ্রাণ সন্ন্যাসীর পরিচয়—

ডাবুকের শিব

কৈলাসানন্দ স্বামী

পূর্ব্ব-নিবাস উলা। পিতার নাম মহাদেব মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম তারাদেবী। পূর্ব্বনাম ভুবনমোহন। শৈশবের আদরের নাম শম্ভু। শুনিতে পাওয়া যায়—ইহাদের বিস্তৃত জমিদারী ও কয়েকটি নীলকুঠী ছিল। অম্বিকা-নগরের রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মোক্ষদায়িনীর সহিত ভুবনমোহনের প্রথম বিবাহ হয়। অল্পদিনের মধ্যে মোক্ষদায়িনী গতায়ু হইলে নদীয়া-জেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের মাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা সুবুদ্ধিদেবীর সহিত দ্বিতীয়-বার তিনি পরিণয়াবদ্ধ হন। বিবাহের কিছুদিন পরে সুবুদ্ধিদেবীও পরলোক-গমন করেন। মহাদেব বাবু মাণিকচন্দ্রের এক ভাগিনেয়ী সখীদেবীর সঙ্গে পুনরায় ভুবনমোহনের বিবাহ দেন। এই বিবাহের কিছুদিন পরেই মহাদেব বাবু ইহলোক ত্যাগ করেন।

স্বামীর পূর্ব্ব পরিচয়

পিতৃবিয়োগের পর সংসারের কর্ত্তৃত্বভার লইয়া—নীলকুঠীর জন্য গুরুতর পরিশ্রমে ভুবনমোহন উদরাময়-রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ তাঁহার

জীবনাশা পরিত্যাগ করিলে হঠাৎ এক ব্রহ্মচারী আসিয়া দৈব-উপায়ে তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়া দেন। এই ঘটনার পর ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ক্রমেই ভুবনমোহন সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, অতঃপর একদিন সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন। আট বৎসরকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়া তিনি সংবাদ পান যে জননী তারাদেবী ও পত্নী সখীদেবী পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবার অল্পদিন পরে ৺বেণীমাধবের মঠে সুপ্রসিদ্ধ আউলানন্দ স্বামীর নিকট তিনি দণ্ডগ্রহণ করেন, এবং গুরুদত্ত কৈলাসানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। কাশীধামে অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে দণ্ডী, হংস, পরমহংস, ও জ্যোতির্ম্ময় আচার সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া, চরমযোগ-শিক্ষার জন্য (৺কাশীস্থ) স্বামী প্রকাশানন্দের শরণ গ্রহণ করেন। প্রকাশানন্দের নিকট চরমযোগ-শিক্ষালাভে সফল-মনোরথ হইয়া ৺কাশী পরিত্যাগ করিয়া তিনি ৺বৃন্দাবনে গিয়া উপনীত হন। বঙ্গাব্দ ১২৪৫ সালে তিনি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকেশীঘাট মার্জ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর কৈলাসানন্দ বাঙ্গালায় শ্রীধাম-নবদ্বীপে আগমন করেন, এবং বাঙ্গালা ও আসামের নানা তীর্থ-পর্য্যটনানন্তর ১২৭০ সালে বীরভূমের মৌড়েশ্বর-থানার অন্তর্গত মাঠবহরা গ্রামে উপস্থিত হন। এই সময় তিনি কেবলমাত্র ফলমূলাহারে জীবনধারণ করিতেন। পরিধানে কৌপীন পর্য্যন্ত ছিল না। সর্ব্বদাই উলঙ্গ থাকিতেন। মস্তকে বিশাল জটাভার, গলদেশে তুলসীর মালা, হস্তে বিল্বদণ্ড, অঙ্গে তরঙ্গিত স্নিগ্ধ জ্যোতি, দেখিলেই ভক্তির উদয় হইত। মাঠবহরার তহসিলদার দক্ষিণগ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহারনি কট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ-গ্রামে লইয়া আসেন। দক্ষিণগ্রাম হইতে চন্দ্রনাথ-তীর্থ ভ্রমণে গিয়া কৈলাসানন্দ ডাবুকেশ্বর-মন্দির নির্ম্মাণের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। ১২৭০ সালে তিনি দক্ষিণগ্রামে আসিয়াছিলেন, ১২৮৩ সালে ডাবুকেশ্বর-মন্দিরের ভিত্তি-পত্তন হয়। শুনিতে পাওয়া যায়—মন্দিরের বুনিয়াদ খননকালে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মন্দিরাদির ভিত্তিচিহ্ন সকল দেখিতে পাইয়া তদনুসারেই বর্ত্তমান মন্দির ও অতিথিশালাদির সীমা-সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কৈলাসানন্দ বলিতেন পূর্ব্বের মন্দিরাদি যেমন বিশাল, তেমনি বিরাট্ ছিল। ১২৮৭ সালের ২রা আষাঢ় বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

গৃহত্যাগ ও ৺কাশীধামে দণ্ড গ্রহণ

বীরভূমে কৈলাসানন্দ

ডাবুকেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ

শুনিতে পাই, কাশ্মীরাধিপতি মহারাজা রণবীরসিংহ পীড়িত হইয়া কৈলাসানন্দকে কাশ্মীর-আগমনে অনুরোধ করিয়া বীরভূমে কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন।

৫৭ নং বীরচন্দ্রপুরের দশাবতার চিত্রযুক্ত বাসুদেব মূর্ত্তি।
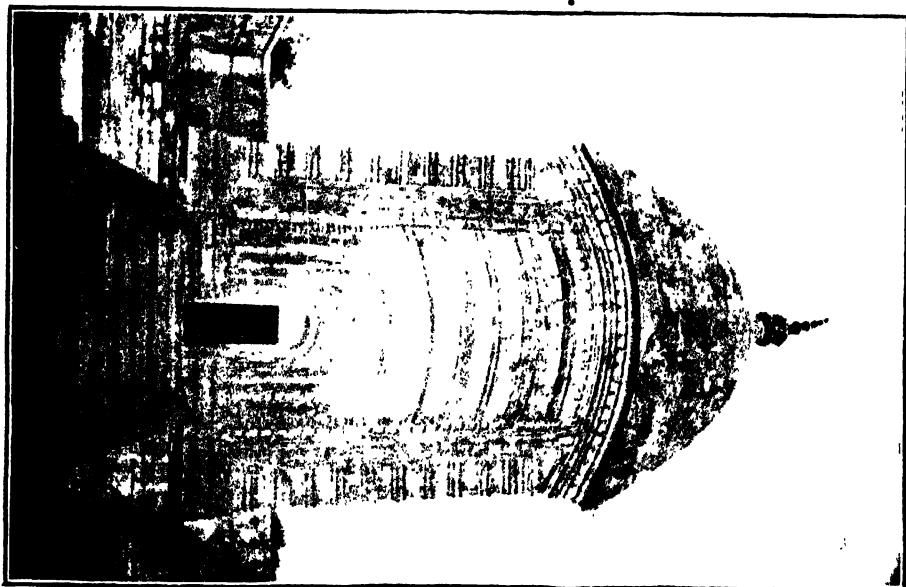
৫৮ নং ভবাকেশ্বরের মন্দির।

সন্ন্যাসী কিন্তু কাশ্মীর-গমনে স্বীকৃত হন নাই। পরে—১২৯৬ সালে ভাদ্রমাসে তিনি অমরনাথ-তীর্থ-দর্শনে গমন করিলে, সংবাদ পাইয়া কাশ্মীরপতি তাঁহাকে স্বরাজ্যে লইয়া যান। দুঃখের বিষয় মহারাজা রণবীরসিংহ তখন পরলোকে। তদানীন্তন কাশ্মীরেশ্বর মহারাজা প্রতাপসিংহ, রাজভ্রাতা রাজা শ্রীযুক্ত রামসিংহ, ও অমরসিংহ তাঁহার যথারীতি অভ্যর্থনা করেন। ভাবুকেশ্বর-শিবের ভোগের জন্য কাশ্মীর-ষ্টেট্ হইতে বার্ষিক ৬০০ ছয়শত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। কাশ্মীরাধিপতি ও তদীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদিত এই বৃত্তি-ব্যবস্থার শাসন-পত্রখানি সম্প্রতি শ্রীমদ্ কুমারানন্দ স্বামীর নিকট রহিয়াছে। কৈলাসানন্দের মোক্ষলাভের পর—তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া ইনিই এখন ভাবুকেশ্বরের গদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২৯৭ সালের ২০শে বৈশাখ হইতে ৺শিবের অন্নভোগের ব্যবস্থা হয়, প্রত্যহ ৮।১০ জন ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী প্রসাদ পাইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৩২৪ সালের পর কাশ্মীর-ষ্টেট্ হইতে আর টাকা আসিতেছে না। সম্প্রতি রাইপুর (বীরভূম) নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ সিংহ মহাশয় নিত্য-পূজা ও ভোগাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। আশাকরি স্বামী কুমারানন্দকেও কাশ্মীর-ষ্টেট্ হইতে যথারীতি বার্ষিক-বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

কাশ্মীর-পতি ও কৈলাসানন্দ

বৃত্তি-লাভ

বৃত্তি-বন্ধ

শিষ্য-কুমারানন্দ

মাঠ-বহরায় অবস্থানকালে কৈলাসানন্দ এক শূদ্র-কন্যাকে ভৈরবী গ্রহণ করেন। ভৈরবী—শুভঙ্করী নামে পরিচিতা ছিলেন। শুনিয়াছি—তন্ত্রশাস্ত্রে শুভঙ্করীর অভিজ্ঞতা নাকি পণ্ডিতগণেরও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। শুভঙ্করীও কাশ্মীর গিয়াছিলেন। শুভঙ্করীর পরলোকগমনের পর সন্ন্যাসী পুনরায় এক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ভৈরবীরূপে গ্রহণ করেন। ভৈরবীর নাম রাখা হয় কুলানন্দা। কুলানন্দা নাকি কৌলমতে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন, এবং তিনি বেশ গাহিতে পারিতেন; আবার সংগীত-রচনাও করিতেন। কৈলাসানন্দের নিষেধ না মানিয়া গত কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে গিয়া কুলানন্দা কলেরারোগে গঙ্গালাভ করেন। কুলানন্দার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বামীর-ভৈরবী

বাগেশ্রী, একতালা।

নীলিম-গভীর-হ্রদে যেন কনক-সরোজিনী।
শ্যাম-হৃদি-পরে শোভা করে রাই-রমনী-মণি॥
মরি কি চরণতল কোটী-চন্দ্র-সুশীতল
করিতেছে কল-কল চাঁদ-প্রেমে চকোরিণী।
আহা কি মধুর-হাসি অমিয়া পড়িছে খসি
নবীন জলদে যেন খেলিতেছে সৌদামিনী॥

ভৈরবীর গান

বিকচ কমল-দল কাল-আঁখি ঢল-ঢল
ছুটীছে আকুল-ভৃঙ্গ ভরমে-নলিনী।
চিকণ কুন্তল-বেণী হেরি ধায় খগমণি
একান্তে হেরিছে রূপ কুলানন্দা একাকিনী॥

বিগত ১৩২৪ সালের ১৬ই মাঘ রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় রক্তামাশায়রোগে স্বামী কৈলাসানন্দ স্বর্গগমন করেন।

ভাবুক ও কোটাসুরের বাসুদেব মূর্ত্তি

ভাবুকেশ্বরে—শিবমন্দির-নির্ম্মাণ-জন্য মৃত্তিকা-খনন-কালে দুইটি বাসুদেব-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তি দুইটি শিব-মন্দিরের বহির্দ্দেশে রক্ষিত হইয়াছে। চিত্রের বাম পার্শ্বের মূর্ত্তিটি—পক্ষিরাজোপরিস্থিত, এবং তরবারি-আদি-ভূষিত হইলে বাসুদেব-আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিত। মূর্ত্তির দক্ষিণে পদ্মহস্তা-শ্রী ও বামে বীণাহস্তা-পুষ্টি রহিয়াছেন। শঙ্খাদি স্থাপন-ক্রম দেখিয়া পদ্ম-পুরাণ-মতে ইহাকে নৃসিংহ, সিদ্ধার্থ-সংহিতার মতে ত্রিবিক্রম বা অধোক্ষজ, এবং অগ্নি-পুরাণ মতে অধোক্ষজ মূর্ত্তি বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। চিত্রের-দক্ষিণ-দিকের মূর্ত্তিটি অগ্নি-পুরাণ এবং সংহিতার মতে 'জনার্দ্দন', পদ্ম-পুরাণ মতে 'অচ্যুত'। এতদঞ্চলের বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলিকে আমরা সাধারণতঃ বাসুদেব-আখ্যায় অভিহিত করিয়াছি। ভবাকে-প্রাপ্ত মূর্ত্তি অপেক্ষা কোটাসুরের মূর্ত্তি দুইটি দেখিতে আরও মনোরম, সুন্দর কারুকার্য্য-যুক্ত। চিত্রের বাম-দিকের বড় মূর্ত্তিটি প্রায় অভগ্ন পাওয়া গিয়াছে। পদ্মাদি স্থাপন-ক্রম দেখিয়া মূর্ত্তি দুইটিকেই অগ্নি-পুরাণ-মতে 'অধোক্ষজ', পদ্ম-পুরাণ মতে নৃসিংহ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতার মতে অধোক্ষজ বা ত্রিবিক্রম-আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। পার্শ্বের মূর্ত্তি দুইটিই স্ত্রী মূর্ত্তি। দক্ষিণের মূর্ত্তিটির হস্তদ্বয়ে চামর রহিয়াছে। বামের মূর্ত্তি বীণা-ধারিণী। মূর্ত্তিদ্বয়কে শ্রী ও সরস্বতী বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্কিমরায় ও বসু-জাহ্নবা

বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাসে বৈষ্ণবগণের স্থাপিত কয়েকটি বিগ্রহমূর্ত্তির সেবা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বীরচন্দ্রপুরে বঙ্কিমরায়—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ অনেকেই নিত্যানন্দ-পুত্র-বীরচন্দ্রপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে যে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি পূজা-প্রাপ্ত হইতেছেন, গোস্বামীগণ বলেন তাঁহার একটি বসুধার, অপরটি জাহ্নবাদেবীর। বঙ্কিম-

বঙ্কিমরায়ের মন্দিরে মহিষমর্দ্দিনী

রায়ের মন্দিরে একটি দশভূজা মহিষ-মর্দ্দিনী (মূর্ত্তিটি খুব ছোট) মূর্ত্তি পূজা-প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রাচীন মূর্ত্তিটি ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় তাঁহার স্থানে

৬১ নং বীরচন্দ্রপুরের বঙ্কিম রায়ের মন্দির।
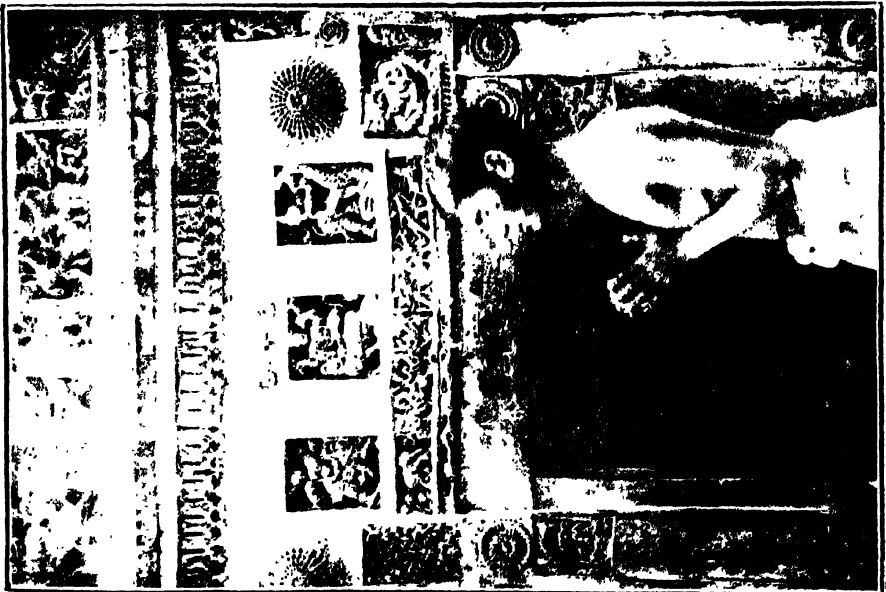
৬২ নং মল্লারপুরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির।

এই নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই মহিষমর্দ্দিনী হাড়াই-পণ্ডিতের কুলদেবতা। খড়দহে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের ত্রিপুরা-যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা হাড়াই-পণ্ডিতের বংশানুক্রমিক শক্তি-উপাসনা সপ্রমাণ করিতে চাহেন। আমরা এই মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ভেদ-বুদ্ধি বিরহিত না হইলে প্রকৃত সাধক হওয়া যায় না। বাস্তবিকই শক্তি ও বিষ্ণুতে কোনো প্রভেদ নাই। মহামায়ারই অপরা মূর্ত্তি যোগমায়া। রসতত্ত্বজ্ঞগণ জানেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-মধুময়ী-ব্রজলীলা এই যোগ-মায়াকে আশ্রয় করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলি-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্য-দেব তাঁহার জীবনে এই অভেদ-জ্ঞানই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তীর্থ-পর্য্যটন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ধর্ম্মে গোঁড়া-পাতী' বলিয়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নাই। নৈষ্ঠিকতা ও গোঁড়ামী এই দুইয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যাঁহারা আমাদের ধর্ম্ম-কলহের উল্লেখে অনৈক্যের কথা তুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, একজন দেশ-পূজ্য নৈষ্ঠিক-বৈষ্ণবের গৃহে প্রতিষ্ঠিত এই শক্তি-মূর্ত্তি তাঁহাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

একচক্রায় বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠিত-বিগ্রহ-সেবা

বীরচন্দ্রপুরের এই বঙ্কিমরায় বিগ্রহ ভিন্ন বিশ্রামতলায় রামকৃষ্ণ, কদম্বখণ্ডীতে 'শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ', গর্ভবাসে 'শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ' বকুল-তলায় 'রাধাকান্ত, ও গর্ভবাসের অদূরে চোঙা-ধারী বাবাজীর আশ্রমে গিরিধারী বিগ্রহ-মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। কিন্তু সেবা-পূজার অবস্থা তেমন সুবিধা-জনক নহে। এক একটি আশ্রমে এক একজন বাবাজী যেন নির্ব্বাসনে কালযাপন করিতেছেন। অনেকেই মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া এই দেব-সেবা নির্ব্বাহ করেন। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এদিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতেছি।

চোঙাধারী বাবাজী

পূর্ব্বে যে চোঙাধারী বাবাজীর উল্লেখ করিয়াছি তিনি একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। এই ভক্তিমান্ সাধক শতাধিক বর্ষ কাল দেহ ধারণ করিয়া সম্প্রতি সাধনোচিত-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ইঁহার বিশেষ কোনো পরিচয় জানিতে পারি নাই। বীরচন্দ্রপুরের গোস্বামী-বংশে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী মহাশয় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি বীরচন্দ্রপুরের জামাতা, শ্বশুর-কুলে পুরুষ-উত্তরাধিকারী না থাকায় শ্রীবঙ্কিমরায়ের ৺সেবাদির তত্ত্বাবধান ও বিষয়-কার্য্য পরিদর্শন জন্য বীরচন্দ্রপুরে অবস্থানে বাধ্য হইয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় সজ্জন, বিনয়ী ও সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি কি—বীরচন্দ্রপুরে

বৈষ্ণব-শাস্ত্র পঠন-পাঠনের কোনো ব্যবস্থা করিতে পারেন না? জয়দেব চণ্ডীদাস-নিত্যানন্দের জন্ম ভূমিতে এই অভাব বড়ই যন্ত্রনা-দায়ক।

মৌড়েশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থা

মৌড়েশ্বরে পুলিশ থানা, পোষ্টাফিস, এবং একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়টির অবস্থা তেমন সন্তোষ জনক নহে। স্থানীয় জনসাধারণের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মৌড়েশ্বরে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া হাট বসে, হাটে নানাবিধ তরিতরকারি আদি বিক্রীত হয়। এতদ্ভিন্ন কাপড়, মসল্লা ও মিষ্টান্নের কয়েকটি স্থায়ী দোকান আছে। ই, আই, আর, ষ্টেশন সাঁইথিয়া হইতে মৌড়েশ্বর পর্য্যন্ত একটি কাঁচা সড়ক আছে। তবে বর্ষায় সে পথে গমনাগমন অসাধ্য। কিন্তু এই সব বিষয়ে বীরভূমের কোন্ স্থান রাখিয়া কোন্ স্থানের কথা বলিব? আধি-ব্যাধির-কষ্ট, অন্ন-কষ্ট, জল-কষ্ট, পথ-কষ্ট, বীরভূমের কষ্টের সীমা নাই। বর্ত্তমান বীরভূমের দুর্দ্দশা সর্ব্বত্রই একরূপ।

৫৯ নং ভবাকের বাসুদেব মূর্ত্তি।

৬০ নং কোটাসুরের বাসুদেব-মূর্ত্তি।
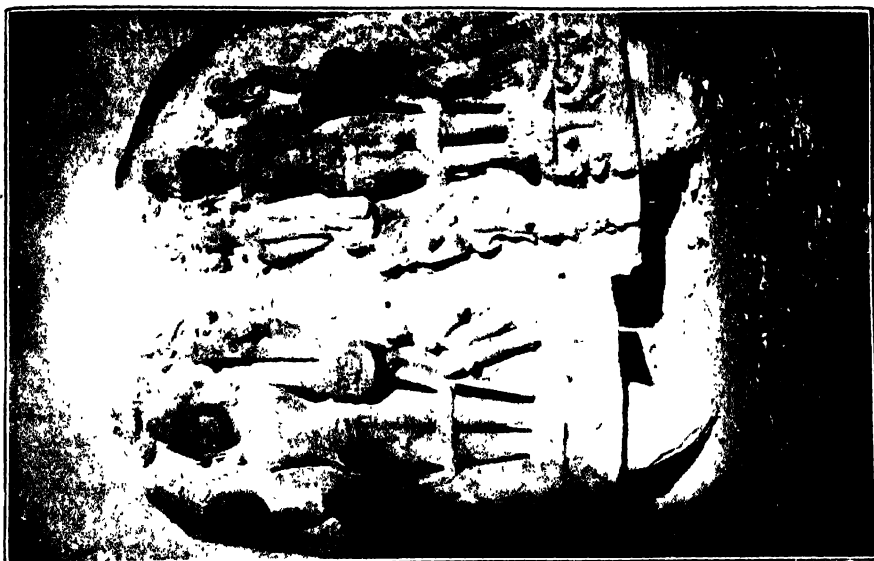
মল্লারপুর-কাহিনী

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের লুপলাইনে—অন্যতম ষ্টেশন- মল্লারপুর। ইহা ময়ূরেশ্বর-থানার অন্তর্গত। ষ্টেশনের অনতি দক্ষিণ-পশ্চিমে মল্লারপুর গ্রাম,—এবং উত্তর-পূর্ব্বে নাতিদূরে ফতেপুর গ্রাম—নিকটে একটি ক্ষুদ্র বাজার। মল্লারপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে 'মল্লেশ্বর' নামে অনাদিলিঙ্গ-শিব বর্ত্তমান আছেন। অনেকেই বলেন "বীরভূমৌ—সিদ্ধনাথো রাঢ়েচ তারকেশ্বর" তন্ত্রোল্লিখিত এই 'সিদ্ধনাথ'ই মল্লেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মল্লারপুর পূর্ব্বে 'মল্ল' নামধারী কোনো রাজার রাজধানী ছিল। নিকটবর্ত্তী মলুটীগ্রাম, কনকপুর সন্নিহিত মলয়া বা মল্লপুর, ও মল্লেশ্বরীদেবী, এবং নারায়ণপুরস্থিত মল্লেশ্বর শিব দেখিয়া অনুমিত হয়—মল্লরাজ্য হয়তো মল্লপুর ও নারায়ণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন মল্লভূমি (বর্ত্তমান বাঁকুড়া) ও তত্রত্য মল্লরাজগণের নাম সুপরিচিত। কিন্তু মল্লভূমির অধীশ্বরগণ যে কখনো মল্লারপুর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রবাদ-কাহিনীতে বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়,—মল্লারপুর মল্ল-উপাধিধারী কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তির রাজধানী ছিল। প্রবাদ-অনুসারে এই মল্লরাজ, দেশে—যবনাগমনের দৈববাণী শুনিয়া প্রাসাদ-পার্শ্বস্থ সরোবরে নৌকারোহণে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করেন। রাজার সেই সলিল-সমাধি,—গোউরা বা গৌড়-সরোবর এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে। মল্লেশ্বর মন্দিরের দ্বার-উর্দ্ধে ১১২৪ শকাব্দা ক্ষোদিত আছে। প্রবাদের মতে ঐ মন্দির মল্লরাজের প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মল্লরাজ তখন বর্ত্তমান ছিলেন। শিলালিপি যদি প্রকৃত হয়, তবে সে সময় দেশে যে যবনভীতি প্রবেশলাভ করিয়াছিল—সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ থাকে না। শকাব্দ-হিসাবে বুঝিতে পারা যায়,—মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পূর্ব্বে বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং তৎপূর্ব্ব হইতেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ মুসলমান আক্রমণে পুনঃ পুনঃ উপদ্রুত হইতেছিল। ১১৯৩ খৃঃ অঃ তরায়ণের রণক্ষেত্রে দিল্লীর শেষ হিন্দু-সম্রাট বীরবর পৃথ্বীরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের-সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। তদবধি কত সম্রাটবংশ-লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কত

মল্লারপুরে মল্লেশ্বর

মল্লরাজ

অভিমানী আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য জীবনাধিক স্বজন পরিজনসহ স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করিয়াছেন, কে তাহার সন্ধান রাখে? সে সবের অধিকাংশ ইতিকথাই এখন বিস্মৃতির-অতল-তলে সমাধি-শায়িত। শুধু মাঝে মাঝে এইরূপ ধ্বংসস্তূপ, আর জনশ্রুতির মুখর-রসনায় রটিত,—স্থানে স্থানে প্রচলিত সেই অতীত কাহিনীর এই সমস্ত বিচ্ছিন্নসূত্র,—থাকিয়া থাকিয়া একটা বেদনার ব্যথা জাগ্রত করিয়া দেয়।

মল্লরাজের সম্বন্ধে প্রবাদ,—

মেষপালকের পদ্মিনী কন্যা

"মল্লারপুরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান ফতেপুর, পূর্ব্বকালে প্রায় বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, কতক গুলি বন্যজাতি তথায় বাস করিত। বন-পল্লীর দামুমেড় নামক একজন মেষপালকের পদ্মিনী-লক্ষণাক্রান্তা (চারিজাতীয়া রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) একটি কন্যা ছিল। কন্যার অতুলনীয় রূপ, অনুপম অঙ্গ-গন্ধ,—লোকে মনে করিত দেবকন্যা। পদ্মিনীর কৈশোর অতিক্রান্ত হইতে চলিল, কিন্তু উপযুক্ত বর মিলিল না। প্রায় কেহই বিবাহ করিতে চাহে না,—আবার যদি কোনো দুঃসাহসী অগ্রসর হয়,—দামু তাহাকে পছন্দ করে না, বিবাহে বিভ্রাট বাধিয়া গেল। এইরূপেই দিন যায়। তারপর একদিন—সে তখন ফাল্গুনমাস; নব-বসন্তের প্রথম সমাগমে ধরণী যেন নবলাবণ্যে মণ্ডিত হইয়াছে, কাননকান্তার প্রান্তর-কেদার রূপে—বর্ণে—গানে—গন্ধে যেন ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মিনী গিয়াছে স্নান করিতে, স্নান শেষ করিয়া তরুণী যখন তীরে উঠিল, তাহার সেই সদ্যোস্নাত-লাবণ্যদ্যুতি যেন বসন্তের প্রভাতকেও রঞ্জিত করিয়া দিল। কুমারী ঘরে ফিরিবে, এমন সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে দৃঢ়-আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিল। কেমন করিয়া কি ঘটিল মুগ্ধা তাহা বুঝিল না। সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্রলাভের বর দান করিয়া কিশোর-সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, পদ্মিনীর যখন চমক ভাঙ্গিল—চাহিয়া দেখে যন্ত্র-চালিতার মত আপনার অজ্ঞাতে সে কখন ঘরে ফিরিয়াছে!

পদ্মিনী ও সন্ন্যাসী

পদ্মিনীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে, লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল। লোক লজ্জায় দামু কন্যাকে 'বনবাস' দিল; তাহাদের পল্লী হইতে কিছুদূরে গিয়া পদ্মিনী গহন-বনে কুটীর বাঁধিল। পদ্মিনী বনেই থাকে, সন্ন্যাসীর কৃপায় তাহার কোনো কিছুরই অভাব হয় না। যথাকালে তাহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রতো নয়, যেন দেবোদ্যানের মন্দারগুচ্ছ! বড় আনন্দেই পদ্মিনীর দিন কাটিতে লাগিল। একদিন—রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, হঠাৎ কুটীরের

পদ্মিনীর পুত্র

আগল খুলিয়া গেল। পদ্মিনীর তন্দ্রা আসিয়াছিল, জাগিয়া দেখিল, শিশুকে তাহার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া কে যেন কাটিতে উদ্যত হইয়াছে। ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল, আততায়ী অন্তর্হিত হইয়াছে। পদ্মিনী আশ্বস্তা হইল, তবে ভয় তো গেল না, কুটীরের আগল বন্ধ করিয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইল।

রজনী প্রভাতে দামুমেড় আসিয়া উপস্থিত। নিদারুণ অনুশোচনায় বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল এবং কেমন করিয়া এই দেবানুগৃহিত শিশুকে হত্যা করিবার জন্য সে তাহার পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ হেন গহনে গভীর রাত্রিতে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া কিরূপে সেই 'অতিবড় জোয়ান'কে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত করিয়াছে, পুনঃ পুনঃ সেই সব কথাই বলিতে লাগিল। যাহা হউক অনেক অনুযোগ ও চক্ষুজলের বিনিময়ে শেষে পিতা-পুত্রীর মিলন হইল, বৃদ্ধ মেড়' আপন কন্যা ও তাহার কানীন্ পুত্রকে লইয়া ঘরে ফিরিল। মহাসমারোহে দামু-দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়া গেল, সামাজিকগণ প্রকাণ্ড-ভোজে পরিতুষ্ট হইলেন, স্বয়ং সন্ন্যাসী আসিয়া সর্ব্বকার্য্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, পুত্রের তিনি নাম রাখিলেন 'মল্লনাথ'। মল্লনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, সন্ন্যাসী তাহাকে শস্ত্র-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিলেন। ধন-বলে কি না হয়? ক্রমে বন—নগর হইল, মেড়-দৌহিত্র রাজোপাধি গ্রহণ করিল।"

পিতাপুত্রীর মিলন

মেড়দৌহিত্র মল্লরাজ

মল্লনাথ রাজা হওয়ার পরেই সিদ্ধনাথ প্রকাশিত হন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ঘটিয়াছিল। মুচিরাম ঘোষ নামে কোনো গোপ-নন্দন এক বৃক্ষতলে আপনার পয়স্বিনী-ধেনুর ক্ষীরধারা ক্ষরিত হইতে দেখিয়া রাজাকে সংবাদ দেয়। রাজা খনক ডাকাইয়া বৃক্ষতল খননের আদেশ দেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে বাহির হইয়া পড়ে,—প্রকাণ্ড এক পাষাণ-স্তূপ। দৈববাণী হয়—"ইনিই জয়দ্রথপূজিত সিদ্ধনাথ, রাজাকে ইহার পূজার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এখন হইতে সিদ্ধনাথ,—'মল্লনাথ' নামে খ্যাত হইবেন। রাজা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, পূজার ব্যবস্থা করিয়াদিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর রাজার প্রতি আর একবার দৈববাণী হয়—"দেশে যবনাধিকার কাল আগত প্রায়, তুমি তনুত্যাগ কর"। দৈবাদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল, রাজা সপরিবারে গৌড় পুকুরের-জলে জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মল্লনাথের রাজ্য—সম্বন্ধীয়

সিদ্ধনাথ প্রকাশ

মল্লরাজ তনুত্যাগ

প্রবাদের সমর্থন জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—কেলিসরোবর, (রাজারাণী স্নান করিতেন) মালঞ্চডাঙ্গা, (রাজার উদ্যান ছিল) ঘোড়াডাঙ্গা ও হাতীশালা, (রাজার ঘোড়া ও হাতী থাকিত) গোয়ালিয়া গ্রাম ও মৈষা কুড়া গ্রাম, (রাজার গো-মহিষ রক্ষিত হইত) বিলুপ্তাবশেষ পরিখা চিহ্ন ইত্যাদি।

রাজ্যের শেষ নিদর্শন

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মল্লভূমের অধীশ্বরগণ এক সময় সবিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়—তাঁহাদের সুবিখ্যাত শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ (অধুনা কলিকাতা বাগবাজারে অধিষ্ঠিত) বীরভূমেরই সম্পত্তি। বীরভূমি আক্রমণ করিয়া জয়গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ, কোনো মল্লরাজ নাকি এই বিগ্রহ স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় রণ্যাড়া নামে একখানি গ্রাম আছে, এই গ্রামে আর একটি মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ক্ষোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায়, বিগ্রহ—সেনপাহাড়ী হইতে আনীত। রাজা বীরসিংহ ৯৭৬ অতীত মল্লাব্দে (প্রায় আড়াইশত-বৎসর পূর্ব্বে) বঙ্গাব্দ ১০৭৭ সালে এই বিগ্রহের উদ্দেশে এক শিলা-রচিত-মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গনে পতিত একখণ্ড শিলাফলকে নিম্নকথিত কবিতাটি ক্ষোদিত আছে।

বীরভূমি ও মল্লভূমি

৺ষটপর্ব্বত গ্রহমিতে গত মল্লবর্ষে—
শ্রীবীরসিংহ নৃপতিঃ প্রবল প্রতাপঃ।
শ্রীরাধিকা মদনমোহন তৃপ্তি কামো
দত্তে শিলারচিত মন্দির মাদরেণ॥

বোধ হয় বীরসিংহ নৃপতিই বিগ্রহ-যুগলকে সেনপাহাড়ী হইতে রণ্যাড়ায় লইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় নাই। সেনপাহাড়ীর অবস্থা সে-সময় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। লোকাবাসশূন্য পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ জীর্ণ মন্দিরে তখন বিনোদ রায়, মদনমোহন প্রভৃতি বহু বিগ্রহ প্রায় অপূজিত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। কেন্দুবিল্ব হইতে পূজক-ব্রাহ্মণ গিয়া একবার মাত্র কেবল পূজাই করিয়া আসিত, মধ্যাহ্নভোগ বা সান্ধ্যশীতলাদির কোনো ব্যবস্থাই ছিলনা; অজয়ে বন্যা প্রবল হইলে আবার সবদিন পূজাও ঘটিয়া উঠিত না। বর্দ্ধমানের নৈরাণীদেবী বিনোদরায়কে আনিয়া কেন্দুবিল্বে প্রতিষ্ঠা করেন। কবিরাজ-গোস্বামী জয়দেব-পূজিত শ্রীরাধামাধবের শূন্যাসন এখন বিনোদরায়ই অধিকার করিয়া আছেন। এইরূপ-প্রায় সম-সময়েই মল্লরাজ কর্ত্তৃক নীত হইয়া মদন-

সেনপাহাড়ীর শেষ-বিগ্রহ

মোহন রণ্যাড়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। রণ্যাড়ায় জয়দেব-কেন্দুবিন্বের অনুকরণে প্রতি পৌষ-সংক্রান্তিতে আজিও একটি ক্ষুদ্র মেলা হয়, তাহারো নাম "কেন্দুলীর মেলা"। যাহা হউক মল্লরাজ বা মল্লভূমি হইতে যে মল্লারপুরের নামকরণ হইয়াছিল, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—(১)—

মল্লজাতির পৌরাণিক পরিচয়

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাল্লিচ্ছবি রেবচঃ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচঃ॥"

এই সমস্ত জাতি ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভে উদ্ভূত হইয়াছিল। কুলশাস্ত্রের প্রমাণে—

"লেটস্তীবর কন্যায়াং জনয়ামাস মল্লরাণ্।
মাল্লং মল্লং মাড়বঞ্চ ভড়ং কোলাঞ্চ কন্দরম্॥"

বীরভূমে বাগ্দি-জাতির একটি উচ্চতর-শ্রেণী আছে, তাহাদের উপাধি মাল। এই জাতি পূর্ব্বে যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল, এবং সেই জন্য ইহাদের উপাধি ছিল মল্ল। মল্ল অপভ্রংশে এখন মাল হইয়াছে। এইরূপ মেড় মাড়বের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। বীরভূমে লেট, তীবর, মাল, ভড় ও মালাজাতি এখনো বর্ত্তমান আছে। মাড়ব, কোলা ও কন্দর জাতির অস্তিত্ব আমাদের অজ্ঞাত। মাড়-গ্রামে মাড়বজাতি ছিল কিনা সন্দেহ হয়। এখন যে জাতি মেচ নামে পরিচিত, তাহারা মেড়, সুতরাং মাড়ব ছিল কিনা তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। প্রাচীন কালে হয়তো ইহারাও ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত ছিল। মল্ল ও তীবর জাতির পরাক্রমের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মল্লনাথ যে ইহাদেরই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। মল্লারপুরের ঝুমুর-গান প্রসিদ্ধ। বহুকাল হইতে ইতর-জাতীয়া একশ্রেণীর নর্ত্তকী এই ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

মল্লনাথের জাতি নির্ণয়

"ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা, অবিরল কুচযুগা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা, সকল তনু সুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥"

শাস্ত্রে পদ্মিনী-রমণীর এই সমস্ত লক্ষণ' বর্ণিত আছে। আমাদের প্রবাদের পদ্মিনী নৃত্য-গীতে কেমন অনুরক্তা ছিলেন, মল্লারপুরের বর্ত্তমান নাচ-গান তাহারই অনুকরণের অপভ্রংশ কিনা, প্রথম কোন্ জাতি হইতে—কতকাল পূর্ব্বে

(১) মনু ১০।২২

মল্লারপুরের ঝুমুর

কিরূপে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় জানিবার এখন আর কোনো উপায় নাই। সংগীত শাস্ত্রে একটি রাগের নাম আছে 'মল্লার'। শুনিয়াছি শিখগণের একটি সম্প্রদায়ের নাম আছে 'মল্লারী'। এসব বিষয়ের সঙ্গে বোধ হয় মল্লারপুরের কোনো সম্বন্ধ নাই।

মল্লারপুরের পূর্ব্বে শিবপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে। একস্থানে স্তূপীকৃত ভগ্ন-প্রস্তরখণ্ড দেখাইয়া লোকে বলে "এই স্থানেই তপস্যা করিয়া সিন্ধুপতি-জয়দ্রথ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্মরণার্থ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কালাপাহাড় তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি সেই শিবেরই ভগ্নাংশ"। মহাভারতে (২) দেখিতে পাই দ্রৌপদীহরণ করিতে গিয়া কাম্যক-কাননে ভীমের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে শিব-সাধনা করেন। গঙ্গাদ্বার—হরিদ্বারেরই নামান্তর। সুতরাং জয়দ্রথের শিবপাহাড়ীতে আসিয়া—শিবারাধনার প্রবাদ কিরূপে সৃষ্ট হইল, বুঝিতে পারিলাম না। জয়দ্রথ পূজিত সিদ্ধনাথই মল্লেশ্বর হইয়াছেন, এ প্রবাদ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তবে আবার সিন্ধুপতির তপস্যাক্ষেত্রকে চিহ্নিত করিবার জন্য শিবপাহাড়ীর—শিব, কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল? তাহারও তো কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

জয়দ্রথের সিদ্ধি স্থান

যেমন সিদ্ধনাথ শিব, তেমনি সিদ্ধেশ্বরী নামে এক দেবীও আছেন। অষ্ট-ভূজা মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি সিদ্ধেশ্বরী নামে পূজিতা হইতেছেন। এইরূপ মূর্ত্তি বীরভূমের বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সেগুলির প্রায় অধিকাংশই খণ্ডিত। আর এ মূর্ত্তিটীর কোনো অঙ্গহানী ঘটে নাই—এইমাত্র প্রভেদ। মূর্ত্তিটি প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির-বাহিরে ইতস্তত কয়েকটি বাসুদেব-মূর্ত্তি ও দুই-একটি ভগ্ন প্রস্তর-খণ্ড পড়িয়া আছে। মন্দির-দ্বারের দক্ষিণ-পার্শ্বে (বহির্দ্দেশে) একটি মূর্ত্তি রহিয়াছে,—পুরুষমূর্ত্তি। গঠন-পরিপাট্য প্রভৃতি প্রশংসার কিছু না থাকিলেও,—হয়তো ঐতিহাসিকের চক্ষে ইহার কোনোরূপ মূল্য নির্ণিত হইতে পারে। দুই-হস্ত উত্তানভাবে জানুদ্বয়ের উপর ন্যস্ত রাখিয়া, স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট, এই সৌম্য-শান্ত-আত্মসমাহিত মূর্ত্তিটি কোনো বৌদ্ধ অথবা জৈন তীর্থঙ্করের বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার পাদপীঠে দুই পার্শ্বে দুইটি কুকুর রহিয়াছে। কুকুর দুইটির মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রটিতে একটি লিপি ক্ষোদিত ছিল। মনে হয় কোনো অত্যাচারীর কবলে পড়িয়া লিপিটি বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা বহুদিনের পুরাতন মূর্ত্তি বলিয়াই হউক বা অপর

সিদ্ধেশ্বরীদেবী

(২) বনপর্ব্ব ২৭১ অধ্যায়।

৬৬ নং মল্লারপুরের ভৈরব-মূর্ত্তি।

৬৭ নং জিনদীঘি গ্রামের ভগ্নমূর্ত্তি ও আরবী লিপির ভগ্নাংশ।

কোনো কারণেই হউক, লিপি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাদপীঠে কুক্কুর দেখিয়া এবং আপদুদ্ধার স্তোত্রের "আত্মবর্ণ সমোপেতং সারমেয় সমন্বিতং" পাঠ স্মরণ করিয়া—মূর্ত্তিটি বটুকভৈরবের বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু আপদুদ্ধারে—বটুক দ্রংষ্ট্রাকরালবদন, নানাবিধ অলঙ্কার ও খট্টাঙ্গাদি অস্ত্রবিভূষিত ইত্যাদি ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আগমবাগীশ-সংগৃহীত তন্ত্রসারে বটুকের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার ধ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক-বটুক দ্বিবাহু; রাজসিক-বটুক চতুর্ব্বাহু ও তামসিক-বটুক অষ্টবাহু। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিটির দুই হস্ত দেখিয়া তাহাকে বটুকের সাত্ত্বিক-শ্রেণীভুক্ত করিবারও উপায় নাই। কারণ সাত্ত্বিক বটুক নব-মণিময় কিঙ্কিনী নূপুরাদিতে ভূষিত এবং শূল, দণ্ডধারি। আলোচ্য মূর্ত্তিটির সে সব কোনো বালাই নাই। এই জন্যই আমরা ইহাকে তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছি। কথিত আছে জৈনগণের অন্যতম তীর্থঙ্কর—মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামী যখন রাঢ়ে ধর্ম্মপ্রচার করেন, সেই সময় কুক্কুরের উপদ্রবে তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। রাঢ়ে তিনি দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং আধুনিক বর্দ্ধমান তাঁহারই নাম-স্মৃতি বহন করিতেছে। কুক্কুর সমন্বিত এই মূর্ত্তি রাঢ়ে মহাবীরের ধর্ম্মপ্রচারের পরিচয়-দ্যোতক কি না, ঐতিহাসিকগণ তাহার বিচার করিবেন। (৩)

(৩) আমাদের মনে হয়, অনুসন্ধান করিলে রাঢ়ে "জৈন-কীর্ত্তির" বহু ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হইতে পারে। একটি স্থানের সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ সন্দেহ হইয়াছে,—নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত করিতেছি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁতিবিরল নামে একখানি গ্রাম আছে। নলহাটী-আজিমগঞ্জ শাখা রেলপথ হইতে এই গ্রাম বেশী দূরে নহে। তাঁতিবিরলের অনতিপূর্ব্বস্থিত একখানি গ্রামের নাম "জিনদীঘি"। গ্রাম দুইটির মধ্যে একটি বিস্তৃত জলাশয় জিনদীঘি নামে খ্যাত। জিনদীঘি গ্রাম এই দীঘির নামেই পরিচিত। গ্রামের পশ্চিমে,—দীঘির পূর্ব্বে একটি অনতিবৃহৎ স্তূপে কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তাহারই মধ্য হইতে একটি মূর্ত্তির পাদপীঠ ও একটি আরবী-লিপির ভগ্নাংশ সংগৃহিত হইয়াছে। পাদপীঠে দুইখানি পদের গুল্ফ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অংশ মাত্র বিদ্যমান। পাদপীঠের নিম্নে একটি শৃগাল এবং তন্নিম্নে একটি লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে। লিপি হইতে মাত্র একটি নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় "শ্রীভেছন দেবী"। ইহা দেবতার নাম কি প্রতিষ্ঠাত্রীর নাম বুঝিবার উপায় নাই। তন্ত্রে শৃগাল-বাহনা শিবদূতি দেবীর ধ্যান বর্ণিত আছে। কিন্তু উপরিকথিত নাম হিন্দুসমাজের অপরিচিত বলিয়াই মনে হয়। জিনদীঘি গ্রামের অধিবাসিগণ এখন সকলেই মুসলমান। কিন্তু গ্রামের পাড়ার নাম, মাঠের নাম, পুষ্করিণীর নাম—সমস্তই হিন্দুপ্রভাবের পরিচয় দান করিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, গ্রামে এক সময় হিন্দুর বাস ছিল। তৎপূর্ব্বে এখানে জৈনগণ বাস করিতেন কি না কে বলিবে? জৈনগণের জিন হইতে কিম্বা মুসলমানের জীন হইতে,—জিনদীঘি নাম যে কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহার কারণানুসন্ধানের কোনো উপায় নাই। তবে দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছে জিনদীঘি বোধ হয় জৈনগণেরই কীর্ত্তি নিদর্শন।

নন্দীগ্রাম কাহিনী।

থানা মৌড়েশ্বরের প্রায় পাঁচমাইল উত্তরে নন্দীগ্রাম। গ্রামে কিছু-কম দেড়শত ঘর লোকের বাস, লোকসংখ্যা প্রায় তিনশত। জাতির-মধ্যে ব্রাহ্মণ, কলু, কুণাই, (মুচিজাতির শ্রেনীভেদ) মুচি ও হাড়ির নামকরিতে পারা যায়।

নন্দীগ্রাম, পার্শ্ববর্ত্তিস্থান, ও বিবিধ প্রবাদ

এই নন্দী-নামধেয় গ্রাম, তাহার অদূরবর্ত্তী-দক্ষিণে পাশা-পাশি-অবস্থিত-গ্রামের শিবগ্রাম ও শিবপুর নাম, নন্দীগ্রামে বিদ্বান—সাধন-ভজন-পরায়ণ ও ধনৈশ্বর্য্য-শালী সাধুগণের অবস্থিতি সম্বন্ধে প্রাচীন জনশ্রুতি, সুপ্রসিদ্ধ নাথগোস্বামীর কাহিনী, তারপর সাধুর-দীঘি বা সাধ্যার-দীঘি ও সাধুরহাট বা সাধ্যারহাট, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় এবং সন্ধিগড় বাজার, লছুতোড়, মাঝারি পাড়া (১ম) মাঝারি পাড়া (২য়) প্রভৃতি গ্রাম-সংস্থান পর্য্যবেক্ষণে, আমরা যে কয়েকটি আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এস্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নন্দীগ্রাম ও সন্ধিগড়

আমাদের অনুমান হয়—পূর্ব্বে নন্দীগ্রাম হইতে সন্ধিগড় বাজার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া একটি জনবহুল, ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধ নগর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং সেই নগরেরই নাম ছিল বোধহয় সন্ধিগড় বা সিন্ধুগড়। নন্দীগ্রাম হইতে সন্ধিগড় যাইবার পথে—প্রান্তরে এবং গ্রামে বড় বড় পুষ্করিণীর আধিক্য, উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী গ্রামের মাঝারি পাড়া নাম, ইত্যাদি বিষয় আমাদের এইরূপ অনুমানের কারণ। নলহাটী-কাহিনীতে সন্ধিগড়ের নলরাজ-সম্বন্ধীয় প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছি। মনে হয় নলহাটী ও নান্নুরের মধ্যবর্ত্তী এই সন্ধিগড়েই নলরাজাদের রাজধানী ছিল। হাতীশালা (মাঠ) ইত্যাদি যে সব নাম শুনিতে পাওয়া যায় সে সমস্ত বোধহয় নলরাজাদের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সাধ্যার হাটকে কেহ কেহ দেওয়ানগঞ্জ বলে, এ নাম আধুনিক। মুসলমান আগমনের পর কোনো কারণে সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। নলরাজগণের সময় নন্দীগ্রাম কি নামে অভিহিত হইত জানিতে পারা যায়না। নন্দীগ্রাম নাম—সন্ন্যাসীগণের প্রদত্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নন্দীগ্রামের সন্ন্যাসীগণ ধনেজনে বলীয়ান ছিলেন, তাঁহাদের রাজার মত বাড়ীছিল, হাতী-ঘোড়া ছিল, দেবসেবা ছিল, অতিথিশালা ছিল, এক কথায় রাজকীয় মর্য্যাদার উপযুক্ত বোধহয় সমস্তই ছিল।

নন্দীগ্রামে সন্ন্যাসী ও নাথ-সম্প্রদায়

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরভূমে 'নাথ' সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া
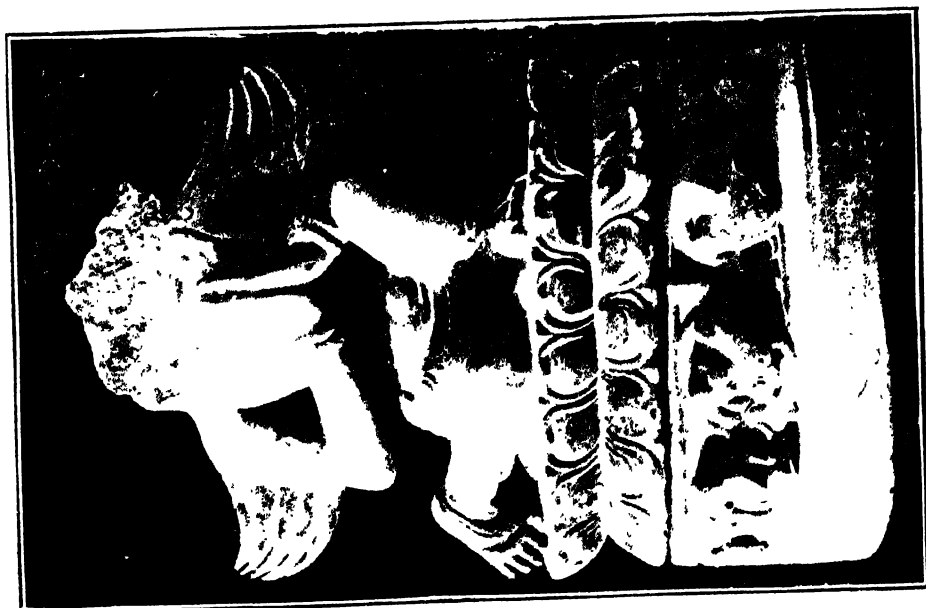
উঠেন। এই শিবগ্রাম, শিবপুর, নন্দীগ্রাম তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। এই নাথেরাই নন্দীগ্রামের সন্ন্যাসীরূপে প্রবাদের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। ইহাদের শেষাবস্থার—অবনতি-দশার একজন সন্ন্যাসী,—নাথ-গোস্বামীর অনেক কাহিনী এখনো লোকে মনে করিয়া রাখিয়াছে। শিবগ্রাম ও শিবপুরের মধ্যে শিবগ্রামের দীঘি নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। ইহার এক এক দিকের পরিমাণ প্রায় আধ্-মাইলের কম হইবে না। দীঘির দুইদিকে দুইটি বাঁধাঘাট ছিল, পূর্ব্বদিকে তাহার অস্তিত্ব এখনো বর্ত্তমান। ঘাটের পার্শ্বে একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, স্তূপের উপরে একটি সুন্দর মুখ—বোধহয় কোনো দেবতার হইবে, এখনো পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। এই শিবগ্রামের দীঘি, এবং সন্ধিগড়ের 'গ্রামসাধ্যা', সাধ্যার হাটের—'হাটসাধ্যা', ও নন্দীগ্রামের 'মাঠসাধ্যা' এই তিনটি সাধুর বা সাধ্যার দীঘি, উক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠিত। সন্ধিগড় হইতে শিবগ্রাম পর্য্যন্ত স্থানে এই সন্ন্যাসীগণের আশ্রম স্থাপিত ছিল। নন্দী-গ্রামে ইষ্টকময় বহু সমাধি বিদ্যমান আছে, তাহার সমস্তগুলিই সন্ন্যাসীর সমাধি নামে খ্যাত। নাথ-গোস্বামীর সমাধির আজিও পূজাহয়। নন্দীগ্রামের দুইটি পুষ্করিণীর নাম পণ্ডিতা ও রাজপণ্ডিতা। রাজপণ্ডিতা নাম শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, উহা রাজার সভা-পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন অনেক সন্ন্যাসীকেও লোকে পণ্ডিত বলিত, পণ্ডিত পুষ্করিণী হয়তো তাহাদেরই কাহারো ছিল। বীরভূমের পূর্ব্বভাগে—বোধহয় শেষ সীমায় (তারা-পুরের কিছুদূর পূর্ব্বে) নারায়ণপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামের পশ্চিমস্থিত প্রান্তরে কতকটা স্থান ব্যাপিয়া একটা উচ্চস্তূপ ও তন্মধ্যবর্ত্তী কয়েকটা পুষ্করিণী আদি দেখাইয়া স্থানটিকে লোকে সন্ন্যাসী-রাজার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই ধ্বংসস্তূপ হইতে একটি গরুড়-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। গরুড়—জোড়-হস্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কণ্ঠে, কটীতে, করে ও চরণযুগলে বিবিধ অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। তাঁহার কারুকার্য্য খচিত পাদ-পীঠে ক্ষোদিত রহিয়াছে, "পণ্ডিত আনন্দ (?) যশাঃ"। দুঃখের বিষয় এই পরম-সুন্দর মূর্ত্তিটি মস্তকহীন। এখন—আমরা যাহা বলিতেছিলাম,—এই পণ্ডিতের নাম দেখিয়া এবং সন্ন্যাসী ঘটিত প্রবাদ শুনিয়া আমদের অনুমান হইতেছে, যে পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসীগণ পণ্ডিত উপাধিতেও পরিচিত হইতেন। সুতরাং নন্দীগ্রামের পণ্ডিত পুষ্করিণী বা রাজ-পণ্ডিত পুষ্করিণী যে সন্ন্যাসীগণের প্রতিষ্ঠিত নহে, একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না।

শিবগ্রামের দীঘি

সাধ্যার দীঘি

নারায়ণপুরে সন্ন্যাসী-রাজা

পণ্ডিত আনন্দ যশার গরুড় মূর্ত্তি

উপরোক্ত প্রকারের গরুড়-মূর্ত্তি বাসুদেব-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠাপিত থাকিত। মৎস্য-পুরাণে বর্ণিত আছে—(১) বিষ্ণু-মূর্ত্তি—

মৎস্যপুরাণের বিষ্ণুমূর্ত্তি ও গরুড়

'ক্বচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজ মথাপরম।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা'॥

অষ্টভুজ বিষ্ণুর দক্ষিণদিকে খড়্গ, গদা, শর ও দিব্যপদ্ম, এবং বামদিকে ধনু, খেটক, শংখ ও চক্র থাকিবে। অধোদিকে পৃথিবীর বিন্যাস করিতে হইবে, তাঁহার দক্ষিণে প্রণত গরুড় ও বামে পদ্মহস্তা-লক্ষ্মী বিরাজিতা থাকিবেন। ঐশ্বর্য্য-কামীব্যক্তি গরুড়কে সম্মুখে স্থাপন করিয়া শ্রী ও পুষ্টিকে উভয় পার্শ্বে সংস্থাপন করিবেন। প্রবাদের মুখে 'পণ্ডিত' যখন 'সন্ন্যাসী রাজা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন, তখন তিনি যে ঐশ্বর্য্য-কামী ছিলেন, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। পাইকোড়ে একটি ভগ্ন বাসুদেব মূর্ত্তির পাদপীঠে 'পণ্ডিত বিশ্বরূপ' নামের লিপি দেখিয়াছি। নানা কারণে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে, যে নাথ-দের সম-সময়ে বীরভূমে আর একদল সন্ন্যাসীর অভ্যুদয় হয়, তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন। তারাপুর কাহিনীতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে তন্ত্রের বশিষ্ঠ, মীননাথের পূর্ব্বাচার্য্য ছিলেন, এবং তিনিই বীরভূমে তান্ত্রিক সাধনার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান। এই নাথ-পন্থীগণ কতকটা তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। দক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোল এবং চেদীরাজ কর্ণদেব প্রভৃতি বৈদেশিকগণের প্রভাবেই বীরভূমে বৈষ্ণব-ধর্ম্মালোচনার সূত্রপাত হয়, যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় এই আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন, পণ্ডিত আনন্দ যশাও পণ্ডিত বিশ্বরূপকে আমরা সেই দলভুক্ত বলিয়াই মনে করি। এই সমস্ত সন্ন্যাসীগণ যে নিতান্ত 'নিরামিশ' নিরীহ বা নির্জ্জীব ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের পূজিত দেবতার শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু, শর ও তরবারী দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। এ বৈষ্ণব মানে দুষ্টের দণ্ডবিধাতা ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা। সে এক দিন ছিল।

বীরভূমে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী

নন্দীগ্রামে নন্দীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমাদের অনুমান হয়, সাঁইথিয়ায় যে নন্দেশ্বরী উপপীঠ বা সিদ্ধপীঠ আছে, কোনো দেবীমূর্ত্তি না থাকিলেও যেখানে আজিও নন্দেশ্বরী দেবীর পূজা হয়, তাহার প্রকৃত নাম নন্দীশ্বরী পীঠ, তথায় নন্দীশ্বরী নামে কোনো শক্তি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, এবং তাহা নাথ-সম্প্রদায়েরই কীর্ত্তি। সাঁইথিয়ার প্রসঙ্গে বীরভূম-বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের অপরাপর তথ্য-সমূহ প্রকাশিত হইবে। শিবমন্দিরের দক্ষিণে
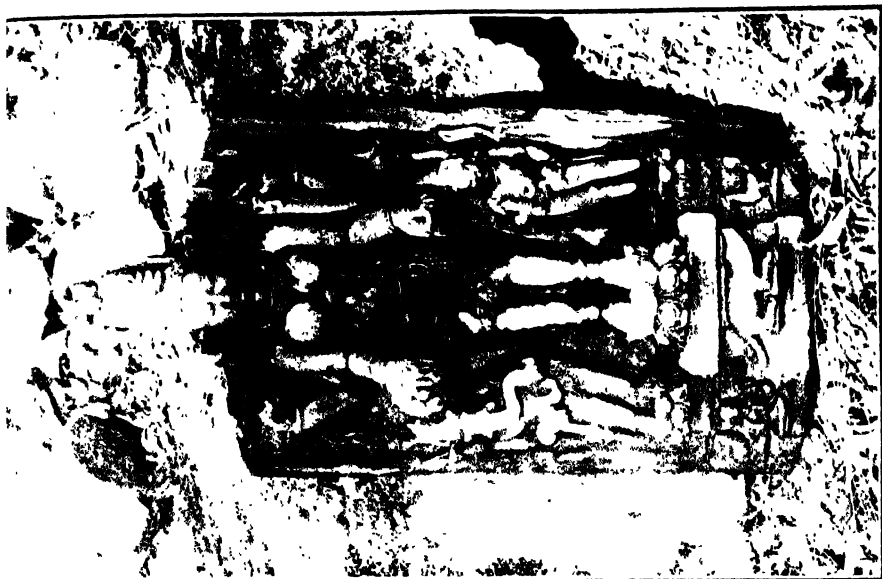
নাথ-গোস্বামীর সমাধি বিদ্যমান্ রহিয়াছে। সমাধি-মন্দিরের বারান্দায় তাঁহার অপর তিন-জন-শিষ্য সমাধিস্থ আছেন। নাথ-গোস্বামীর পর হইতে এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। গোস্বামীর তিনজন-শিষ্য নন্দীগ্রামেই দেহ রক্ষা করেন, অধস্তন চতুর্থ শিষ্য নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারেন না, সে আজ প্রায় তিন-চারি-শত বৎসরের কথা। নাথ-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত সাগর-পুষ্করিণী এখনো নন্দীগ্রামে বর্ত্তমান আছে। গঙ্গাসাগর-তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাই নাম দিয়াছিলেন সাগর। নন্দীগ্রামের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি, একটি গণেশজননী-মূর্ত্তি ও কয়েকটি বাসুদেব-মূর্ত্তি উল্লেখ-যোগ্য, মূর্ত্তিগুলি কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত। নারায়ণ-পুরের গরুড়-মূর্ত্তিটিও এই জাতীয়-পাথরে প্রস্তুত বলিয়াই মনে হয়। নারায়ণ পুরের নিকটবর্ত্তী নিস্‌পরুণ-গ্রামে একটি বেলে' পাথরের সূর্য্যমূর্ত্তি আছে, বীরভূমে এখনো প্রচুর পরিমাণে বেলে'-পাথর পাওয়া যায়। অরুণ-নামের সঙ্গে—নিস্‌পরুণ গ্রামের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা দুশ্চিন্তার বিষয় বটে! এই দুইটি সূর্য্যমূর্ত্তিই সৌসাদৃশ্যে প্রায় সাগর-দীঘি ও বারার মূর্ত্তির অনুরূপ। গণেশজননী-মূর্ত্তির দুইপার্শ্বস্থিত কার্ত্তিক ও গণেশের ময়ূর ও ইন্দুরকে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু নখর ও কেশর না থাকিলে মা'য়ের সিংহটিকে বৃদ্ধ-মূষিক-বড়-জোর বরাহ বলিয়া ভ্রম হইত। গঙ্গামূর্ত্তির সঙ্গে এই মূর্ত্তির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাঁর বাম-নিম্নহস্তে ঘণ্টা আছে। দা'ক্ষণ-ঊর্দ্ধহস্ত ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহাতে যে শিবলিঙ্গ ধৃত ছিল না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন গঙ্গামূর্ত্তির কার্ত্তিক ও গণেশের নীচে হরিণ ও বাঘ আছে, ময়ূর ও মূষিক নাই।

নাথ গোস্বামীর কথা।

কয়েকটি দেব মূর্ত্তি

নন্দীগ্রামের পূর্ব্বে-"কলিতারা" গ্রাম। দক্ষিণে-"দক্ষিণ-গ্রাম"। নন্দীগ্রামের দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় গ্রামের নাম "দক্ষিণ-গ্রাম" হইয়াছে। এই গ্রামের রায়-বংশ অতি প্রাচীন। ইহাঁরা ছান্দরের বংশধর, বাৎস্য-গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ছান্দড়ের-বংশধর যজ্ঞেশ্বর ঘোষালের জ্যেষ্ঠপুত্র গদের বংশে গোপালের জন্ম হয়। "গদের বংশধরগণ ডুমুরে ঘোষাল" নামে খ্যাত। গোপালই দক্ষিণ-গ্রামের রায়বংশের আদিপুরুষ। পাণ্ডিত্য ও সদাচার-খ্যাতির জন্য "গোপাল ঘোষাল"-"গোপাল আচার্য্য" নামে বিখ্যাত হন। দক্ষিণগ্রাম কলিতারা এবং ভাদীশ্বর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম তাঁহার জমিদারী ছিল। অধ্যাপনার জন্য তদানীন্তন কোনো ভূমি-পতির নিকট হইতে তিনি এই দানগ্রাপ্ত

দ'ক্ষণ গ্রামে ডুমু . ঘোষাল

গোপাল আচার্য্য

হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আচার্য্য মহাশয় নিজ নামানুসারে দক্ষিণ-গ্রামে তিনটি গোপাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনটি শালগ্রাম-শিলা ও অপর কতকগুলি দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের নিত্য-পূজা ও অন্ন-ব্যঞ্জনের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনিই দক্ষিণ-গ্রামে দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার রাশিনাম ছিল বংশীবদন। এই নামানুসারে তিনি একটি বাণলিঙ্গ-শিব স্থাপন করিয়াছিলেন। আচার্য্য-প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির আয়ে অদ্যাবধি এই সমস্ত দেব-সেবা যথারীতি নির্ব্বাহিত হইতেছে।

গোপাল আচার্য্যের পত্র আড়

এতদঞ্চলে "গোপাল আচার্য্যের পত্র-আড়" প্রবাদ বহুজন-প্রসিদ্ধ। শুনিতে পাওয়া যায় এক সময় নবাব সরকার হইতে কোনো পদাতিক, আচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্য রাজস্ব আদায়-জন্য দক্ষিণ-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। আচার্য্য তখন চতুষ্পাঠী গৃহে অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন। হাতে অর্থ নাই, এদিকে পদাতিক উপস্থিত, সংবাদ শুনিয়া তিনি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপার দেখিয়া প্রধান ছাত্র বলিল আপনি ''পত্র-আড়দেন", আমি বাহিরে গিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতেছি। ছাত্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিল একখানি পুস্তকে মুখ-ঢাকিয়া আচার্য্য মহাশয় বোধ হয় দুর্গানাম জপ করিতেছেন। ছাত্রটি পদাতিকের গ্রামত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার মুখ ঢাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "পত্র-আড়' দিতে বলিয়া গেলে, তাই বইয়ে'র পাতা আড়াল দিয়াছিলাম"। ছাত্রমহলে একটা হাসির রোল উঠিল। প্রধান ছাত্রটি বুঝাইয়া দিল "পত্র-আড়" দেওয়া মানে "সরিয়া-পড়া"। ব্যাখ্যা শুনিয়া আচার্য্য মহাশয় ছাত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। গোপাল আচার্য্যের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম গঙ্গারাম, ২য় মাধব, তৃতীয়ের নাম অজ্ঞাত। ইহাদের বহুবিস্তৃত বংশ এখন বাঙ্গালার নানাস্থানে বাস করিতেছেন।

জগদীশ ও তাঁহার পৌত্র

গঙ্গারামের দুইপুত্র-জগদীশচন্দ্র ও বিশ্বেশ্বর। জগদীশচন্দ্র সংসার-বিরক্ত সাধক ছিলেন। সমস্ত সম্পত্তি ও দেব-সেবাদি বিশ্বেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া দক্ষিণ-গ্রামের পাঁচপাই মাত্র অংশ স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখিয়া, তিনি গ্রামের দক্ষিণ-অংশে গিয়া বাস করেন। জগদীশচন্দ্রের পৌত্র কৃষ্ণজীবন। ইনি বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে উন্নতি লাভ করিয়া অনেকগুলি নূতন জমিদারী ক্রয় করেন। জলাশয়-খনন, শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও শ্যামরায়-বিগ্রহ-স্থাপন প্রভৃতি কীর্ত্তি-কলাপ তাঁহাকে দক্ষিণগ্রামে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

এই বংশে আশারাম রায়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। পিতার মৃত্যুর পর ইনি ভূমিষ্ঠ হন, এবং মাতা ও পিতামহীর যত্নে পালিত হইয়াছিলেন। গ্রাম্য-পাঠশালায় ইঁহার শিক্ষা শেষ হয়। ইনি প্রথমে কৃষ্ণজীবনের বংশধরগণের নিকটে সামান্য-বেতনে কার্য্য করিয়া পরে এড়োলের বাবুদের বাড়ীতে নায়েবী করেন। শেষে বীরভূমের সদর সিউড়িতে মোক্তারী করিয়া বিপুল অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। ইনি লক্ষ্মীজনার্দ্দন-শালগ্রাম-শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যহ-তাঁহার পায়সান্ন-ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই পূজা আজিও বর্ত্তমান আছে। কালেক্‌টরী অনাদায়ে বীরভূম-রাজনগর-রাজের জমিদারী যখন নীলাম হইয়া যায়, ইনি সে সময় কয়েকটি লাট খরিদ করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ আজিও সেই সমস্ত জমিদারী ভোগ করিতেছেন। আশারামের ২য় পুত্র জয়রাম আরবী ও পারসী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। (বীরভূম) মাড়গ্রামের কোনো মুসলমান-সম্মিলনীতে সমবেত মৌলভীগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন। মাড়গ্রামের সম্মিলন আহ্বানকারী জমিদারগণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে এক জোড়া বহুমূল্য শাল, একটি মূল্যবান্ অশ্ব এবং কতক নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি সসম্মানে সে সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইনিও সিউড়িতে মোক্তারী করিতেন। ইঁহারই প্রপৌত্র দক্ষিণ-গ্রামের গৌরব—বোধ হয় বীরভূমেরও স্পর্দ্ধার সামগ্রী ছিলেন—স্বর্গীয় যদুনাথ রায় এম, এ, বি, এল মহাশয়। অকালে এই রত্নটিকে হারাইয়া—আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ইনি দুইশত টাকা বেতনের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া সিউড়িতে ওকালতি করিতেছিলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,-এর সহযোগীতায় তিনি "বীরভূমবাণী" নামে একখানি সংবাদপত্র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণীর পরিচালনায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলাম। যদুনাথের মেধা, মনস্বিতা, বিদ্যাবত্তা, সাহিত্যানুরাগ, সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বর্ত্তমান-বর্ষের বিগত ২৪শে কার্ত্তিক রাত্রি প্রায় ১১টার সময়, মাত্র ৩২ বর্ষ বয়সে এই মহাপ্রাণ-যুবক আমাদিগকে কাঁদাইয়া অকালে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

আশারাম

জয়রাম

৺যদুনাথ রায় এম, এ, বি, এল

গঙ্গারামের ২য় পুত্র বিশ্বেশ্বর বৈষয়িক ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেন। শুনিয়াছি, তিনি নবাব-সরকার হইতে রায়-রাঁইয়া উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণ-গ্রামের ঘোষালগণ রায় উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

দক্ষিণগ্রামের ঘোষালগণের রায়-উপাধি

ইনি ঢেকার-রাজা রামজীবন রায়-চৌধুরী মহাশয়ের দেওয়ান ছিলেন। বিশ্বেশ্বরের পত্নীর নাম রত্নেশ্বরী। এই মহীয়সী-মহিলা যে মহামূল্য হৃদয়-রত্নের অধিকারিণী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার রত্নেশ্বরী নাম সার্থক হইয়াছিল। এই পুণ্যবতী নারীর দয়া, উদারতা, ত্যাগশীলতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণাবলী, চরিত্র-মাধুর্য্যে তাঁহাকে দেবীর-আসনে বসাইয়া প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে। দেশে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় রত্নেশ্বরীদেবীর যত্নে দক্ষিণগ্রামে পুষ্করিণী-খনন, রাস্তা-বাঁধানো প্রভৃতি জনহিত-কর কার্য্যে বহুলোকের অন্ন-সংস্থান হইয়াছিল। অন্নসত্র খুলিয়া, নিজে সেই সত্রে অন্নপাক,—এমনকি পরি-বেশন পর্য্যন্ত করিয়া ইনি মাতৃহৃদয়ের যে আলেখ্য দেখাইয়া গিয়াছেন—গ্রাম-বৃদ্ধগণের নয়নাশ্রু-স্নাত-তাহার-মূর্ত্ত-স্মৃতি আজিও উজ্জ্বল রহিয়াছে। যতদিন দক্ষিণ-গ্রাম থাকিবে, ততদিন সেই পুণ্য-স্মৃতির ভাস্বর-দ্যুতি মানব-মনকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিবে। রত্নেশ্বরী দেবীর একটি মাত্র কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি। বিশ্বেশ্বরের জ্যেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র এই বধূটীকে বড় স্নেহ করিতেন। আপনাদের কুললক্ষ্মী জ্ঞানে তাঁহারই খনিত "বিশ্বেশ্বর-রায়ের" দীঘিতে স্নান-তর্পণ করিয়া যেন কৃতার্থ হইতেন। একদিন জগদীশ স্নানার্থে যাইতেছেন—পথিপার্শ্বে বিশ্বেশ্বরের খামারে দেখিলেন স্তূপীকৃত ধান্যরাশি। অনতি পরেই সূর্য্যগ্রহণ হইবে। গ্রহণের সময় ধান্যস্তূপ উৎসর্গ—বাসনায় তিনি বিশ্বেশ্বরের বাড়ীতে সংবাদ দিয়া দীঘিকায় গমন করিলেন। বিশ্বেশ্বর তখন ঢেকায়, বধূ রত্নেশ্বরী তদ্দণ্ডেই পুরোহিত সহ গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ-গণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন, সভা সজ্জিত হইল। স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া জগদীশ দেখিলেন সমস্ত প্রস্তুত। ধান্যোৎসর্গ শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত বলিলেন গ্রহণে স্বর্ণদান করিতে হয়। জগদীশচন্দ্র ভ্রাতৃ-বধূর নিকট স্বর্ণ চাহিয়া পাঠাইলেন। দেবী রত্নেশ্বরী আপনার কর্ণকুণ্ডলদ্বয় উন্মোচন করিয়া তাহার একটি উৎসর্গ করিতে, অপরটি দক্ষিণা দিতে বলিয়া দিলেন। দানকার্য্য শেষ হইয়া গেল, কিন্তু কেহই বাড়ী ফিরিতে পারিলেন না। মুক্তি-স্নানের পর রত্নেশ্বরী সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীও আপামর-সাধারণকে বিবিধ ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিলেন। শুনিয়াছি, গৃহে ফিরিয়া সমস্ত শুনিয়া প্রণতা-পত্নীকে বুকে ধরিয়া, বিশ্বেশ্বর নাকি বলিয়াছিলেন-"রত্নেশ্বরী সত্য সত্যই তুমি মহারত্নের অধিশ্বরী, সত্যই তুমি আমার-কুললক্ষ্মী, গৃহের-দেবী"। এই দুর্দ্দিনে এ কাহিনী স্মরণ করিতেও আনন্দ হয়।

রত্নেশ্বরী দেবী

বিশ্বেশ্বরের চতুর্থ-পুত্রের নাম হর্য্যনারায়ণ রায়। কাণকাটা হর্য্যরায়ের নাম এঅঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে কোনো উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। হর্য্য একদিন প্রভাতে গঙ্গাতীরে পাদচারণা করিতে ছিলেন, এমন সময় দূরে কসাইগণকে দুইটী গবী—হত্যায় উদ্যত দেখিয়া তিনি তাহাতে বাধা দেন। কসাইগণ নবাবের আহার্য্য-সংগ্রহ করিতেছে বলায় তিনি বলেন যে অকারণ গোহত্যা ও শূকরহত্যা দুইই সমান। এই অপরাধে কাজির বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। নবাব আলীবর্দ্দি এই সংবাদ শ্রবণে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে হর্য্যর কর্ণচ্ছেদের আদেশ দিয়া কাজির মর্য্যাদা রক্ষা করেন। বলা-বাহুল্য নবাবের আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছিল, সেই হইতে হর্য্যর নাম হয় "কাণকাটা হর্য্যরায়"। বিস্তীর্ণ আকবর-শাহী পরগণার তিনি জমিদার ছিলেন, ইহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুরের অধীন বেলুড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

কাণ কাটাহর্য্য রায়

বিশ্বেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম সুন্দররাম। এই বংশে পণ্ডিত রামতারণ রায় বর্ত্তমান আছেন। পণ্ডিত রামতারণ দক্ষিণ-গ্রামেরঅলঙ্কার। সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-কথা বিবৃত হইল। রামতারণের পিতার নাম রামলাল রায়। বয়ঃপ্রাপ্ত-পুত্রগণ অকালে কালপ্রাপ্ত হইলে এবং সেই শোকে তাঁহার পত্নীদেবী লোকান্তরগমন করিলে, স্বজনগণের অনুরোধে প্রায় প্রৌঢ়-বয়সে রামলাল পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন। গ্রামস্থ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা মানদাসুন্দরীর সহ রামলালের বিবাহ হয়। মানদাসুন্দরীর গর্ভে রাম-লালের দুই পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামতারণ, কনিষ্ঠের নাম রামরতন, কন্যাটির নাম মন্নমোহিনী। সন ১২৬৮ সালের মাঘ মাসে পণ্ডিত রামতারণের জন্ম হয়। রামতারণের বয়স যখন ৭ বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে রামলাল তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বালকদ্বয় তাঁহার নিকটেই পাঠাভ্যাস করিত। পরে ১৮৭৩ খৃঃ অঃ দক্ষিণ-গ্রামে গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। রামতারণ তথায় দুইবৎসর শিক্ষালাভের পর, একটি পরীক্ষায় জেলার সর্ব্বপ্রথম-স্থান অধিকারপূর্ব্বক তিন টাকা বৃত্তি-প্রাপ্ত হইয়া, সিউড়ি-বঙ্গবিদ্যালয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়টি এখন 'সিউড়ি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। এই বিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইল। শেষ-পরীক্ষা দিয়া রামতারণ

পণ্ডিত রামতারণ রায়

শিক্ষা

জেলার তৃতীয়-স্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু বৃত্তি না পাওয়ায় অর্থাভাবে আর তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠিল না। এই সময় রামতারণের বয়স ১৬ বৎসর, তিনি গ্রামে ফিরিয়া দক্ষিণগ্রাম-স্থিত পাঠশালে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। এই "উচ্চ-প্রাথমিক" বিদ্যালয়টির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত সাহায্যও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যাহা-হউক রামতারণের যত্নে বিদ্যালয়টির সমধিক উন্নতি সাধিত হয়, এবং গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব-প্রদত্ত সাহায্য পুনঃ প্রদানে বাধ্য হন। এই বিদ্যালয় এখন মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। (১৮৯৭ খৃঃ এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়) পণ্ডিত রামতারণ আজিও এই স্কুলে হেড্-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। প্রায় ৪০ বৎসর কাল তিনি শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এ কার্য্যে কেহ কখনো তাঁহার যত্ন-শৈথিল্য লক্ষ্য করিতে পারে নাই। তাঁহারই যত্নে দক্ষিণ-গ্রামে একটি পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী এবং পণ্ডিত মহাশয়ের কয়েকজন ছাত্রও এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

শিক্ষকতা

বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যালোচনায় তাঁহার আন্তরিক-অনুরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে অনুরাগ এত বাড়িয়াছে, যে—সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠিলে এখনো তিনি আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া যান, বয়সের মর্য্যাদা ভুলিয়া একজন বালকের সঙ্গেও আনন্দের সহিত আলোচনায় যোগদান করেন। শুনিয়াছি কৈশোরে কবিতাই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। তাঁহার পঠদ্দশায়—নবীনের "পলাশীর-যুদ্ধ" এবং হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহার" প্রকাশিত হয়। পুস্তক দুইখানি যে তিনি কতবার পড়িয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। এই সময় হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থায়—লিখিত "নিশীথে সতীদাহ", "সহ্যাদ্রিশিরে শিবাজী" "বাণী-বিলাপ" প্রভৃতি কবিতা—তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'সাধারণীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এডুকেশন-গেজেটেও তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। সাধারণী ও এডুকেশনে তখন যে-সে কবিতা বাহির হইবার উপায় ছিল না। ইহা হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের কবি-প্রতিভা অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার পাঠানুরাগ অসাধারণ। ইংরাজি না জানিলেও ইংরাজীভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ তিনি বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা অনুবাদ করাইয়া পাঠ করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদিও তাঁহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মহাকবি

সাহিত্যানুরাগ

কবিতা-রচনা

কালিদাসের "মেঘদূত" আজিও তিনি আগাগোড়া আবৃত্তি করিতে পারেন। ইদানীং তিনি কোনো কোনো কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর হইতে "গৃহস্থ" মাসিকপত্রে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইতেছিল। বীরভূমের রামপুরহাট হইতে প্রকাশিত বীরভূমবাসী ও রাঢ়দীপিকা নামক সাপ্তাহিক-পত্রদ্বয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ-মুদ্রিত হইতে দেখিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোনো কোনো তথাকথিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখনীকেও স্পর্দ্ধা করিতে পারে। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক-প্রভাব ও অনুশীলনের-ক্ষেত্র পাইলে পণ্ডিত রামতারণের প্রতিভা বীরভূমের গৌরবের সামগ্রী হইত।

লেখক রামতারণ

নয় বৎসর বয়সে রামতারণের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তের বৎসর বয়সেই তিনি বিপত্নীক হন। ষোল বৎসর বয়সে তারাছি-গ্রামনিবাসী ৺গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ২য়া কন্যার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়-বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে এই বালিকাটিও পরলোক-গমন করিলে,—তৃতীয়-বারে তিনি উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। পণ্ডিত রামতারণের এখন পাঁচ কন্যা ও চার পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র অল্পদিন হইল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়—শ্রীশচন্দ্র কালে ভাল লেখক হইতে পারে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, পণ্ডিত রামতারণের পুত্রগণ পিতৃ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করুন।

সাংসারিক পরিচয়

দক্ষিণগ্রামের দক্ষিণে রাৎমা নামে গ্রাম। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে চৈতন্যচরণ মণ্ডল নামে কোনো স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সৎ-শূদ্রের বাস ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাসুদেবমূর্ত্তি গ্রামে এখনো বর্ত্তমান। এই মূর্ত্তিটি গ্রামের পশ্চিমস্থিত তাঁহারই খনিত (বর্ত্তমান নাম চৈতন্যমণ্ডলের দীঘি) দীঘি হইতে বাহির হইয়াছিল। কথিত আছে মাতৃশ্রাদ্ধে সর্ব্বস্বদান করিয়া তিনি কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পর উদরান্নের সংস্থান ও পোষ্যবর্গের প্রতিপালন জন্য তাঁহাকে স্বগ্রামবাসী রসিকদাস তন্তুবায়ের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। গ্রামে একবার প্রায় শতাধিক নাগা-সন্ন্যাসী আসেন। মণ্ডল তাঁহাদিগকে—তাহার আতিথ্য-গ্রহণে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা বলেন "আমরা এখন একাধিক্রমে চারিমাস কাল একস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করি। আমাদের চাতুর্ম্মাস্য শেষ হইলে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব। যিনি এই চারিমাস কাল আতিথেয়তা করিবেন, আমরা তাঁহারই আতিথ্য-গ্রহণের সংকল্প করিয়াছি।" মণ্ডল

রাৎমা গ্রামের চৈতন্য মণ্ডল

মহাশয় কোনো দ্বিধা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দান করেন, "আমি আপনাদের সংকল্পপূরণে প্রস্তুত আছি, আপনারা অদ্য হইতে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।" একালে এরূপ লোক প্রায় দুর্লভ। চৈতন্যমণ্ডলের সময় গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। তিনি আড়ান (বীরভূম) গ্রাম হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী কৃষ্ণকান্ত, গোপীনাথ, ও নবকান্ত এই তিন সহোদর ভ্রাতাকে রাৎমায় আনিয়া বাস করান। গোপীনাথের নামীয় একখানি সনন্দ হইতে বঙ্গাব্দ ১১৬৫ সালের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তৎপূর্ব্বেই তাঁহারা রাৎমায় আসিয়াছিলেন। নবকান্তের শিরোমণি উপাধি ছিল। চৈতন্য,—শিরোমণির নিকট দীক্ষা-গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার দ্বারা ৺রাধাবল্লভ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেবতার নিত্য পূজা ও ভোগাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাবশ্যক দেবোত্তর সম্পত্তি অর্পণ করেন। চৈতন্যের বংশধর বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। গোপীনাথের পুত্র গোলকনাথ চাউল ও লবণের ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ইহার অতিথিসংকারের খ্যাতি আজিও প্রবাদের মত শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র দয়ারাম। ইনিও পিতার ন্যায় গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারই এক ভাগিনেয় মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺কাশী-ধামে দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক মোক্ষদানন্দ নাম ধারণ করেন। বিগত ১৩০৯ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে ৺তারাপীঠে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। দয়ারাম জমি-দারী আদি খরিদ করিয়া সাংসারিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। রাৎমার মধ্যে দয়ারামের পৌত্রগণই এখন অবস্থাপন্ন ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। সজ্জন বলিয়া ইঁহাদের প্রসিদ্ধি আছে।

মণ্ডলের ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা

রাৎমার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

দক্ষিণ-গ্রামের পূর্ব্বে কিছু দূরে ঘোষ-গ্রাম। ঘোষগ্রামের লক্ষ্মীঠাকুরাণী প্রসিদ্ধ দেবতা। দেবীর দুই পার্শ্বে যে দুইটি মূর্ত্তি আছে, পাণ্ডাগণ বলেন তাহা ধন ও কুবেরের মূর্ত্তি। বামপার্শ্বে যিনি ধানের-শীর্ষের গোছা ধরিয়া আছেন—তিনিই কুবের। কতকাল-পূর্ব্বে—কেহ বলিতে পারে না—বর্ষার প্লাবনে ভাসিয়া—একখণ্ড নিম্বকাষ্ঠ ঘোষগ্রামের কোনো কুম্ভকারের শস্যক্ষেত্রে আটকাইয়া যায়। ধান কাটিয়া আনিয়া খামারে ঝাড়াইয়া কুম্ভকার যখন দেখিল—প্রায় দশ বৎসরের ফসল এক বৎসরে পাইয়াছে, তখন আর তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সুতরাং রজনীতে স্বপ্নাদেশ পাইবা মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া সে শস্যক্ষেত্রে গিয়া কাষ্ঠখণ্ডটি সংগ্রহ করিয়া আনিল। সেই কাষ্ঠ-খণ্ডেই এই লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি ঘোষগ্রামের

ঘোষগ্রামের কথা
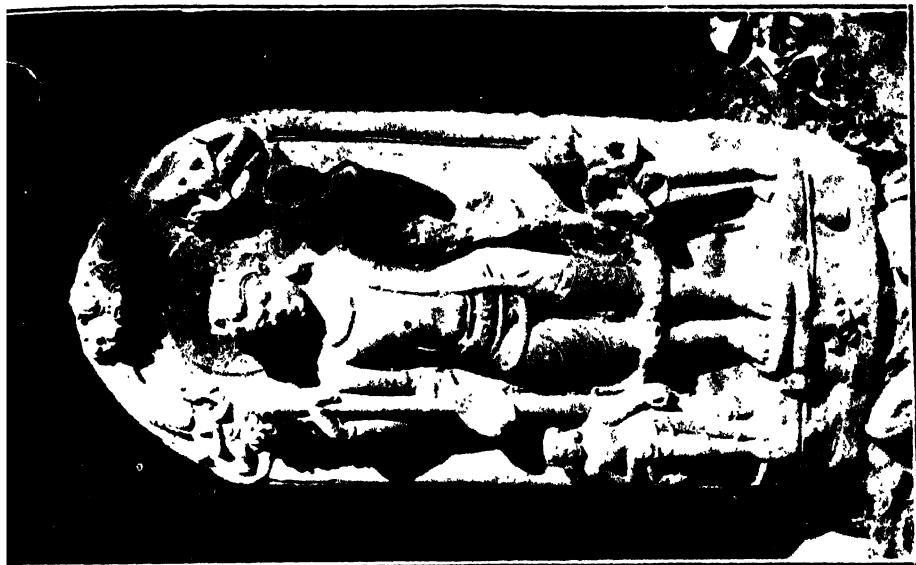
নিকটবর্ত্তী উপলয়-গ্রামে এখনো সময় সময় কোনো কোনো কৃষক আশার—অতীত ফসল প্রাপ্ত হয়। কৃষকগণ এই ঘটনাকে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর বর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই সম্বন্ধে একটি গাথা আছে—'ঘোষগ্রামে মা-লক্ষ্মী উপলয়ে বর'। ঘোষ-গ্রাম হইতে একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর মন্দির-সন্নিধানে কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দিরে আরো কতকগুলি দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। তন্মধ্যে একটি বাসুদেব ও একটি শিবানী-মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। শিবানী-মূর্ত্তিটি কামদেব নামক কোনো ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই মূর্ত্তি যে অন্য স্থান হইতে আনীত হইয়াছিল—সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এ মূর্ত্তি কোথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল জানিতে পারা যায় না। ঘোষ-গ্রামের নিকটে বিষিয়া-গ্রাম, তার পশ্চিমে রঙ্গতড়া গ্রামে একটি গড় আছে। পরিখা-প্রাকারের চিহ্নগুলি এখনো একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই গ্রামে দুই একটি বাসুদেব-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গতড়ার গড় কাহার প্রতিষ্ঠিত কেহ বলিতে পারে না। ইহার দক্ষিণে তুরী-গ্রাম। এই গ্রামে একটি সুন্দর বাসুদেব-মূর্ত্তি ও একটি হর-গৌরীর যুগল-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান্। গ্রামবাসী স্বর্গীয় রাজদুর্লভ ঘোষাল মহাশয় সমাজের কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন পিতার দুরবস্থা এবং পুত্রভারাক্রান্ত কষ্ট-শ্রোত্রিয়গণের দুর্দ্দশা দেখিয়া "জ্ঞানানন্দী-পালটী" নামে একটী নূতন মেল-বন্ধনের চেষ্টা করেন। কন্যাদায়ে কুলীন-পিতার সর্ব্বনাশ হয়, আবার পুত্রদায়ে শ্রোত্রিয়-পিতার ভিটামাটি উৎসন্ন যায়—শেষে বংশলোপ হয়, এই উভয়বিধ সমস্যার সমাধান জন্যই তিনি জ্ঞানানন্দী-থাকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুনি-তেছি ধীরে ধীরে সমাজ এই মেলবন্ধন গ্রহণ করিতেছে। ঘোষাল মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। পরোপকারী, ক্রিয়াবান্ ও সামাজিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি সাধ্যমত বাড়ী হইতে অতিথি বিমুখ হইতে দিতেন না। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত তারাদাস ঘোষাল প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছেন। তুরী-গ্রামে কতকগুলি রাজপুত-জাতির বাস আছে। পূর্ব্বে অনেক ছিল, বর্ত্তমান-সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন বলশালী, তেমনি যুদ্ধ-বিশারদ ছিলেন। তাঁহাদের অসিচর্ম্ম ব্যবহার—নিপুণতার কাহিনী এখনো শুনিতে পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়ার-তাড়নায়-কঙ্কালসার, বর্ত্তমান বংশধরগণ সে কাহিনী শুনিয়া এখন চমকিয়া উঠেন, দারিদ্র্যের আদেশে শালপ্রাংশু-কিণাঙ্কিত-ভুজ,—

লক্ষ্মীর বর

ঘোষগ্রামে দেবমূর্ত্তি

রঙ্গতড়ার গড়

তুরীগ্রামে মূর্ত্তি

রাজদুর্লভ ঘোষা-লের মেল-বন্ধন

তুরীগ্রামের রাজপুতজাতি

সেই বীরজাতির উত্তর-পুরুষ আজ হলকর্ষণ করিতেছে, আইনের ভয়ে—অসি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, এখন আছে শুধু চর্ম্ম! অস্থি-চর্ম্মসার জাতি আজ সেই জীর্ণ-ছিন্ন পুরাতন চর্ম্মও তুলিতে পারে কিনা সন্দেহ! তুরীগ্রামে বহু অনুসন্ধানে আমরা দুইটিমাত্র 'ঢাল' দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই জাতি কোন্ সময়ে কিরূপে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। আমাদের অনুমান হয় রাজা মানসিংহের সময় ইহারা এদেশে আসিয়াছিল। ঘোষ-গ্রামে ঘোষ-রাজার (নামমাত্র) প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কে বলিতে পারে, ইহা সেই মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের পূর্ব্ব-পুরুষগণের আবাসস্থান কি-না? ঘোষ-গ্রামের নিকটে গাঙ্গের-ডা নামে গ্রাম আছে। এই গাঙ্গের-ডা নাম কি গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্রের স্মৃতি বহন করিতেছে?

ঘোষগ্রামে ঘোষরাজা

গাঙ্গের ডা ও গঙ্গারাষ্ট্র

ঢেকা-কাহিনী

থানা মৌড়েশ্বরের অন্তর্গত ঢেকা-গ্রাম এবং তাহার অধীশ্বর রাজা রামজীবনের নাম বীরভূমে বিশেষ পরিচিত; এড়োল, নওয়াপাড়া, হেতে' প্রভৃতি গ্রামের রায়-চৌধুরীগণ রামজীবনের বংশধর বলিয়াই আজিও এ অঞ্চলে সম্মানিত। কথিত আছে, বীরভূমির-বরেণ্য-সন্তান মহারাজ নন্দকুমার ভদ্রপুরে যখন রাজোপাধিগ্রহণ করেন, তখন এই বংশেরই কোনো প্রাচীন-পুরুষ তাঁহার ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা রামজীবন একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তিনি অনেকটা স্বাধীন ভাবেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রামজীবনের সম-সময়ে বীরভূমে রাজনগরের অধীশ্বর ছিলেন—খাজা কামাল খাঁ। তাঁহার সহিত ইঁহার বিরোধের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

রাজা রামজীবন ও রায়চৌধুরী বংশ

পাটুলীর চাটুতী-নারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দিবাকর। দিবাকরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ঢেকায় আসিয়া বাস করেন, (১) সে আজ প্রায় সাড়ে-তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। সাতকড়ির বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা রামজীবন।

পরিচয়

নওয়াপাড়ার শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে 'কালদণ্ড' নামে একখানি তরবারি আছে। দৈর্ঘ্য প্রায় তিনহাত এবং প্রস্থ প্রায় দশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে,—ওজন অন্ততঃ দশ সেরের কম নহে। তরবারির উপরে ক্ষোদিত আছে—"১০৬৩।১২ জৈষ্ঠ তৈয়ারি উপেন্দ্রচন্দ্র খাঁ"। প্রবাদ আছে—"তরবারিখানি পাঁচবৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। সেনাপতি রামশরণ মল্ল এই তরবারি দ্বারা রাজার-পূজিত কালিকা-দেবীর সম্মুখে বলির পশু হনন করিতেন। একবৎসর রামশরণের হস্তেই বলিদানে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, পশু এক আঘাতে ছেদিত হয় নাই। সেই বৎসরই রামজীবনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। 'কালদণ্ড' রামজীবনেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল"। প্রবাদ-কাহিনীতে বিশ্বাস করিলে—স্বীকার করিতে হয়, প্রায় দুইশত ষাট' বৎসর পূর্ব্বে রামজীবন বর্ত্তমান ছিলেন। তখন বোধ হয় শাহ সুজা বাঙ্গালার সুবেদার, এবং রাজমহাল—

কালদণ্ড তরবারি

সময় নির্ণয়

(১) সন১২২৩ সালের ৮ই আশ্বিনের লিখিত একখানি কুল-পঞ্জিকা হইতে রামজীবনের বংশ-বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্জিকার লেখক শ্রীকেনারাম শর্ম্মা ঘটক, পাঠক শ্রীনীলকণ্ঠ রায় চৌধুরী। ঘটকের সাকিম ঢেকা-বাড়ী, পাঠকের সাকিম নওয়াপাড়া।

বাঙ্গালার রাজধানী। তৎপরে সায়েস্তা খাঁ আসিয়া রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। "একটাকায় আটমণ চাউলের" নবাব সায়েস্তা খাঁর পর আজিম-উশ্বান এবং তাহার পরে মুর্শিদকুলী খাঁ আসিয়া বাঙ্গালার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, মুর্শিদকুলী মুখশুসাবাদে (মুর্শিদাবাদে) আসিয়াছিলেন ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে। ইতিহাস-বিখ্যাত ঔরঙ্গজেব তখন দিল্লীর সম্রাট্। শুনিতে পাওয়া যায়—রাজস্ব অনাদায় জন্য মুর্শিদের আদেশে বন্দী হইয়া রামজীবন দিল্লীর-পথে মুঙ্গের-দুর্গে প্রেরিত হন। তথায় অবস্থিতিকালে তাঁহার পরাক্রান্ত সৈন্যগণ ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনে। কালদণ্ড-নির্ম্মাণের কাল ১৬৫৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৭০৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রায় সাতচল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং এই ঘটনা মুর্শিদের সময়ে হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সম-সাময়িক বাঙ্গালা ও রামজীবন

রামজীবন কিরূপে রাজা হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারী ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। তাঁহার সমসময়ে (বীরভূম) গয়তায় রামরায় চৌধুরী, এবং (মুর্শিদাবাদ) জেমো ও বাঘ-ডাঙ্গায় কণোজীয় ব্রাহ্মণ-জমিদারগণ বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। মুর্শিদকুলীর সময়ে রাজসাহীর জমিদার লালা উদয়নারায়ণ রায়ের অভ্যুদয় হয়; বীরভূমের অনেকাংশ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কনকপুর-কাহিনীতে ইহার কথা বলিয়াছি। প্রবাদ,—ঢেকা এবং বাঘডাঙ্গা আলীনকী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; ঢেকার-যুদ্ধে রামজীবনের পুত্র রামচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের হিসাব ধরিয়া বিচার করিলে এই কাহিনীতে বিশ্বাস হয় না। ১৭৬৪ খৃঃ অঃ আলিনকী খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। ১৬৫৭ খৃঃ হইতে এই শতাধিক বর্ষকাল, যে কেবল রামজীবনও তাঁহার পুত্র—মাত্র দুইটি পুরুষেই অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! আবার প্রবাদ আছে সেই রামশরণ, (যাহার হস্তে বলি-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া ছিল) এই যুদ্ধে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, একটা মানুষের এতদিন বাঁচিয়া থাকারই বা উপায় কি? তবে যদি ধরিয়া লওয়া যায়,—কালদণ্ডখানি রামজীবনের পিতার সময় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা হইলে রামজীবনকে আরো পিছাইয়া আনিয়া তাঁহার পুত্রকে আলিনকীর সময়ে উপস্থিত করা যাইতে পারে। ১২২৪ বঙ্গাব্দে যে কুলপঞ্জিকাখানি লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সাতকড়ি হইতে অধস্তন ১২।১৩ পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, প্রামাণিক বিবরণ যখন কিছুই নাই, তখন অগত্যা প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

রামজীবন ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জমিদারগণ

আলীনকী ও রামচন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রবাদ

রামজীবন এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের বহু সংকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সাতকড়ির পুত্র চিরঞ্জীবের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা, ঢেকার উত্তর—প্রান্তে মাঠের মধ্যে এখনো বর্ত্তমান আছে; দীঘিটি ভরাট হইয়াগিয়াছে, এখন ইহার নাম চেঁচুড়া-দীঘি। চিরঞ্জীবের পুত্র ভবানী, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, লোকে তাঁহাকে রায়-ভবানী বলিত। রায়-ভবানীর বিস্তৃত দীঘি এবং তৎ পুত্র মহেশদাসের প্রতিষ্ঠিত দীঘি, আজিও তাঁহাদের নাম বজায় রাখিয়াছে। মহেশ-দাসের পুত্র রাজা রামজীবন। রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত ঢেকার 'রামসাগর' সরোবর রামজীবনের এক অক্ষয়-কীর্ত্তি। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার সময়ে বঙ্গে একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, দুর্ভিক্ষের প্রভাব বীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি আপনার প্রজাবর্গের অন্নাভাব দূরীকরণের জন্য 'রামসাগর' প্রতিষ্ঠা করেন। এতবড় জলাশয় বীরভূমে অধিক আছে বলিয়া মনে হয় না। রামজীবনের অপর এক বিশাল কীর্ত্তি—'কলেশনাথের মন্দির'। কলেশ্বর ঢেকা হইতে এক ক্রোশ দূরে প্রায় উত্তরে। তথায় এক শিব আছেন, নাম কলেশ্বর। রামজীবন শিবের 'নবরত্ন-মন্দির' (নয়-চূড়া) নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর আজিও শিবের সেবকগণ ভোগ করিতেছেন।(২) ইঁহার তারাপুরের কীর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

রায়চৌধুরীগণের সৎ-কীর্ত্তি

প্রবাদ অনুসারে—রামজীবন—দক্ষিণগ্রামের গোপাল আচার্য্যের বংশীয়া কোনো রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জানিতে পারা যায় না। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়—তিনি অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। গল্প আছে—

(২) (ক) যিনি শিবের পূজা করেন, তাঁহার জমির পরিমাণ ৫০/০ বিঘা।

(খ) পরিচারক পাণ্ডাগণ (পৃথক্ হওয়ায় এখন তাঁহাদের সংখ্যা ৩২ ঘর) প্রায় দুইশত বিঘা দেবোত্তর ভোগ করিতেছেন।

(গ) ঢাকীর (দুইবেলা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঢাক বাজাইতে হয়) জমির পরিমাণ ১৫/ বিঘা।

(ঘ) গোয়ালা ২৫/বিঘা জমি ভোগকরে। পূর্ব্বে প্রত্যহ পাঁচসের করিয়া দুধ দিত, এখন পাঁচ পোয়া করিয়া দেয়।

(ঙ) পুরোহিত—চৈত্রমাসে হোম করাইয়া ও ইন্দ্রদ্বাদশীর দিনে পূজা করাইয়া চারিবিঘা জমি ভোগ করেন।

(চ) অতিথি-সেবার জন্য জমি ও পুষ্করিণীর একত্রে পরিমাণ ছিল ৫৮/ বিঘা। পূজকগণ এই জমি ভোগ করিতেন। এখন এই জমি কাহাদের দখলে আছে জানি না, তবে অতিথি সেবা নাই, ইহা দেখিয়া আসিয়াছি।

একবার দ্বি-প্রহর রাত্রে কতকগুলি সন্ন্যাসী রাজ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রহরীরা কিছুতেই দ্বার খুলিবে না,—সন্ন্যাসীরাও ছাড়িবে না; ক্রমে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। গোলমালে রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি সংবাদ লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীরা আসিয়া রাজার নিকট জানাইল, তাহারা আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহাদিগকে খাইতে দিতে হইবে,—তাহারা অন্নাহার করিবে। রাজা আসিয়া রাণীকে সংবাদ দিলেন। ভাণ্ডার ঘর বন্ধ,—ভাণ্ডারী বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, রাণী ভাবনায় পড়িলেন। সহসা মনে পড়িয়া গেল—তাঁহার মুষ্টির কলসিতে (৩) চাল', কলাই, লবণ সমস্তই আছে, তিনি সেই সমস্ত আনাইয়া নিজের হাতে রাঁধিয়া সন্ন্যাসীদিগকে ডাকিতে বলিলেন। সন্ন্যাসীর-দল আসিলে রাজাই তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া ছিলেন।

রামজীবন-পত্নীর দানশীলতা

কুলপঞ্জিকা হইতে রামজীবনের,—রাঘব, কালিদাস, রমানাথ ও রঘুপতি এই চারি ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়। ইহাদের বংশপরম্পরার কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। রামজীবনের চারিপুত্র,—ভগবতী, রামভদ্র, কেশব ও রামচন্দ্র। পিতার স্বর্গ-গমনের অব্যবহিত পরেই ভগবতীচরণ পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র জয়সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া রামচন্দ্র রাজা হন। রাম-ভদ্র,—কবি এবং সংসার নির্লিপ্ত ছিলেন, তিনি জমিদারীর ঝঞ্ঝাট অপেক্ষা কবিতাকেই অধিক ভালবাসিতেন। সেই জন্যই অগ্রজ—বর্ত্তমান থাকিতেও রামচন্দ্রকেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়। রামভদ্রের বিরচিত একখানি সত্যনারায়ণের পাচালী ভিন্ন আর কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নাই। রামভদ্রের সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা বীরভূমের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। পুস্তকশেষে কবি আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন,—

বংশ পরিচয়

কবি রামভদ্রের সত্যনারায়ণ

"রায় মহাশয়সুত রূপেগুণে অদ্ভূত
কশ্যপ-বংশেতে উপাদান।
যবনে দিলেক তাড়া সেই হইতে ভূমিছাড়া
নিবসতি ঢেকা মহাস্থান॥"

(৩) পূর্ব্বে এদেশে গৃহস্থবাড়ীতে প্রতিদিনকার আহার্য্য হইতে চাল' ডাল' লবণ প্রভৃতি এক এক মুঠি (সামান্য অংশ) কাটিয়া রাখা হইত। সারা বৎসরের সংগৃহিত সেই চাল' ডাল-গুলি বৎসরান্তে—হয় সমস্ত গ্রামবাসী একত্রে, নয় প্রত্যেক গৃহস্থ পৃথকভাবে, কোনো সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। ইহাকে এদেশে মুঠিকাটা বলে। যে পাত্রে এই মুঠি রক্ষিত হয় তাহার নাম মুঠির কলসি বা সিঁধির কলসি।

এই পাঁচালীখানির রচনা স্থানে স্থানে কবিত্বময়। শুনিতে পাওয়া যায় সত্যনারায়ণ-ব্রত করিয়া—এই রাজবংশ নষ্ট-সৌভাগ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই একস্থানে কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—"রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্যলভে', রামভদ্র এই-ভাবে, সত্যদেব-সংহিতা প্রকাশে"। রাজা, রাজ্য কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বীরভূমির-স্মৃতি-মন্দিরে রামভদ্রের নাম এখনো প্রতিধ্বনিত হই-তেছে। (৪) রামভদ্রের রচনার একাংশ উদ্ধৃত হইল ;—

রামভদ্রের রচনার নমুনা

"দ্বিজের ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
কমলা-সেবিত পদ দেখিবারে পায়॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজরূপ।
পরিধান পীতবাস হৃদয়ে কৌস্তভ॥
কিরীটী মুকুট-মাথে শিখিপুচ্ছ-চূড়ে।
মকরন্দ-আশে কত মধুকর উড়ে॥
অলকা-তিলকা ভালে শোভে শশিকলা।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
ইন্দিবর নিন্দিয়া নয়ন-ভুরু—ধনু।
কোটি চন্দ্রছটা কিবা নবঘন-তনু॥
কলধৌত মুক্তা-খচিত মরকতে।
অঙ্গের ভূষণ শোভা করে নানামতে॥
মঞ্জীর—রঞ্জিত-পদে কলরব করে।
নখর-নিকরে নিন্দা করে হিমকরে॥
বামভাগে কমলা, গরুড় আরোহণ।
সম্মুখে করয়ে স্তুতি সিদ্ধ-ঋষিগণ॥
দ্বিতীয় গোলকধাম হইল সেই স্থানে।
অচেতন হয়্যা দ্বিজ পড়িল চরণে॥

ঢেকার প্রবাদ

ঢেকা-অঞ্চলে প্রবাদ প্রচলিত আছে,—যে "বজরহাটের নেড়ে' আর চন্দ্র-হাটের বামুণ, ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই"। বজরহাট, চন্দ্রহাট—গ্রাম দুইখানি রাজা রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান-সৈন্য ও কর্ম্মচারীগণ যেখানে

(৪) ইনি অপুত্রক ছিলেন। রাজ্য নষ্ট হইবার কিছুদিন পরে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তদবধি ইঁহার আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

বাস করিয়াছিল, সেই স্থানের নাম হয় বজ্রহাট, আর ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারী ও কুলীনসন্তানগণ যেখানে বাস করেন, তাহার নাম হয় চন্দ্রহাট। রামজীবনের পরলোকগমনের পর রামচন্দ্রের সময়ে শত্রু-আক্রান্ত ঢেকা যখন বিপন্ন, তখন এই বজ্রহাট ও চন্দ্রহাট—বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অন্নদাতার নিমকের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল! উভয় স্থানের হিন্দু-মুসলমানে পরামর্শ করিয়া শত্রুকে রাজ্যের অন্ধি-সন্ধির সংবাদ দিয়াছিল, যুদ্ধকালে শত্রুসৈন্যে যোগদান করিয়াছিল। ঢেকার সর্ব্বনাশের মূল কারণ ঐ বজ্রহাট ও চন্দ্রহাট। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—ঢেকা আক্রমণ করিয়া,—প্রথমবারে—সেনাপতি রামশরণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 'আলীনকী' নগরে ফিরিতে বাধ্য হন। ২য় বারের যুদ্ধে মল্ল-রামশরণ ও রাজা রামচন্দ্র উভয়েই নিহত হইয়াছিলেন, ঢেকা, কলেশ্বর, তারা-পুর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল; আলীনকীর আদেশে দেবমন্দির-গুলি লুণ্ঠিত হইলেও ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ঢেকায় রামজীবনই প্রথম রাজা। তিনিই মনোহরপুর নাম দিয়া ঢেকার একাংশকে বহু প্রাসাদে ও মন্দিরে ভূষিত করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ সে সমস্তই ধ্বংস করিয়াছিল। কলেশ্বর মন্দিরের বহিঃ প্রাচীর তাহাদের হস্তেই বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রাজা রামজীবনের রাজধানী মনোহরপুর এখন একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ মাত্র। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সপ্ততল-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন 'সাততলাও' নামে পরিচিত। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে—নাম 'সাততলার পুকুর'।

বিশ্বাসঘাতক হিন্দু-মুসলমান

যুদ্ধে আলীনকীর বিজয় লাভ এবং রাজ্যলুণ্ঠন

রামজীবনের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ

যুদ্ধের পর ভগবতীচরণের বংশধরগণ পলায়ন করিয়া—কান্দির নিকট একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে, এবং রামচন্দ্রের বংশধরগণ ঢেকার নিকবর্ত্তী বহরা নামক স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া, কিছুদিন পরে—এড়োল ও নওয়াপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। নবাব আলীবর্দ্দির কৃপায় তাঁহারা খড়-গ্রাম, কীর্ত্তিহাট ও কাঠগড়া এই তিনটি লাটের জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হন। এই জমিদারী ভগবতী ও রামচন্দ্রের বংশ-ধরগণের মধ্যে বিভাগ হওয়ায় এড়োলনিবাসীগণ খড়গ্রাম ও কীর্ত্তিহাট এবং নওয়াপাড়ার রায়চৌধুরীরা—কাঠগড়ার স্বত্ব লাভ করেন। রামচন্দ্রের বংশধর-গণ লক্ষ্মী-নারায়ণ শালগ্রাম-শিলার বিনিময়ে খড়গ্রামলাটের স্বত্ব এড়োলকে দান করিয়াছিলেন। দেবতার জন্য সম্পত্তি পরিত্যাগ, একালে—শুনিবার মত কথা বটে! এ-হেন সাত্ত্বিকতার উদাহরণ অধুনা দুর্লভ। রামজীবনের বংশীয়,—নওয়াপাড়ার শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী, এড়োলের ৺শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী বি, এল, হেতের' ৺পণ্ডিত অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রামজীবনের বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সম্পত্তি-বিভাগ ও দেবতার জন্য সম্পত্তি ত্যাগ

৭৩ নং কালেশ্বর-শিবের মন্দির।

৪ নং কালেশ্বরের বাসুদেব-মূর্ত্তি।
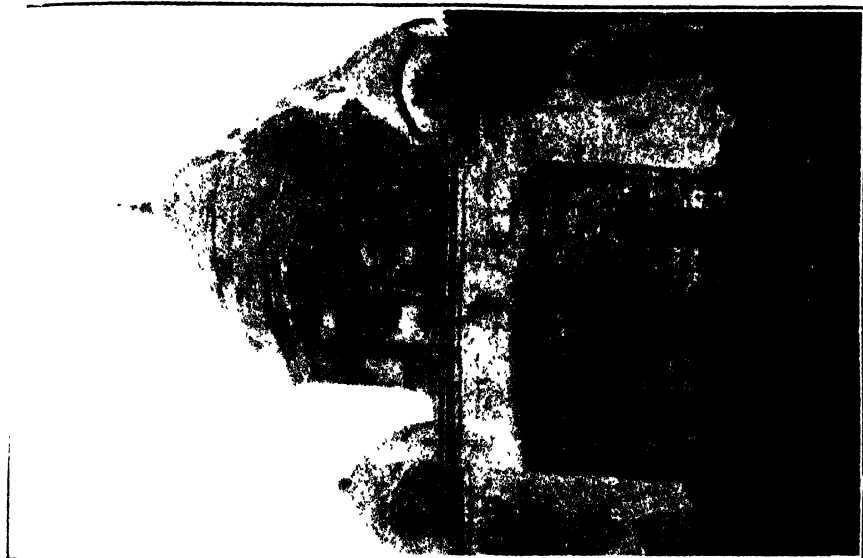
৺পণ্ডিত মহাশয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল হেতমপুর-রাজ-সংসারে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি প্রথমে হেতমপুর উচ্চইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, পরে রাজকলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

কলেশ্বরের সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে,—"কলেশ্বরের পূর্ব্ব-নাম ছিল পার্ব্বতীপুর। এই স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, এবং এখানে কলাসুর নামে এক অসুর বাস করিত। কলেশ্বরের অদূরবর্ত্তী বিল্বগ্রাম বা বেলগাঁয়ে বিল্বাসুর নামে এক অসুর ছিল। কলাসুর ছিল পার্ব্বতীর ভক্ত এবং বিল্বাসুর ছিল শিবের ভক্ত। কলাসুরের এক কন্যাছিল, তাহার নাম কলাবতী। কলাবতী একদিন বিল্বাসুরকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলে, পরে গৌরী-আরাধনা করিয়া তাহাকে স্বামী-লাভের বর-প্রাপ্ত হয়। বিল্বাসুরও কলাবতীকে দেখিয়া মুগ্ধহয় এবং শিবারাধনায় দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া—কলাবতীকে হরণ করে। কলাসুর এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বেলগ্রাম লুণ্ঠন করায়, উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বহুবর্ষ ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিতে থাকে, সুতরাং অবশেষে হরগৌরী আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহাদের চেষ্টায় অসুর দুইজনের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে,—উভয়ে পরামর্শ করিয়া বরগ্রহণ করে, যে হরপার্ব্বতীকে—যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তবর্ত্তী কোনো-এক-স্থানে চিরকালের জন্য অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। কলাবতীর নামে শিবের নাম হইবে কলেশ্বর, আর অসুর দুইজনের এই যুদ্ধের স্মৃতি এদেশে চিরস্থায়ী থাকিবে, সেই হইতে এখানে কলেশ্বর শিব-বর্ত্তমান আছেন"। শিব-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে পার্ব্বতী-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় তথায় স্বর্ণ-নির্ম্মিতা পার্ব্বতী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। প্রাকৃতিক-বিপ্লবে মন্দির ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায়, পার্ব্বতীর হৈমমূর্ত্তি তাহার মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মন্দির-স্তূপের উপর এখন এক প্রকাণ্ড বটতরু অধিকার বিস্তার করিয়াছে। তরুবরকে দেখিয়া বয়স্ক বলিয়াই অনুমান হয়। অসুর-যুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে কলেশ্বর ও বেলগ্রামের লোকেরা প্রতি আষাঢ়-মাসের অম্বুবাচীর দিনে একটি যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিত। ইহাই এতদঞ্চলে 'বেলগ্রামের লড়াই' নামে বিখ্যাত। এই লড়াইয়ে পূর্ব্বকালে বহুলোক হতাহত হইত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই লড়াই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন-গণের মুখে শুনিয়াছি লড়াইয়ের সময় তাহাদের 'মরি কি বাঁচি' জ্ঞান থাকিত না। অনেক প্রাচীনের অঙ্গেই লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। খুন-জখম হওয়ার জন্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট এই লড়াই বন্ধ

কলেশ্বর ও বিল্ব গ্রামে কলাসুর ও বিল্বাসুর

বেলগ্রামের লড়াই

করিয়া দিয়াছেন। বীরভূমের বহুস্থানেই আষাঢ়-মাসের প্রথম দিনে, কিম্বা অম্বুবাচীর দিনে, অথবা আষাঢ়-সংক্রান্তিতে এই লড়াইয়ের মত একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। তাহাতে মারা-মারির বিশেষ সংশ্রব ছিল না, কাদা-মাখিয়া-পরস্পরকে কাদা-মাখাইয়া—মাতামাতি,—সে উৎসবের প্রধান-অঙ্গ ছিল। এই উৎসবে—প্রধানতঃ দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ই যোগদান করিত। প্রথম হল-প্রবাহের দিনে সেকালের পল্লীর আমোদ-উৎসব একটা দেখিবার বস্তু ছিল। কৃষি-সম্বন্ধীয় নানারূপ ছড়া ও পাঁচালী গান করিতে করিতে কৃষকগণ লাঙ্গল-গরু লইয়া মাঠে আসিত। ক্ষেত্র-স্বামী আসিয়া, সোণা-রূপার জলদিয়া লাঙ্গল ধুইয়া তাহাতে সিন্দুর লেপিয়া দিতেন। কৃষকগণ জমিতে লাঙ্গল বহিত, আর তিনি (অনুকল্পে-প্রতিনিধি) সেই লাঙ্গলের রেখা ধরিয়া ক্ষেতের মধ্যে গড়া-গড়ি দিয়া, পরে বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য আনিয়া কৃষাণকে মাঠে বসিয়া উদর পূরিয়া আহার করাইতেন। আহারান্তে মাঠের যত কৃষাণ মিলিয়া,—পরস্পরের গায়ে কাদা-মাটি নিক্ষেপ করিয়া আমোদে মত্ত হইত। বহুদিন হইল, এই সমস্ত আমোদ-অনুষ্ঠান দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখন দেশে নিত্য অনাবৃষ্টি, নিত্য মহামারী লাগিয়াই আছে। দারিদ্র্যের দারুণ-পীড়নে দেশের মাটি কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। নীরস প্রাণে আমোদের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাই একে একে সুখের আলো—উৎসবের দেউটীও নিভিয়া আসিতেছে।

বীরভূমে আষাঢ়ে মাতন

কলেশ্বরের মন্দির-সন্নিধানে কয়েকখানি চিত্রময় প্রাচীন ইষ্টক, একটি (ছোট) হরগৌরীর যুগল-মূর্ত্তি, ও কয়েকটি বাসুদেব-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি প্রায় সাড়ে-তিনহাত উচ্চ। এত বড় বাসুদেব-মূর্ত্তি বীরভূমে আর কোথাও নাই। এই সমস্ত মূর্ত্তি রামজীবনের পূর্ব্ব হইতেই এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনুমান হয় মৌড়েশ্বরের রাজা বা কোনো সম্ভ্রান্ত নাগরিক এই সমস্ত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঢেকায় কয়েকটি বাসুদেব মূর্ত্তি ও একটি সূর্য্য-মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলিও রামজীবনের পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ শুনিয়া মনেহয়, ঢেকায় বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সম্ভ্রান্ত লোকের বাস ছিল। পাটুলীর নারায়ণ চাটুতী হয়তো কোনো ধনি-কন্যাকে বিবাহ করিয়াই ঢেকায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই মূর্ত্তি গুলি তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠীত বলিয়া অনুমিত হয়। বীরভূমে পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীতে সূর্য্যের পূজা হইত। যাঁহারা সূর্য্যের মূর্ত্তি-পূজায় অপারগ হইতেন, তাঁহারা প্রায় সূর্য্যমুখী (সূর্য্যকান্ত) শিলার পূজা করিতেন। বহু

কলেশ্বর ও ঢেকায় দেবমূর্ত্তি

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আজিও ইহার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। ঢেকার নিকটেই লোকপাড়া নামে গ্রাম। রামজীবনের-দৌহিত্র বংশীয়, লোকপাড়ার শ্রীমোহিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভদ্রপুরে বাস করিতেছেন। ইনি "একশো হাসির কথা" ও 'হাতদেখা' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। হাসির কথা—ব্যঙ্গ কবিতা, হাতদেখা আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাড়ীচক্রের অনুবাদ। মোহিনী মোহনের কবিতা লিখিবার হাত আছে।

কবিতা লেখক মোহিনীমোহন

লাভপুর-কাহিনী

বীরভূম-জেলায় লাভপুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। চতুষ্পাঠী, উচ্চইংরাজী-বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, দাতব্য-চিকিৎসালয়, পুলিস-থানা, সবরেজেষ্ট্রী-অফিস্, ডাকঘর, রেলওয়ে-ষ্টেশন (১) প্রভৃতি আধুনিক-সভ্যতার অনেক নিদর্শন, গ্রামটিকে—কালোপযোগী শ্রী সম্পদে মণ্ডিত করিয়াছে। গ্রামে অনেক-গুলি সম্ভ্রান্ত-ভদ্রলোকের বাস। হিন্দু ও মুসলমান উভয়-জাতির লোক-সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হইবে। শুনিতে পাই—"প্রাচীনকালে এই স্থান 'সহর—সামলাবাদ' নামে;—অট্টহাস, ফুলিয়ানগর, সম্রাজপুর, কর্ম্মাবাজ, শ্রীবাকুল, ডিহিবাকুলও গণেশ পুর—এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। সামলাবাদের যাঁহারা অধীশ্বর ছিলেন,—তাঁহাদের শেষ-বংশধরের নাম রাজা—দিনমণি সিংহ বাহাদুর। তাঁহার রাজ্যে এক ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে তাঁহার অপার—পারদর্শিতা ছিল। রাজা বাহাদুর একদিন রাণীর নিকট ব্রাহ্মণের প্রশংসা করায়,—রাণী কোনো সংকল্প-সংসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে আনাইয়া একটি যজ্ঞ করান্। তিন দিনের পর পূর্ণাহুতি দিবার সময়,—যজ্ঞাগারের সম্মুখস্থিত নারিকেল-বৃক্ষটি ভূপতিত হইলে—অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল,—যে রাণীর সংকল্প-অনুসারেই এইরূপ ঘটিয়াছে। তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম এই প্রকারে পণ্ড হইতে দেখিয়া,—ক্রোধে জ্ঞানশূন্য—ব্রাহ্মণ অভিশাপ প্রদান করেন 'এই স্ত্রৈন-রাজা রাজ্যসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে'। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই—রাজা ও রাজ্য সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অট্টহাসের-নাম এখন 'ফুল্লরামহাপীঠ' ফুলিয়ানগর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্রাজপুর সম্প্রতি সাঁওতাল-পল্লী,—(ডাঙ্গায় একটা ডাক-বাঙ্গলা আছে,) কর্ম্মাবাজ—পতিতডাঙ্গা, শ্রীবাকুল—শ্রীবাঁধ, এবং ডিহি-বাকুল ও গণেশপুর এখন বাকুল নামে পরিচিত। রাজা ও রাজ্য যাওয়ার পর সমস্ত স্থান বনে-জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল"।

বর্ত্তমান লাভপুর

হিন্দুর প্রবাদ

স্থানীয় মুসলমানগণ বলেন—"তুরুস্কের জনুনুরী-বংশীয় এক পাতশাহ-পুত্র গৃহ-বিবাদে দেশ-ত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি

(১) আহম্মদপুর (আমোদপুর) কাটোয়া রেলপথে লাভপুরে একটি ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। লুপলাইনের আমোদপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্ব্বে লাভপুর।

মহম্মদ-বিন্-তোগলকের সৈন্যদলে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া, পরে কোনো কারণে বাঙ্গালায় আসিয়া—লাভপুরে বাস করেন, ইঁহার নাম ছিল 'ওসমান'। উত্তর-কালে—তাঁহার বংশধর—মহম্মদ-ফাজেল, কর্‌রাণী-বংশে বিবাহ করিয়া—সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গড়ের শেষ-চিহ্ন লাভপুরে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে"। এই দুইটি প্রবাদই বিশেষ শক্ত-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুগণের প্রবাদের রাজা—ছিলেন—মৈথিলী ব্রাহ্মণ, বাকুলগ্রামে তাঁহার স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণ এখনো স-শরীরে বিদ্যমান,—ইঁহারা রাজার পুরোহিত ছিলেন, ইঁহারাই ফুল্লরা-দেবীর পূজা করিতেন। এখনো ইঁহাদের খ্যাতি রাজ-পুরোহিত,—এখনো ইঁহারাই ফুল্লরার পূজা করেন এবং ভোগ পাক করেন। এদিকে মুসলমানগণের গড়টিও পরিখা-প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ সহ,—তাঁহাদের কথিত প্রবাদের সমর্থন-জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। অতএব ইহা একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন—এ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে অনুমানের আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অনুমানের একটি সুবিধা,—ইহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক হয় না। সুতরাং আমরা এই নিরাপদ-পন্থাই অবলম্বন করিতেছি।

মুসলমানের প্রবাদ

প্রবাদ-সমস্যা

মহম্মদ-বিন্-তোগলকের রাজ্যকাল-হিজরী ৭২৫—৭৫২, অর্থাৎ খৃঃ অঃ ১৩২৪ হইতে খৃঃ অঃ ১৩৫১ পর্য্যন্ত। যদি ধরিয়া লওয়া যায়—ওসমান তাঁহার সৈন্যদলে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়—যে তিনি ও ঐ সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন, এবং খৃষ্টীয়১৩২৪-৫১ অব্দের মধ্যে কোনো সময়ে বাঙ্গালায়—তথা লাভপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তীর্থ-ভ্রমণ অথবা বঙ্গের শ্যাম-শোভা-সন্দর্শন-জন্য—যে সুদূর দিল্লী হইতে লাভপুর পর্য্যন্ত দীর্ঘপথ পর্য্যটনে ব্রতী হইয়াছিলেন,—ইহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তাঁহার সময়ে—তাঁহার স্বজাতীয় ও সহকর্ম্মীগণ অপর পাঁচজনে যাহা করিয়াছেন,—তিনিও তাহাই করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয়—চতুর্দ্দশ-শতাব্দীতে পশ্চিম হইতে,—রাজভৃত্য, সৈনিক ও ফকির—বহু মুসলমান বাঙ্গালায় আগমন করেন। প্রবাদ এবং ইতিহাসে ইঁহাদের অনেকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর গৌড়েশ্বর—আলী-মবারক ও হাজি-ইলিয়াসের (সমসুদ্দীন-ইলিয়াস শাহ) কথা রামপুরহাট-কাহিনীতে আলোচনা করিয়াছি; মহম্মদ-বিন্-তোগলকের সময় মাড়গ্রামে জাফর খাঁ গাজি আগমন করিয়াছিলেন,—তাঁহার কথাও বলিয়াছি। ইঁহার আগমনের কিছুদিন পরে বারাগ্রামে—লোহাজঙ্ঘ সাহেবের

অনুমানে সামঞ্জস্য

উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। উপরোক্ত আলীমবারক ও সুবর্ণগ্রামের অধিপতি ফকরউদ্দীন, দীর্ঘকালব্যাপি-বিবাদে লিপ্ত হওয়ায় বঙ্গে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান হয়,—জাফর খাঁ গাজির মত ওসমান সাহেবও ঐ সময়—একই উদ্দেশ্যে বীরভূমে আগমন করিয়াছিলেন। গাজি সাহেব মাড়গ্রামে গিয়া যাহা করেন,—ইনিও সামলাবাদে আসিয়া প্রায় সেইরূপ কার্য্যেই মনোযোগী হইয়াছিলেন, অর্থাৎ রাজা দিনমণি সিংহ বাহাদুরকে ব্রহ্মশাপের ফল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। লাভপুরের পশ্চিমপ্রান্তে এখন যে পুষ্করিণীর নাম গোবিন্দ-সায়র—তাহার পূর্ব্বনাম ছিল 'লড়াইয়ে' বা 'লড়িয়ে' পুকুর। সংস্কার কালে এই পুষ্করিণীর মধ্য হইতে একটি বাসুদেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শাস্ত্রানুযায়ী তাহার প্রতিষ্ঠা বিধানপূর্ব্বক যথারীতি নিত্য-পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। লড়াইয়ের সংস্কার করিয়া তিনিই নামকরণ করেন গোবিন্দ-সায়র। পূর্ব্ব-নাম শুনিয়া মনে হয় এই পুষ্করিণী ওসমান ও রাজার যুদ্ধের (লড়াইয়ের) স্মৃতি বহন করিতেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ১৩৪১ খৃঃ অঃ মহম্মদ বিন্ তোগলক—সুবর্ণগ্রামের বিদ্রোহী সুলতান ফকরউদ্দীনের শাসন জন্য একবার বাঙ্গালায় আগমন করেন। অসম্ভব নহে যে, ওসমান সাহেব সেই সময়েই সহর সামলাবাদে সফর করিয়াছিলেন। অবশ্য এমনও হইতে পারে, যে দিনমণির রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে, ইনি সেই বেওয়ারিস্-ধ্বংসস্তূপ অধিকার করেন। কিন্তু অনেকের মুখে যুদ্ধের প্রবাদই শুনিয়াছি। ওসমানের বংশধর—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট নিষ্কর-ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের বর্ত্তমান পুরুষেরা এখনো তাহার কিছু কিছু অংশ ভোগ করিতেছেন।

হিন্দু-মুসলমানে লড়াইয়ের স্মৃতি

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইয়ুজ কর্ত্তৃক লখণোর অধিকৃত হয়। তখন বীরভূমের অধীশ্বর ছিলেন—রাজা বীরসিংহ। জাতিতে তিনি ক্ষত্রিয়। অতঃপর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালার রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ-পূর্ব্বক—আর একজন হিন্দু লখণোর দখল করেন, তাঁহার উপাধি ছিল বীররাজা; প্রবাদ—বলে—জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বীরভূমের—পূর্ব্বাঞ্চল—বারা, মাড়গ্রাম, সামলাবাদ প্রভৃতি যখন মুসলমান আক্রমণে বিপর্য্যস্ত—সেই সময় পশ্চিমাঞ্চলের আরণ্য-ভূমে যে বীর উপাধিধারী এক হিন্দু-রাজা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। বারান্তরে সে-বিষয়ের আলোচনা করিব। লখণোরে ব্রাহ্মণ-ভূস্বামী দেখিয়া সন্দেহ হয়,—

সম সাময়িক বীরভূম

হয়-তো সামলাবাদ ধ্বংসের পর দিনমণি সিংহের কোনো বংশধর পশ্চিমাঞ্চলের সুরক্ষিত-দুর্গ লখণোবে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই মৈথিলী রাজা ও বীররাজা প্রভৃতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের আবিষ্কার ভিন্ন এ সন্দেহের নিরসন হইবে না। রাজা দিনমণি সিংহ যে ওসমানের লাভপুরে আগমন-সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এ অনুমানের অপর একটি কারণ আছে। ফুল্লরা-মহাপীঠে যে শিব-মন্দিরে 'নারায়ণ গিবির' নাম কোদিত রহিয়াছে, ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণাব্দকাল—বঙ্গীয় ১২৫৯ সাল। গিরিগণের গুরু-পরম্পরা হইতে জানিতে পারা যায়—পীঠের প্রথম-সন্ন্যাসী কৃষ্ণানন্দগিরি হইতে উক্ত নারায়ণ নয় পুরুষ অধস্তন। ঐতিহাসিক-প্রথায় প্রতি-পুরুষের গড়ে ত্রিশ বৎসর হিসাবে বয়স ধরিয়া—১২৫৯ হইতে আরো ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে—বঙ্গীয় ৯৮৯ সালে—আমরা কৃষ্ণানন্দের সময়ে গিয়া উপস্থিত হইতে পারি। সে আজ প্রায় তিন শত বৎসরের অধিক-কালের কথা। প্রচলিত প্রাচীন শ্রুতিধারায় অবগত হওয়া যায়—(রাজা) দিনমণির অন্তগমনের পর সামলাবাদ, শ্বাপদ-সমাকুল নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ আসিয়া সে অরণ্য দেখিয়াছিলেন, এবং তথায় আশ্রম স্থাপন-পূর্ব্বক তিনিই সেই অরণ্যের কতকাংশ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একটি মানব-পরিত্যক্ত-স্থান,—সুদীর্ঘ আড়াই শত বৎসরে—জঙ্গলে পরিপূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সুতরাং কৃষ্ণানন্দের আগমন-কাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে, আড়াইশত বৎসর পিছাইয়া গিয়া খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর (১৩২৪—৫১) মধ্যভাগে, রাজা দিনমণি সিংহকে জীবিত রাখিলে বোধ হয় তেমন বিশেষ কিছু অন্যায় করা হয় না।

অনুমানের কারণ ও আনুমানিক প্রমাণ

লাভপুর এক সময় বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। নৌকা-বহিয়া-বহিয়া—বক্রেশ্বর ও শাল-নদী উভয়ে মিলিয়া—লাভপুরের দক্ষিণে আসিয়া 'লা ঘাটা' নামে পরিচিত হইয়াছে। লা-ঘাটায় বোধহয় আড়ং ছিল, বণিকেরা নৌকা বাঁধিত বলিয়া নাম হইয়াছে লা-ঘাটা। আপনার 'গঙ্গা-যাত্রার'—পথে সমস্ত নদীটি ঐ লা-ঘাটা নামেই চলিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ের—এখানে স্থল পথেও বিশেষ সুবিধা ছিল। এই জন্য লাভপুরের প্রাচীন অধিবাসীর অনুসন্ধান করিলে এক-মাত্র বণিক্‌গণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখনো বণিক্‌দের কাহারো কাহারো লাভপুরের জমিদারীর অংশ আছে। এই গন্ধ-বণিক্‌গণ কোন্ সময় হইতে এখানে বাস করিতেছেন, বিশেষ কিছুই জানা যায় না। লাভপুর নাম কখন্ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। ইহার নিকটে একখানি গ্রামআছে,—নাম ক্ষতিপুর। এই 'লাভ-ক্ষতি' কি বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত!

লাভপুরে বাণিজ্য ও বণিক্‌জাতি

পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। তজ্জন্য বিশেষ অসুবিধা হওয়ায়—বণিকগণ—সরকার উপাধিধারী কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তানকে লাভপুরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালে নবাব-সরকারে চাকুরী করিয়া এই বংশীয়গণ বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। অর্থে-সামর্থ্যে, সম্পত্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে—ইঁহাদের সৌভাগ্য এক সময় লাভপুরের গর্ব্বের বিষয় ছিল। লাভপুরের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-বংশ প্রায় অধিকাংশই ইঁহাদের দৌহিত্র-গোত্রীয়। এই বংশে এখন শ্রীযুক্ত সিতাংশু শেখর সরকার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন। পূর্ব্বের সে অবস্থা নাই—কিন্তু এখনো লোকে ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

লাভপুরের আদি ব্রাহ্মণ, সরকারগণ

লাভপুর যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি। বর্ত্তমান লাভপুর তাঁহারই কীর্ত্তি-কলাপে মণ্ডিত হইয়া বীরভূমের একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। বীরভূমে ব্যবসায় জীবনে উন্নতির ইতিহাস প্রায় দুষ্প্রাপ্য বলিলেও হয়। যাদব বাবুর জীবনী হইতে সে অভাব কিছু পূরণ হইতে পারে। এই দরিদ্রের সন্তান আপন ক্ষমতায়—অবস্থার অভাবনীয় উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা এখন যে বিস্তৃত জমিদারী ও ব্যবসায়ের অধিকারী, তিনিই সে সমস্তের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা সংক্ষেপে ইহাঁর জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

লাভপুরের যাদব বাবু

বঙ্গাব্দ ১২৪৮ সালের ১৩ই ফাল্গুন যাদবলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম আহ্লাদিনী দেবী। যশোহর জেলার প্রতাপকাঠী গ্রাম নিবাসী রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি পুত্র বীরভূমে বিবাহ করেন। ১ম পুত্র দুর্গাদাস বিবাহ করেন—কা-গ্রামে, এবং ২য় পুত্র ক্ষেত্রনাথ সুলতানপুরে ৺কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুলতানপুর গ্রামখানি সুপ্রসিদ্ধ মঙ্গলডিহি গ্রাম হইতে,—উত্তর-পশ্চিমে মাত্র এক্‌ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সুলতানপুরের নাম এক সময় সমগ্র বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই গ্রামে বিনোদরায় নামক একজন ক্রিয়াবান-কুলপতি বাস করিতেন, সাধারণে তিনি 'বঙ্গ-বিনোদ' বা 'বঙ্গের-বিনোদ রায়' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রবাদ আছে,—বিনোদ রায় রাজনগর-রাজের দেওয়ানী করিতেন। নগরের হিন্দু-রাজগণের সময়ে অথবা মুসলমান রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনি রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ, রায়—তাঁহার রাজদত্ত উপাধি। সামাজিক ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য রায় মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কুলাচার্য্যগণ,

যাদব বাবুর পিতৃপরিচয়

সুলতানপুরে বঙ্গ বিনোদ রায়
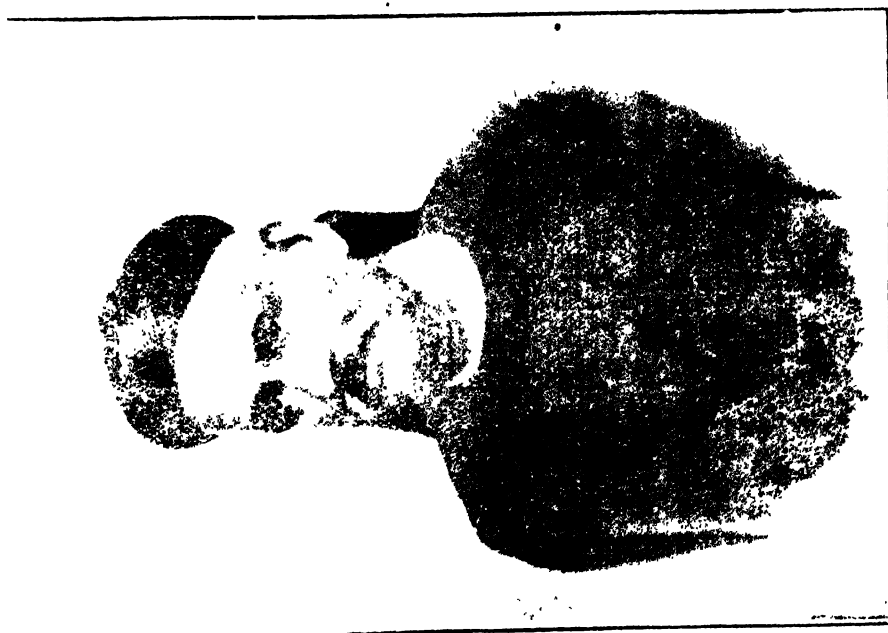
একবার সুলতানপুরে আসিয়া সম্মিলিত হন। মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাদের অবস্থান ও আহারাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, বিদায়ের সময় রায় মহাশয় তাঁহাদিগকে এক একটি—রজত-মুদ্রা পরিপূর্ণ পিত্তল-কলসী দান করেন। সন্তুষ্ট হইয়া কুলাচার্য্যগণ তাঁহাকে—'বঙ্গ-বিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বঙ্গ-বিনোদের বর্ত্তমান বংশধরের নাম সর্ব্বরায়। (২)

(২) মধ্যে একবার সুলতানপুরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের যত্নে গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে রায় বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ক্ষেত্রনাথের পুত্র—রামচন্দ্র। অবিনাশচন্দ্র তাঁহারই পুত্র। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাক্রাকোন্দাগ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন,—পত্নীর নাম বরদাসুন্দরী দেবী। নাক্রাকোন্দায় অবিনাশচন্দ্রের জন্ম হয় এবং পাঁচ মাস বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। ১১ বৎসর বয়সের সময় নাক্রাকোন্দা হইতে ছাত্র-বৃত্তি পাশ করিয়া তিনি শিয়ারশোলের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে গিয়া ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার মেসো' মহাশয়—স্বর্গীয় যাদববাবু রাণীগঞ্জে কার্য্য করিতেন। রাণীগঞ্জে তাঁহার বাসায় থাকিয়া অবিনাশচন্দ্র প্রত্যহ প্রায় তিন মাইল পথ যাতায়াত করিয়া শিয়ারশোলে পড়িয়া আসিতেন। শিয়ার-শোল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এলাহাবাদে গমন করেন। তথায় তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ওকালতি করিতেন। অবিনাশচন্দ্র তাঁহারই বাসায় থাকিয়া এলাহাবাদ হইতেই ক্রমে—এম, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। সুলতানপুরে অবিনাশচন্দ্রের সম্পত্তির মধ্যে ছিল ১৭/ বিঘা মাত্র মালের জমি। সে সম্পত্তিও আবার সুলতানপুরের 'গয়ামণি মোড়লানী' তাঁহার পিতাকে যজ্ঞোপবীতের সময় ভিক্ষা দান করিয়াছিলেন। নাক্রাকোন্দায় তাঁহার মাতা, আপনা ভ্রাতার নিকট হইতে থাকিবার জন্য একখানি বাড়ী ও পাঁচবিঘা মাত্র জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং অবিনাশচন্দ্রের জননী আপনার অলঙ্কারাদি বন্ধক পূর্ব্বক শেষে বা বিক্রয় করিয়া সংসারের ও তাঁহার পাঠেরব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। অবিনাশচন্দ্র সে সংবাদ জানিতেন, এবং সে জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। ভগবৎ কৃপায়—এলাহাবাদে একটা সুবিধা হইয়া গেল, পি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৩৫৲ হিসাবে স্যার চার্লস ইলিয়ট স্কলারশিপ প্রাপ্ত হইলেন। বি, এ ক্লাসে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস—তিনি ধনি সন্তান। দুর্ভাগ্য-বশতঃ পূর্ণচন্দ্র বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গণিতে অনভিজ্ঞতাই এই অকৃতকার্য্যতার কারণ। পূর্ণচন্দ্র জানিতেন অবিনাশচন্দ্র গণিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, সুতরাং তিনি অবিনাশচন্দ্রের নিকট প্রাইভেট্ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং সেজন্য তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে বেতন দেন। ইহার পর অহিফেন-বিভাগের কোনো উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—তাঁহার বেতন ছিল মাসিক তিন শত টাকা, ছুটী লইয়া আসিয়া অবিনাশচন্দ্রের নিকট সারাংশ, অধ্যয়ন করেন, তিনিও মাসিক ৩৫৲ টাকা করিয়া দিতেন। এই সমস্ত টাকা জমাইয়া অবিনাশচন্দ্র প্রথম, মাতার কৃত ঋণগুলি পরিশোধ করিয়া দেন। পরে অবশিষ্ট টাকা হইতে ৫০০ নং লাট সুলতানপুরের কিয়দংশ খরিদ করেন। এই অংশে খাসে অনেক জমি পুকুর

কেত্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই সুলতানপুরে বাস করিতেছিলেন, পরে একসময় দুর্গাদাসও আসিয়া তথায় বাস করেন। যাদবলালের পিতা গণেশচন্দ্র এই দুর্গাদাসের পুত্র। সাংসারিক অসচ্ছলতা বশতঃ জীবিকান্বেষণের জন্য গণেশচন্দ্র লাভপুরে আসিয়া, তথাকার সরকার-বাবুদের অধীনে ভালাস-গ্রামে তহশীলদার নিযুক্ত হন। কার্য্যোপলক্ষে তিনি লাভপুরেই বাস করিয়াছিলেন। লাভপুরেই যাদবলালের জন্ম হয়।

গণেশচন্দ্রের লাভপুরে বাস

বাগান প্রভৃতি ছিল, অপিচ ইহার মুনাফা ছিল একশত টাকা। বাল্যকালে সুলতানপুর তিনি দেখেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ২য় বার্ষিক-শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহার পিতার মাসীমাতা কল্যাণী ঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলে, ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে সুলতানপুরে আসিতে হয়। সেই সময়েই কি জানি কেন সুলতানপুরের প্রতি তাঁহার মমতা জন্মে। সুলতানপুরে সম্পত্তি খরিদের ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ। এম, এ, পাশ করিয়া তিনি আগ্রা কলেজের প্রফেসার নিযুক্ত হন। বলিতে ভুলিয়াছি তিনি যখন এনট্রান্স স্কুলের থার্ড ক্লাসে পড়িতেন সেই সময়েই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। লাভপুরের ৺ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত অবিনাশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। স্বর্গীয় যাদব বাবুর অনুরোধে ইং ১৯০১ সালের ১১ই অগষ্ট তিনি প্রফেসারের কার্য্য ত্যাগ করেন। ইং ১৯০১ সালের মে মাসে ২৫০৲ টাকা এলাউয়েন্স লইয়া যাদব বাবুদের লায়েক-ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর এজেন্ট হইয়া তাঁহাকে পশ্চিমে যাইতে হয়, দিল্লী তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থান ছিল। ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ সালে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতায় উঠিয়া আসে, এখানে তিনি ৪৫০৲ টাকা করিয়া মাসিক এলাউয়েন্স পাইতেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার এই কার্য্যে তাঁহার প্রাপ্য কমিসনের হার ছিল শতকরা দুই আনা হিসাবে। এই সময়—মাসে তিনি প্রায় দুইহাজার টাকা পাইতেন। আগ্রায় তাঁহার বেতন ছিল মাত্র মাসিক একশত টাকা। ইং ১৯১০ সালে লায়েক-ব্যানার্জ্জী কোং কারবার উঠিয়া যায়। ১৯১১সাল হইতে অবিনাশ বাবু কলিকাতায় দালালী-কার্য্য আরম্ভ করেন। জিনাগড়া, নিচিৎপুর, টিসুরা, সোনারডি, প্রভৃতির কলিয়ারীর কয়লা খরিদ-বিক্রয় কার্য্যে কলিকাতায় তিনি এখন একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। এখন অবিনাশ বাবু প্রায় হাজার বিঘা আন্দাজ চাষের জমি এবং দুই হাজার টাকা লাভের জমিদারী করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা সুলতানপুরের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বারা সুলতানপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহার চাষের উন্নতি দেখিয়া স্থানীয় চাষীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চাষের সুবিধার জন্য অবিনাশ বাবু বঙ্গ-বিনোদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'রায়র' নামক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে এমন দেব-মন্দির নাই, যাহা তিনি সংস্কার করিয়া দেন নাই, দুই একটি নূতন করিয়াও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শুনিতে পাই, তিনি যখন

যাদবলালের বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর,—মৌগ্রামের ঠাকুরবাড়ীর মক্তবে (৩) তিনি পার্সী অধ্যয়ন করিতেন। ইতি পূর্ব্বেই মঙ্গলডিহি-গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি পিতার নিকট মক্তবের মাহিনা চাহিতেছিলেন, 'কল্য-দিব' বলিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে না পারায় এবং যাদবের জেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়—মাহিনার পরিবর্ত্তে গণেশচন্দ্র তাহাকে চপেটাঘাত দান করেন। পরদিন প্রাতঃকালে দেখাগেল যাদব নিরুদ্দেশ! চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল, কিন্তু কোনোই সন্ধান মিলিল না। অবশেষে গ্রামবাসী হরিশচন্দ্র দত্ত ও গৌরচন্দ্র সৌ আসিয়া প্রকাশ করিলেন—যাদব গতকল্য সন্ধ্যার পর তাহাদের নিকট দুইটি করিয়া টাকা হাওলাৎ লইয়াছে, কেহ কেহ বলিল তাহারা দেখিয়াছে—বোধহয় তখনো সূর্য্যোদয় হয় নাই—যাদব—গ্রামের বাহিরে পশ্চিম মুখে কোথায় যাইতেছিল। যাহাহউক কিছুদিন পরে রাণীগঞ্জ হইতে ভবসুন্দরী দেবী লিখিয়া পাঠাইলেন "কোনো চিন্তা নাই, যাদব আমাদের বাসায় আসিয়াছে"। সে বোধহয় ১২৬৪ সালের ফাল্গুন কি চৈত্রমাসের কথা।

গৃহত্যাগ

রাণীগঞ্জে যাদব

নিজ বাস-ভবনের জন্য অট্টালিকা প্রস্তুত করাইবার সংকল্প করেন, তখন তাঁহার জননী-দেবীই তাঁহাকে দেব-মন্দির-সংস্কার-কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। জননী—স্বর্গীয়া বরদাসুন্দরী দেবী অগ্রে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে বাস-গৃহ নির্ম্মাণে হস্তার্পণ করিতে দিয়াছিলেন। গত ১৩১৪ সালের ২০শে কার্ত্তিক এই পুণ্যবতী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মায়ের-দেওয়া শিক্ষাই অবিনাশ বাবুকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

ইং ১৯১৭ সালে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোল-কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিনাশ বাবুই তাহার একমাত্র বাঙ্গালী মেম্বর ছিলেন। ভারত-গভর্ণমেণ্টের 'কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি'-বিভাগের মেম্বর অনারেবল স্যার জর্জ্জবার্ণেস তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসা করিয়া এক রিপোর্ট দেন। তাঁহারই ফলে গত ১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারী অবিনাশ বাবুকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যে অবিনাশ বাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ। পুরাতন 'বীরভূমি' (কীর্ণাহার হইতে প্রকাশিত) মাসিক-পত্রিকায় তাঁহার দুই একটি প্রবন্ধ দেখিয়াছি। তাহার পরে আর তাঁহার কোনো লেখা দেখি নাই বটে, কিন্তু বহু-ব্যাপারে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। আমরা এই মহাশয় কর্ম্মী-পুরুষের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

(৩) মহম্মদ কাজেম ফকিরী গ্রহণ করিয়া চরিত্রগুণে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট হইতে ঠাকুর-আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার বাড়ী ঠাকুর-বাড়ী নামে পরিচিত হয়। মৌগ্রামে ঠাকুর-বাড়ী এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাজেমের চেষ্টায় এতদঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। এই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মক্তবকে লোকে ঠাকুরবাড়ীর মক্তব বলিত।

লাভপুরের 'দয়াল' ভ্রাতৃদ্বয়

লাভপুরে সে সময় রামদয়াল ও দীনদয়াল—ভ্রাতৃদ্বয়ের ভারি নাম। ইঁহাদের উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা দুই ভাইয়েই বীরভূমের—সদর সিউড়িতে ওকালতি করিতেন। কিন্তু কেবল উকিল বলিলেই সঠিক পরিচয় দেওয়া হইল না; ওকালতি করিতেন, সদাব্রত দিতেন, ৺পূজার সময় গ্রামে আসিয়া গরীব দুঃখীকে সাহায্য করিতেন, ছোলার মিঠাই বিলাইতেন; আবার সন্ধান লইয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতেও প্রয়োজন মত গোপনে সাহায্য যোগাইতেন নিতান্ত বেগতিক দেখিলে তাহাদের ভিন্ন গ্রামবাসী কুটুম্বগণের নাম করিয়া কাপড় ও মিঠাইএর তত্ত্ব পাঠাইতেন।

দলুবাবু

রামদয়ালকে লোকে দলু বাবু বলিত, তাঁহারই কন্যার নাম ছিল ভবসুন্দরী। দলু বাবুর জামাতা বাঘনাপাড়া নিবাসী বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাণীগঞ্জে বেঙ্গল-কোল-কোম্পানীর অফিসে কাজ করিতেন। বিবাগী যাদব তাঁহাদেরই বাসায় গিয়া উপস্থিত হন। দেখিয়াই ভবসুন্দরী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 'রাগ করিয়া ঘরছাড়া' বটে, তাই বিশেষ যত্ন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে বিহারী বাবুর যত্নে বেঙ্গল কোল-কোম্পানীর অফিসে যাদবেরও একটি কাজ জুটিয়া গেল,—চলিত কথায় যাহার নাম 'খাদ সরকারী' অর্থাৎ কুলীগণের হিসাব-রক্ষক।

খাদ-সরকারী

কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন—তখন—বাবু গুরুদাস বসু। ইঁহার বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার বনডোলা গ্রামে। ইনিও যাদবের মতই একবস্ত্রে গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপন প্রতিভাবলে শেষে দেওয়ান হইয়াছিলেন। তবে ইঁহার গৃহত্যাগের কারণ পিতার চপেটাঘাত নহে—বিমাতার বিষদৃষ্টি! গুরুদাস বাবুর পত্নী—যাদবকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন, কন্যা-পুত্রেরা দাদা বলিয়া ডাকিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই যাদব এইরূপ আরো অনেকেরই প্রীতি-আকর্ষণে সমর্থ হইয়া রাণীগঞ্জে কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। (৪) কোম্পানীর তদানীন্তন ম্যানেজারের নাম বিট্‌ল সাহেব। ইহার পর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসেন—সাহেব এন্ কেনি, এবং গুরুদাস বাবুর মৃত্যুর পর তৎপদে নিযুক্ত হন—বাবু উদয়নারায়ণ রায়। এই

দেওয়ান গুরুদাসবাবু ও যাদবলাল

(৪) গুরুদাস বাবু—আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের মাতামহ। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলেন, "আমার মাতা যাদব বাবুকে দাদা বলিতেন, আমি যাদব বাবুকে দেখিয়াছি, তিনি বেশ অমায়িক লোক ছিলেন, আমাকে বড় আদর করিতেন" ইত্যাদি। কোম্পানীর কার্য্যে দেওয়ান মহাশয় আপন অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মামলা-মোকদ্দমায় অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছেন। পৌত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু এখনো বর্ত্তমান।

সময় যাদবলালেরও উন্নতি হইয়াছিল, তিনি কোম্পানীর আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়লার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থলাভ করিয়া বেঙ্গল-কোল-কোম্পানী অনেক জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন, জমিদারীতে মোকদ্দমা প্রায় লাগিয়াই থাকিত। যাদবলাল সেই সমস্ত মোকদ্দমার তদ্বির করিতেন; এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই পুরুলিয়ায় যাতায়াত করিতে হইত,—পুরুলিয়ার পথ সে সময় অত্যন্ত দুর্গম ছিল। একবার যাদবলাল পাল্কী চড়িয়া পুরুলিয়ায় যাইতেছিলেন, দামোদর নদের ধারে ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া লোকজন শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, যাদবলালও পাল্কীর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিলেন। সঙ্গীরা লাঠী লইয়া—মশাল-জ্বালিয়া—হট্টগোল—করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া দেখে—সম্মুখে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ওৎ-পাতিয়া বসিয়া আছে। পাহাড়-জঙ্গলের লোকে বাঘ দেখিয়া তেমন ভয় পায় না,—তাহারা তাড়া করিল, বাঘ পলাইল। বাহকেরা মোক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল 'আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না ? কারণ তাহারা অনুমান করিতেছে জানোয়ারটি নদীর পরপারে ঘাটি আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিবে, এমন তাহারা অনেকবার দেখিয়াছে'। সে বারের মোকদ্দমাটি কিছু গুরুতর ছিল, সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া—বাহকগণকে তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত —অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। বাহকেরা চলিল,—দামোদরের অপর পারে—প্রায় ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া দেখিল,—তাহাদের অনুমান মিথ্যা নহে। ঘাটের ঠিক উপরেই—বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সশরীরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন,—নদীর দিকে তাহার খরতর দৃষ্টি ! আবার সঙ্গের লোকেরা তাহাকে তাড়া করিল,—এবার কিছু দূরে—বেশীদূরে তাড়াইয়া রাখিয়া আসিল, ক্ষণপরে দূরবর্ত্তী গভীর জঙ্গলে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল, শুনিয়া তাহারাও নিশ্চিন্ত হইল। তখন মোক্তার বাবুকে জানাইল, আর ভয় নাই, বাঘা ভাগিয়াছে। এমন হাঙ্গামা যাদবের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কাজ করিতে গিয়া তিনি পশ্চাৎপদ হইতে জানিতেন না।

উদয়রায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। সমস্ত প্রাতঃকালটা তাঁহার জপে-তপেই কাটিয়া যাইত, বিশেষ কাজ থাকিলেও এন্, কেনি সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাইতেন না। একদিন ভোরেই সাহেবের কি দরকার পড়িয়াছে, উদয় বাবুকে তলব দিয়াছেন। রায় মহাশয় প্রাতঃ-সন্ধ্যায় বসিতে যাইবেন, এমন সময় চাপরাসী আসিয়া হাজির,—'সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়াছেন'! কিছু দিন হইতেই,—এই সময়ে—অসময়ে

আমমোক্তার যাদবলাল

পাল্কীতে যাদব ও পথে ব্যাঘ্র

উদয়রায় ও কেনী সাহেব

তলবের জন্য তিনি সাহেবের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। আজ আবার প্রাতঃকালেই সেই উৎপাত দেখিয়া—চাপরাসীকে পরিষ্কার হিন্দীতে বলিয়া দিলেন যে, (ভাবার্থ এইরূপ) "তোমার সাহেবকে গিয়া বল, আমি তাহার দিবা-রাত্রির ভৃত্য নহি। আমি দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত,—মাত্র দিনের-বেলায়—কোম্পানীর কাজ করিতে বাধ্য;—দরকার হইলে সাহেবকে সেই সময়ের মধ্যেই সব—কিছু কাজই সারিয়া লইতে হইবে। অন্যথায়—অন্য-সময়ে ডাকিলে আমায় পাইবে না। বেশী বাড়াবাড়ি করিতে চায়,—আমি চাকুরিতে ইস্তফা দিব"। ভোরের ঘুম না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই উঠিয়া আসিয়া চাপরাসীটাও কিছু বিরক্ত ছিল। সে গিয়া পুষ্প-পল্লবে সাজাইয়া রায় মহাশয়ের কথাগুলি সাহেবের কাণে তুলিয়া দিল, সাহেব গরম হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার উষ্ণতার বহর দেখিবার পূর্ব্বেই উদয়নারায়ণ সেই দিনই কার্য্যে জবাব দিয়াছিলেন।

উদয়ের কর্মত্যাগ

একদিন প্রাতঃকালে কর্ম্মচারীরা কাছারী-বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন,—সবেমাত্র তাঁহাদের মধ্যে উদয়নারায়ণের সম্বন্ধে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, এমন সময় এন্, কেনি সাহেব আসিয়া উপস্থিত। কর্ম্মচারীগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন,—জেনারেল-ম্যানেজার তো প্রায় কাছারীতেই আসেন না,—তা আবার প্রাতঃকালে। কাজেই কে—যে কি করিবেন—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যাদবলাল একধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সাহেব ডাকিলেন—'যাদব'! যাদব নিকটে আসিলে বলিলেন—'আমি তোমাকে উদয়নারায়ণের পদে নিযুক্ত করিলাম, আজ হইতে তুমিই নায়েব হইলে, যাও তোমার আসনে গিয়া বসিয়া কাজ আরম্ভ কর'। তক্তাপোষের উপর ফরাস বিছানো—তাকিয়া-সাজানো নায়েবের আসন,—যাদবলাল গিয়া বসিলেন; বড়ই বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। সাহেব তখন কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়া দিলেন—'তোমরা নায়েবের অধীন,—সুতরাং আজ হইতে যাদবের আদেশ মানিয়া কার্য্য করিবে'। সাহেব চলিয়া গেলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া কাহারো মুখে কোনো কথা সরিল না। পরে—কেহ কাষ্ঠ-হাসি হাসিল, কেহ গোপনে কটাক্ষ করিল, কেহ সত্যই আনন্দিত হইল, কেহ বা যাদবের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া মিষ্টান্নের প্রার্থনা জানাইল, ক্রমে কাছারী-বাড়ীতে একটা কোলাহল পড়িয়াগেল। কুলিরা—গান বাঁধিল,—

নায়েব যাদবলাল

"কি খেপে এল সায়েব এন্, কেনি,
যাদব বাবু নায়েব হবে স্বপনেও তা না জানি।'

উদয়নারায়ণ যে পদে কাজ করিতেন, কেহ তাহাকে বলিত দেওয়ান, কেহ

বলিত নায়েব। এ-পদের বেতন ছিল মাসিক আশি টাকা। যাদবলাল শেষে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন।

যাদব বাবু যখন আম মোক্তার ছিলেন,—সেই সময় আপনার হাতের কাজ শেষ করিয়া প্রায়ই তিনি অপরের কাজ করিয়া দিতেন। কাজ শিখিবার জন্ত নিজে যাচিয়া পরের কাজ করিতেন। এইরূপে তিনি জমিদারী-সংক্রান্ত প্রায় সকল বিভাগেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, এবং যথাবশ্যক উপদেশ দিতেন। যাদবলাল অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন, উত্তম-অধ্যবসায়—তাঁহার—সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। নূতন কাজ শিখিব—নূতন বিষয় জানিব—এ আগ্রহ তাঁহার এত ছিল যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাদবলালের আর একটা বিশেষ গুণ ছিল,—সহজে মানুষ চিনিবার ক্ষমতা—সুতরাং ব্যবহারে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। আমমোক্তারীর আমলে অনেকগুলি মোকদ্দমা আপোষে মীমাংসা করিয়া দেওয়ায় কোম্পানী এবং প্রজা উভয়েই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল। একবার একটা বড় মোকদ্দমায় জয়লাভ করায় ম্যানেজার-সাহেবও তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। যাদবলালের কার্য্যদক্ষতা ইতিপূর্ব্বেই সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সুতরাং উদয়নারায়ণ যখন কার্য্য ত্যাগ করিলেন—সাহেব যাদবলালকে ডাকিয়া জানিতে চাহিলেন—সে নায়েবের কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছে কি না? অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াই যাদব উত্তর দিলেন,—তিনি কাজ করিতে পারেন, কিন্তু অন্য কর্ম্মচারীরা ইহাতে তাহার উপর ভয়ানক রাগ করিবে। সাহে বলিলেন, সে ভার আমার,—তুমি যাও,—একথা এখন কাহারো নিকট প্রকাশ করিও না। যাদবলাল এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় কোনো দিকে কোনো গোলযোগ ঘটিতে পারে নাই।

যাদবের গুণ

ম্যানেজার এন্‌কেলি ও যাদবলাল

যাদববাবুর অন্ন দানের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। কত অনাথ-বালক যে তাঁহার বাসায় থাকিয়া—লেখাপড়া শিখিয়া—মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। তিনি যখন স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন,—সেই প্রথম ব্যবসায়ের সময়ে—আয় যখন অনিশ্চিত ছিল,—বাসার খরচ তখনো তিনি সমানই রাখিয়াছিলেন। এই সময় বাসা খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ—নায়েবী-আমলে যাদব বাবুর বাসা—একটি 'সদাব্রত-ভাণ্ডারে' পরিণত হইয়াছিল। মফঃস্বলের কর্ম্মচারী,—প্রজা, উমেদার—যে আসিত 'পাতা পাতিলেই ভাত'! কাহারো না-বলিবার উপায় ছিল না। বাসায় তাঁহার

যাদবের অন্নদান

দুইটি 'ঠাকুর' ছিল, তারাচাঁদ ও ভগবতী দফাদার। দুইই প্রকাণ্ড যোয়ান, বোধহয় পাচকের কার্য্য অপেক্ষা লাঠিয়ালের কার্য্যই তাহাদের মানাইত ভাল। এ-হেন ঠাকুরেরাও রাঁধিয়া এবং পরিবেশন করিয়া আঁটিয়া উঠিত না। আর 'হাক' চাকরতো লোকের তেল-জল—জোগাইয়াই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িত, ঘরের কাজে একদণ্ডও অবকাশ পাইত না। এন্, কেনি সাহেব এই সব সংবাদ জানিতেন, তাই লাভের কুঠিগুলির রেজিং-কণ্ট্রাক্টের কাজ, স্থবিধা-দরে যাদবলালকে দিয়া তিনি সাহায্য করিতেন। হরিপুর (বর্দ্ধমান) নিবাসী ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও ডিসারগড়-নিবাসী অম্বিকাচরণ লায়েকের নামে এই সমস্ত কন্ট্রাক্টের কাজ দেওয়া হইত। যাদব বাবুর এই বাসা-খরচ উত্তরোত্তর বাড়িয়াছিল—বই কমে নাই। কিন্তু চাকুরী ত্যাগ করিবার পর কন্ট্রাক্টের কার্য্য না থাকায় অন্য আয় কিছুই ছিল না। তখন শুধুই নিজের ব্যবসায়ের উপর নির্ভর। কিন্তু তথাপি তিনি ব্যয়-সংকোচ করেন নাই। চাকুরীর-অবস্থাতেই—তিনি কয়েকটি কুঠী খরিদ করেন। ইং ১৮৮৫—কি ১৮৮৬ সালে কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে ছোট ধেমুয়া এবং ইং ১৮৮৭ সালে বেগুনীয়াকুঠী অবিনাশচন্দ্রের (পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি রাণীগঞ্জের বাসায় থাকিয়া শিয়ারশোলে পড়িতেন।) বেনামে খরিদ করা হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি আরো অনেকগুলি কুঠী খরিদ করিয়াছিলেন। এই কয়লার ব্যবসায় হইতেই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি জমিদারী আদি খরিদ করেন।

কেনীর সাহায্য

কুঠীয়াল যাদবলাল

গিরিডি'র নিকট বারাগণ্ডা-খনির কার্য্যের জন্য একটি যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়, এন্, কেনি সাহেব তাহার প্রায় এক-লক্ষ টাকার অংশ খরিদ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে গুজব শুনা গেল—"বারাগণ্ডায় খনিজ পদার্থ কিছুই নাই, বহুদিন পূর্ব্বে কাহারা ঐ খনির কার্য্য শেষ করিয়া, উপরে লোহার পাত আঁটিয়া—তাহাতে মাটি ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। (খনিতে কাজ করিবার) অনেক যন্ত্রপাতিও নাকি তথায় পাওয়া যাইতেছে।" শুনিয়াইতো সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি যাদব বাবুকে সংবাদ জানিতে পাঠাইলেন। বহুকষ্টে যাদব বাবু বারাগণ্ডায় উপস্থিত হইয়া, যেন কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এইরূপ ভাবে স্থানীয় লোকের সঙ্গে মিশিয়া,—সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়া সাহেবকে জানাইলেন—যাহা রটিয়াছে—তাহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। কেনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় গিয়া,

যাদবের কার্য্য দক্ষতা

কৌশলে দুই-লক্ষ টাকা মূল্যে আপনার অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। প্রায়—'জলে-যাওয়া' টাকাগুলির উদ্ধার হওয়ায়, অপিচ তাহারই সমসংখ্যক টাকা বিনা কারণে লাভ পাওয়ায়—এই সহৃদয় বৃটিশ-সন্তানের চিত্ত—কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল,—রাণীগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া যাদবলালকে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই কেনি—কার্য্য ত্যাগ করেন। যাদববাবুকে তিনি এতই স্নেহ করিতেন,—যে অতিবড় জাঁদরেল সাহেবগণকেও কেনির—কৃপালাভের জন্য কালা আদমী যাদবলালের দ্বারস্থ হইতে হইত।

কেনির কৃতজ্ঞতা

কেনি সাহেবের পর ম্যানেজার হইয়া আসেন 'ডয়েল' সাহেব। তাঁহার ফরমায়েস মত জিনিস যোগাইয়া, কিছুদিন পরে 'বিল' পাঠাইয়া দেওয়ায় সাহেব যাদববাবুর উপর ভয়ানক চটিয়া যান। অতঃপর যাদববাবুর বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে একুশবার তিনি উপরওয়ালার নিকট রিপোর্ট করেন। কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। কিছুদিন যাদববাবু নীরব ছিলেন, অবশেষে অসহ্য হওয়ায়—তিনি কতকগুলি বিষয় বাঙ্গালায় লিখিয়া,—শিয়ারশোলের হেড্‌মাষ্টার বাবু গিরীশচন্দ্র মণ্ডলের দ্বারা ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া, তাহা কোম্পানীর হেড্‌-অফিসে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। পত্রপাঠ—টেলিগ্রামে আদেশ আইসে, কার্য্যত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ডয়েলকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'যাদববাবু! তুমি কি আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছ'? যাদব বাবু উত্তর দেন—'আজ্ঞা হাঁ, আপনার একুশবার লেখার পর আমি একবার লিখিয়াছি'। তৎপরদিনই কার্য্যত্যাগ করিয়া সাহেব কলিকাতায় প্রস্থান করেন। এইবার যিনি ম্যানেজার আসিলেন, তাঁহার নাম হিল সাহেব।

যাদববাবুর পত্রে ডয়েল ডিস্‌মিস্‌

যাদববাবুর উন্নতি অনেকের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। বিবিধ চেষ্টায় তাঁহার অনিষ্ট সাধনায় অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে তাঁহারা কথা তুলিলেন,—কোম্পানীর কাজ করা ও কয়লার-কুঠি রাখা, এ-দুইটির একত্র-সংযোগ আইন-বিরুদ্ধ। কর্ম্মচারীরা দেখিলেন,—এ কথা সাহেবে শুনিয়াথাকেন, ম্যানেজার হিল, যাদব-বাবুর নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। যাদববাবু স্পষ্টতঃ স্বীকার করিলেন,—তিনি চাকুরীও করেন এবং কুঠিও রাখেন। কিন্তু ইহা যখন আইন-বিরুদ্ধ তখন এরূপ কাজ আর করিবেন না। অতঃপর হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া ইং ১৮৮৯ সালে যাদববাবু কোম্পানীর চাকুরী পরিত্যাগ করেন।

হিলের হাঙ্গামা ও যাদবের কর্ম্মত্যাগ

চাকুরী ত্যাগ করিয়া তিনি অম্বিকাচরণ নায়েকের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়

আরম্ভ করেন, তাঁহাদের কোম্পানীর নাম হয় "লায়েক-ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং"। কিছুদিন পরে এই কার্য্যে তাঁহারা একজন উপযুক্ত সহকারী লাভ করিয়াছিলেন,—তিনি যাদববাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আই, এ পাশের পর—তিনবৎসর ইঞ্জিনীয়ারীং-বিভাগে শিক্ষালাভ করিয়া—নরেন্দ্রনাথ লোধ্না-কুঠির ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কার্য্য-গ্রহণের সময় তাঁহার বেতন ছিল ৪০৲ টাকা, পরে তিনি—বেনেহিল কুঠি, জয়রামপুরের কুঠি, খড়িলা কুঠি প্রভৃতির এক আনা করিয়া অংশীদার হইয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া কোম্পানী—তাঁহার বেতন বাড়াইয়া একশত টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। মাটির—উপরকার অবস্থা দেখিয়া—খনিজ-পদার্থের প্রকারভেদ, প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয়ে ইঁহার অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয়। যাদববাবুর ব্যবসায়-জীবনের ইতিহাস সাধারণের একটি অবশ্য-জ্ঞাতব্য-বিষয়। আর সে বিষয় জানিতে হইলে এই নরেন্দ্রনাথ ও রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্রের জীবনকাহিনী জানাও বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু বীরভূম-বিবরণ সে আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। আশা করি ভবিষ্যতে কেহ এই অভাব পূরণ করিবেন। ইং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যাদববাবু লাভপুরে যখন উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, সেই সময় ঐ সমস্ত কার্য্যে সাহায্যের জন্য অবিনাশবাবুকে প্রফেসারী পরিত্যাগ করাইয়া লাভপুরে আনয়ন করেন। অবিনাশবাবুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লায়েক-ব্যানার্জ্জী কোম্পানী উঠিয়া যাওয়ায় নরেন্দ্রবাবু স্বাধীনভাবে পুরাতন কল-কব্জার খরিদ-বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায়-বিভাগে ইনিও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ হৃদয়বান্-পুরুষ, তাঁহার মধুর ব্যবহার মনে রাখিবার জিনিস।

নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র

শ্বশুরালয়ে যাদবলাল

ফাল্গুন কি চৈত্রমাসে যাদবলাল গৃহত্যাগ করেন, প্রায় ছয়মাস পরে ৺দুর্গাপূজার সময় তিনি ফিরিয়া আসেন,—কিন্তু বাড়ীতে নহে, শ্বশুরালয়-মঙ্গলডিহিতে। তাঁহার পত্নী কুঞ্জলতা দেবী তখন মঙ্গলডিহিতেই ছিলেন। গণেশচন্দ্রের সুলতান্পুরের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। পূজার সময় তিনি সপরিবারে সুলতানপুরে আসিতেন, সে-বারও আসিলেন। সংবাদ পাইয়া যাদবলাল মায়ের নিকট সাতটি টাকা এবং একখানি ময়ূরকণ্ঠী-সাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। পরে গণেশচন্দ্র মঙ্গলডিহি গিয়া, অভিমান ভাঙ্গাইয়া যাদবকে সুলতানপুরে লইয়া আসেন। পত্নী কুঞ্জলতার মৃত্যুর পর যাদবলাল নাক্রাকোন্দায় বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার

মানভঞ্জ

তিন পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্র—ষষ্ঠীকিঙ্কর, অতুলশিব ও নির্ম্মলশিব। কন্যা—শিবদাসী, শিবরাণী ও শিবসতী। অতুলশিবের মত সদাশয়, পরদুঃখ-কাতর ধনি-সন্তানের অকাল-বিয়োগে লাভপুর সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অতুলশিব লাভপুরের অলঙ্কার ছিলেন। ষষ্ঠীকিঙ্কর ও নির্ম্মলশিব পিতার সুনাম বজায় রাখিয়াছেন।

যাদববাবুর পুত্রকন্যা

লাভপুরে যাদববাবু বহু সংকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গণেশ-চতুষ্পাঠী উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়, দাতব্য-চিকিৎসালয়, জগদম্বা-বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ফুল্লরাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবী-মন্দিরের সম্মুখে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী ও বাসুদেব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দিরে অতিথিসেবার ব্যবস্থা প্রভৃতি তাঁহার পুণ্য-চরিত্রেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠার উৎসবে লাভপুরে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। শীতল-গ্রামের 'বাজীকরেরা' সে সময় গান বাঁধিয়াছিল—

যাদববাবুর কীর্ত্তি

"সকল লোকে বলছে যাদব বাবু ভারি পুণ্যবান্।
বাড়ীতে গো শিব বসিয়ে বাড়ী কল্লে কাশী-ধাম"॥

কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থা হইতে আপন ক্ষমতায় লক্ষপতির আসন অধিকার করিয়া ইং ১৯০৬ সালের ১৭ই এপ্রেল এই স্বনামধন্য-পুরুষ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

'যাদবলাল উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে লাভপুরে একটি মধ্য ইংরাজী-বিদ্যালয় ছিল। লাভপুরের অন্যতম জমিদার ৺স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হেড্‌মাষ্টার স্বর্গীয় ললিতকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার ২।৩ বৎসর পরে এই বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায় (৫) গিরীশবাবুও একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তিনিও সামান্য অবস্থা হইতেই বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারী হইয়াছিলেন। গিরীশ-বাবুর এতই প্রতিপত্তি ছিল, যে লাভপুর,—এমনকি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহেরও কোনো কাজ তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সম্পাদিত হইত না। যাদববাবুও প্রায়

লাভপুরের গিরীশবাবু

(৫) এই সময়েই লাভপুরে বালিকা-বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। হেড্‌মাষ্টার ললিতবাবু প্রায় ধরিয়া-বাঁধিয়া সাধারণের মত করাইয়া কয়েকটি বালিকাকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। ক্রমে সাধারণের মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হয়, পরে জগদম্বা-বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লাভপুরে এখন স্ত্রীশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ইহাঁর পিতামহ—সরকারদের বাড়ীতে বিবাহ করিয়া লাভপুরে আসিয়া বাস-করেন। ইনি (লাভপুরে) প্রথম আমলের সবরেজিষ্ট্রার ছিলেন। ইহাঁর পুত্র ৺শৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইদানীং লাভপুরের যে কোনো জন-হিতকর কার্য্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতেন। স্থানীয় গরীব-দুঃখী লোকে তাঁহাকে "মা-বাপ" বলিয়া মনে করিত। বর্ত্তমান বর্ষের গত ৭ই বৈশাখ এই সরল, উদার, পরোপকার-পরায়ণ, তেজস্বী যুবক মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। লাভপুরের 'কাঙ্গাল-গরীব' আজিও তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে। বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। বর্ত্তমান-খণ্ডের উপকরণ সংগ্রহে অনেক বিষয়ে আমরা তাঁহার সাহায্য পাইয়াছিলাম। আমাদের এই ক্ষুদ্র-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা আজ কোন্ লোকে তাঁহাকে জানাইব!

৺শৈবেশচন্দ্র

লাভপুরের সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় 'ব্যবসায়-নিষ্ঠা'। যাদববাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ষষ্ঠীকিঙ্কর একজন পাকা ব্যবসায়ী। তাঁহার, নরেন্দ্রবাবুর এবং রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্রের ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়ার ফল এই হইয়াছে, যে স্থানীয় বহু উচ্চ-শিক্ষিত যুবক "যেমন-তেমন চাক্‌রী, ঘি' ভাত" এর মায়া ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়-বিভাগে প্রবেশ করিতেছে। ইহা শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। এই স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বনের একটা সুফল হাতে-হাতে ফলিয়াছে,—লাভপুরে সাহিত্য-সেবা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া উঠিতেছে। পরলোক-গত অতুলশিবের স্মৃতি-রক্ষার জন্য ইতিপূর্ব্বেই একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েকজন উৎসাহী-যুবকের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহা এখন,—একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। লাভপুরে ইতিমধ্যেই কয়েকজন লেখক দেখা দিয়াছেন,—সাধুভাষায় যাহাদিগকে 'উদীয়মান' বলিলেও অন্বর্থের অসঙ্গতি হয় না। লাভপুরে সাহিত্য-চর্চ্চার গুরু,—এই উদীয়মান দলের অগ্রদূত শ্রীমান্ নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁহাকে এখন আর উদীয়মান বলা চলিবে না, কারণ নাটক লিখিয়া শ্রীমান্ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। নির্ম্মলের হৃদয় সত্য-সত্যই নির্ম্মল, বিনয়, সদালাপ, শিষ্টাচার, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ তাহাতে বিদ্যমান্। গানে, গল্পে, আলোচনায়, রহস্যে,—মজলিসে তাহাকে চৌকষরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে 'অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট'রূপে এবং 'লাভপুর-ইউনিয়ন' কমিটীর প্রেসিডেন্ট রূপে ইহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার

লাভপুরে ব্যবসায়ে নিষ্ঠা

লাভপুরে সাহিত্য-চর্চ্চা

সহিত কোনো স্বার্থসম্বন্ধ নাই,—এমন লোকের নিকটও আমরা তাহার প্রশংসা শুনিতে পাই। এখানে সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দিতেছি।

যাদববাবুর এই কনিষ্ঠ পুত্রটি,—তাঁহার রাণীগঞ্জের বাসায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেদিন—বোধ হয় ২২শে আশ্বিন—বঙ্গাব্দ সন ১২৯১ সাল। লাভপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ করিয়া কিছুদিন রাণীগঞ্জে অধ্যয়ন করিবার পর, নির্ম্মলশিব লাভপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। রাণীগঞ্জে চতুর্থ-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে কলিকাতায় গিয়া, কাশীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়া আসে,—বয়স—তখন প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া নির্ম্মল বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা না থাকিলেও, মানুষ যে অপাংক্তেয় হয় না, বর্ত্তমান বাঙ্গালায় এ-হেন দৃষ্টান্তের অভাব নাই,—নির্ম্মলশিব তাহার অপর একটি দৃষ্টান্তস্থল।

নির্ম্মলের কথা

বাল্যকাল হইতেই নির্ম্মলের নাটকের-নেশা,—নিদারুণ বলিলেও হয়। অনেক দিন পূর্ব্বের কথা,—'প্রদীপে' 'চিত্রা'নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। নির্ম্মল সেই গল্পটিকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া, কয়েকজন সমবয়সী বন্ধুর সহিত অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের লাভপুরের বাড়ীর সেই রঙ্গ-প্রকোষ্ঠটি—আজিও থিয়েটার-কুঠ্‌রী নামে পরিচিত। তাহার প্রথম লেখা দেখিয়াছিলাম—'বীরভূম বার্ত্তায়',—'অন্তরায়' নামে একটি ক্ষুদ্রগল্প কয়েক-সপ্তাহ ধারাবাহিকরূপে তাহাতে প্রকাশিত হয়। 'অন্তরায়' বোধ হয় পুস্তকাকারেও বাহির হইয়াছিল। অন্তরায়—মাত্র এইটুকু জানাইয়া দিয়াছিল, যে সুপ্ত-শক্তি ধীরে ধীরে জাগরিত হইতেছে। বাস্তবিকই—নবীন-লেখকের এই চেষ্টার পরিণতি দেখিয়াছিলাম,—শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম,—বীরভূমি (নবপর্য্যায়) মাসিক-পত্রে প্রকাশিত 'অন্তঃশীলা', 'ঘড়িওয়ালা' প্রভৃতি গল্পে। পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম, বুঝিতে পারিয়াছিলাম—সাধিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। তখন হইতেই যে আশা পোষণ করিয়াছিলাম,—আমাদের সে আশা পূর্ণ হইয়াছে, নির্ম্মলের লেখনী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তাহার 'বীররাজা' নাটক ও 'বাহাদুর', 'রাতকাণা' এবং মুখের-মত' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসনগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া শত শত দর্শকের চিত্ত-

নির্ম্মলের সাহিত্যালোচনা

নাট্যকার নির্ম্মল

বিনোদন করিতেছে। (৬) পুস্তক-পাঠে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকগণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। পুস্তকের বিশেষত্ব,—সেগুলি প্রায় বীরভূমির ইতিকথা ও প্রবাদ লইয়াই রচিত। এখন ভরসা হইতেছে, সাধনা—যদি বিপথগামী না হয়,—ধনি-সন্তানের কর্ম্মনাশা-ব্যাধি, চিরন্তন-শত্রু আলস্য ও জড়তা আসিয়া অধিকার বিস্তার না করে, তবে তাহার দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারিব, জন্মভূমি গৌরবান্বিত হইবে। নির্ম্মল আমাদের সোদর-প্রতিম স্নেহের পাত্র। ভগবানের নিকট আমরা তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি। নবীন লেখক-গণের মধ্যে শ্রীমান্ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ও শ্রীমান্ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতে পারা যায়। নিত্য-গোপালের 'ফল্গু' (কবিতা) ও 'পাঁচফুল' (গান) এই দুইখানি বই বাহির হইয়াছে, 'চণ্ডীদাস' (নাটক) প্রকাশিত হইতেছে।

লাভপুরের নবীন লেখক

লাভপুরের পূর্ব্বপ্রান্তে 'ফুল্লরা-মহাপীঠ'। একটি ক্ষুদ্র কানন-মধ্যে এই পীঠ-ক্ষেত্র—দেখিলে পুরাণ-বর্ণিত তপোবনের কথা মনে পড়ে। দেবীর মন্দির-সম্মুখে নাট-মন্দির, স্বর্গীয় যাদববাবুর সংকল্প মত তাঁহার পুত্রেরা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ভোগমন্দিরটি লাভপুরের হরিলাল দত্তের প্রতিষ্ঠিত। নাটমন্দিরের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী,—লাভপুরের অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—তাহার ঘাট বাঁধাইয়া দেওয়ায়—এবং ঘাটের দুই পার্শ্বে যাদববাবু কর্ত্তৃক দুইটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়—স্থানটির সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি হইয়াছে। মহাপীঠের অদূরবর্ত্তী একটি স্থানের নাম 'যোগিনীতলা'। পীঠের ঈশান-কোণে একটি স্থান—যুদ্ধ-ডাঙ্গা নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে—কোন্-কালে এখানে নাকি অসুরবধ হইয়াছিল। মহাপীঠের পূর্ব্বে (দক্ষিণে কতকাংশ ব্যাপিয়া) একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের বিলুপ্তাবশেষ অধুনা দেবীদহ নামে প্রসিদ্ধ। শুনিতে পাওয়া যায়—পূর্ব্বে দেবীদহে নীলপদ্মের বন ছিল। কবিবর কৃত্তিবাসের প্রমাদে—'শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব' 'দেবীদহ' ও 'নীলপদ্মের' কথা শুনিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে—ত্রেতার পবন-পুত্র শ্রীমৎ—মারুতি অষ্টাধিক-

ফুল্লরা-মহাপীঠ

(৬) 'বীররাজা' মিনার্ভায় অভিনীত, প্রথম অভিনয় ১১ই আষাঢ় ১৩২২।
'বাহাদুর' মনোমোহনে „ প্রথম অভিনয় ৮ই বৈশাখ ১৩২৩।
'মাতকাণা' মিনার্ভায় „ „ ১৩২৪।
'মুখেরমত' ষ্টারে „ „ ২৫শে ফাল্গুন ১৩২৫।
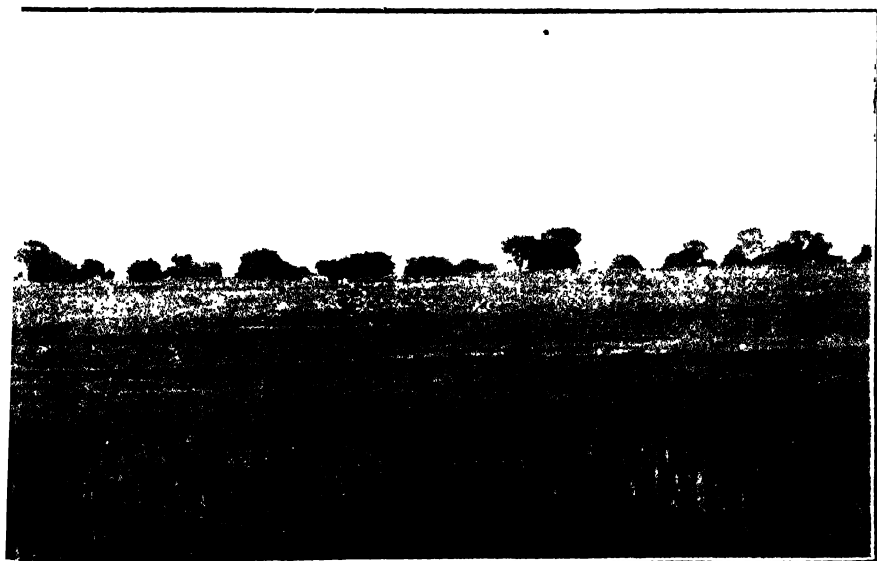
শত-সংখ্যক নীলোৎপল—এখান হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রাচীনগণ বলেন—দেবীদহে একটি সুবৃহৎ নৌকা—পঙ্কে নিমজ্জিত রহিয়াছে। জল কমিয়া-গেলে অনেকবার তাঁহারা—তাহার মাস্তুল আদি দেখিয়াছেন।

পীঠমালা-মহাতন্ত্রে উল্লিখিত আছে—

তন্ত্রের প্রমাণ

"অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরাস্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥"

প্রত্যহই অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে 'সুরা' না দিলে দেবীর ভোগ হয় না। ফুল্লরার মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে একটি বৃক্ষতলে ভৈরব—বিশ্বেশ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন! শিবাভোগ-অট্টহাসের একটি প্রধান—দৃশ্য। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যদি শিবাগণ আসিয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যায়, যে দেবী নিবেদিত-দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন। যদি কোনো কারণে কোনো দিন শিবাভোগ না হয়,—তাহা হইলে ভোগ-মন্দির পরিষ্কৃত করিয়া নূতন পাত্রে ভোগ-পাকপূর্ব্বক—আসব-শোধিত সেই সমস্ত দ্রব্য দেবীকে নিবেদন করিয়া পুনরায় শিবাভোগ দিতে হয়। স্ব-প্রদত্তদ্রব্য শিবাগণ গ্রহণ না করিলে,—যাত্রীগণ তাহা আপনাদের অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের কারণ বলিয়া মনে করে। শুনিতে পাওয়া যায়—প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে তিন দিন শিবাভোগ হয় নাই। তদানীন্তন রাজ-পুরোহিত রামসাগর ওঝা—আপন ভ্রাতা রামরাম ওঝার উপর ভোগাদির ভারার্পণ করিয়া-মুর্শিদাবাদ জেলার সাউপাড়া গ্রামে রামায়ণ-গান করিতে গিয়াছিলেন, তথায় তিনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন। এদিকে লাভপুরের ভদ্রলোকগণ কোত-ঘোষা-নিবাসী হরিচরণ তর্কালঙ্কারকে (৭) আনাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নে কোনো ফল না পাইয়া ওঝাকে আনিতে সাউপাড়ায় লোক প্রেরণ করেন। সাগর ওঝা আসিয়া দেখিলেন, রামরামের হাতে নখের ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতেছে। তিনি

শিবাভোগ

(৭) লাভপুরের আড়াইক্রোশ পূর্ব্বে কোতলঘোষা গ্রাম। এই গ্রাম পূর্ব্বে পণ্ডিত-সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সে আজ অনেকদিনের কথা ৺রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের পাঁচ পুত্র রামগোপাল, মদনগোপাল, জীবনগোপাল, জয়গোপাল ও নন্দগোপাল—শক্তি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তদবধি কোতলঘোষা পঞ্চগোপালের-পাট নামে খ্যাত। শুনিতে পাওয়া যায়—একজন গোপাল নবদ্বীপে গিয়া—ভ্রম-ক্রমে অমাবস্যা-তিথিকে পৌর্ণমাসী বলায়—লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। তিনি সেই জন্য সাধনায় শংকরীকে তুষ্ট করায় দেবী আপনার কঙ্কণের জ্যোতিতে নবদ্বীপ আলোকিত করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ৺উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মাতা—স্বামীসহ সহমরণে গিয়াছিলেন। লোকে উমেশচন্দ্রকে সতী-পুত্র বলিয়া সম্মান করিত। কয়েক বৎসর হইল ইহার লোকান্তর হইয়াছে।

বুঝিতে পারিলেন সেই জন্যই ভোগ অস্পৃশ্য হইয়াছে। পরদিন তিনি স্বহস্তে ভোগ-পাক করিয়া দিলে—শিবাদল আসিয়া খাইয়া গিয়াছিল। আর একবার প্রায়—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শিবাভোগ বন্ধ হইয়াছিল। তখন রঘুবর দাস গোস্বামী—গদীয়ান ছিলেন। তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করিলে—গ্রামস্থ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তে ভাণ্ডার জিম্মা থাকে। উচ্ছিষ্ট-হস্তে ভোগের দ্রব্য স্পর্শ করায় ভোগ অশুদ্ধ হইয়া যায়। সে-সময়ে রাজ-পুরোহিত ছিলেন তিনকড়ি ওঝা। তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যাপারটি প্রকাশ হইয়া পড়ায়—আবার নূতন-করিয়া ভোগ পাক করিয়া শিবাভোগ দেওয়া হইয়াছিল।

কৃষ্ণানন্দগিরি

বৌদ্ধগয়ার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-মঠের কৃষ্ণানন্দগিরি নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই পীঠের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তৎপূর্ব্বে একটি বৃক্ষমূলে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন,—মাত্র ফুল-জল দিয়া তাঁহার পূজা হইত। কৃষ্ণানন্দই একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীর নিত্য ভোগাদির ব্যবস্থা করেন। তিনি ৺কাশী-ধামে কেদারনাথের নিকট স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন কৌল-কৃষ্ণানন্দ—পঞ্চ-'ম'কারে উপাসনা করিতেন, দেবীর বর্ত্তমান পূজা-পদ্ধতি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। এই পীঠে অনেক সাধক সিদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বে

দরবারগিরি

নারায়ণগিরির নাম করিয়াছি, তাঁহার গুরু দরবারগিরি যোগিনীতলায় শবসাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত রাজ-পুরোহিত রামসাগর ওঝা তাঁহার উত্তর-সাধক ছিলেন। বাকুলের দিগম্বর পাঠকও নাকি এই পীঠেই সিদ্ধিলাভ করেন। প্রবাদ আছে,—"কৃষ্ণানন্দ হইতে অধস্তন চতুর্থ—পীঠ-স্বামী সরস্বতী গিরির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন পাঠকের গৃহে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতেছে, এমন সময় 'সুধাপাত্র' সহ গিরি গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পাঠক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলে—তিনি পাঠককে আসব গ্রহণে

সরস্বতীগিরি ও দিগম্বর পাঠক

ইঙ্গিত করিলেন। দিগম্বর পার্শ্ববর্ত্তী জ্ঞাতিবর্গকে দেখাইয়া অসম্মতি জানা-ইলে—তিনি ক্রোধিত হইয়া শাপ প্রদান করেন,—'তুমি যেমন দেবীর প্রসাদ অবজ্ঞা করিলে,—তেমনি অচিরেই নির্ব্বংশ হইবে!' পাঠক তাহার উত্তর দেন যে, 'তুমি জ্ঞাতিসমক্ষে আমার গুপ্তসাধন ব্যক্ত করিয়া কৌল-রীতির অব মাননা করিয়াছ, অতএব আমিও তোমাকে অভিশাপ দিতেছি—পিপীলিকায় তোমার চক্ষু খুলিয়া খাইবে'! এই ঘটনার কিছুদিন পরেই পাঠক নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, এবং প্রবল জ্বরবিকারে অচৈতন্যাবস্থায়—বন্য-পিপীলিকায় সরস্বতীর চক্ষু দুইটি নষ্ট করিয়া তাঁহাকে পরলোকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।"

জুরবানগরে প্রাপ্ত একটি বাসুদেব ও অপর দুইটি মূর্তির ভগ্নাংশ।

রঘুবরদাস গোস্বামী নামে এক সাধু এই পীঠে ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয়া মহাপূজার সময়—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী—চারিদিন দেবীর বিশেষ পূজা হয়। বিজয়ার দিনে এখানে অনেক লোকের সমারোহ হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনের যত্নে (বিগত ১৩০৬ সাল হইতে,) মাঘী পূর্ণিমার সময় মহাপীঠে একটি মেলা হয়। মেলায় বহুলোকের সমাগম এবং যথেষ্ট ধূম-ধাম হয়। কুমুদীশবাবু এই মেলার জন্য বহু আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। পীঠের উন্নতিকল্পে তাঁহার উদ্যোগ, যত্ন ও পরিশ্রম প্রশংসার্হ।

ফুল্লরায় মেলা

বর্দ্ধমান জেলায় কেতুগ্রামের প্রায় দুই মাইল দূরে অট্টহাস নামে একটি পীঠ আছে। কেহ কেহ বলেন ঐ অট্টহাসই মহাপীঠ। তাঁহাদের মতে 'বিশ্বেশো-ভৈরবস্তত্র' এই পাঠ ঠিক নহে, এখানে 'বিশ্বেশো-ভৈরবস্তত্র' হইবে। এই প্রমাণানুসারে তাঁহারা—অট্টহাস হইতে যোজনাভ্যন্তরে—(কাটোয়া হইতে উত্তর-পশ্চিমে কুলাই আসিবার পথে) বিশ্বেশ-ভৈরবের অধিষ্ঠানভূমি নির্দ্দেশ করেন। কেতুগ্রামের অট্টহাসের পীঠাধিষ্ঠাত্রীর নামও ফুল্লরা। সেখানেও শিবাভোগ হয়। যাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন—তাঁহারা বলেন যে—"এই অট্টহাস শুধু মহাপীঠ নহে,—এখানে সিদ্ধপীঠে, উপপীঠে ও মহাপীঠে সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে। সুতরাং এই স্থান তান্ত্রিকগণের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।" প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা—কুব্জিকাতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করেন—

কেতুগ্রামের অট্টহাস

'অট্টহাসে মহানন্দো মহানন্দা মাহেশ্বরী'

* * * * *

অন্যত্র— 'অট্টহাসে চ চামুণ্ডা তন্ত্রে শ্রীগৌতমেশ্বরী'।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই অট্টহাস হইতে চামুণ্ডা-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে উপহার দিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রামাণিকতাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পীঠ-সাঙ্কর্য্যের উদাহরণ বিরল নহে। পীঠ-দেবীর অধিষ্ঠানভূমি হইতে ভৈরবের অধিষ্ঠানক্ষেত্রের দূরত্বও বহু পীঠেই দেখিতে পাওয়া যায়। বরং ইহাই স্বাভাবিক, দেবী ও ভৈরবের অবস্থান-নৈকট্য ক্বচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সমস্যার মীমাংসা তান্ত্রিক ভিন্ন অপরের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

অট্টহাসের চামুণ্ডা

লাভপুর থানার অন্তর্গত 'সিধলগ্রাম' (৮) নামে একখানি গ্রাম আছে। আমরা এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ 'বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেবভট্টের' জন্মভূমি বলিয়া মনে করি। সিদ্ধলগ্রামী প্রথম ভবদেবের—মহাদেবও অট্টহাস নামে অপর দুই ভ্রাতা ছিলেন। অট্টহাস—সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বালবলভীভুজঙ্গের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এই দুই ভ্রাতার মধ্যে মহাদেব—বিরিঞ্চিএবং অট্টহাস-হরের (শংকরের) সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। বিরিঞ্চির সৃষ্টি-কর্তৃত্ব এবং হরের-যোগীশ্বরত্বের ইঙ্গিতে আমরা (প্রবাদের সমর্থন সূচক) এই আভাসই প্রাপ্ত হই। আমাদের মনে হয় তাঁহারই সাধনভূমি বলিয়া লাভপুরের ফুল্লরাপীঠের নাম 'অট্টহাস' হইয়াছিল ভবদেবের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র আদিদেব—বঙ্গরাজের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন, বঙ্গরাজের নিকট হইতে তিনি হস্তিনীভিট্ট গ্রাম লাভ করেন। লাভপুরের উত্তর-পূর্ব্বে কিছু দূরে মুর্শিদাবাদ জেলায় 'হাতীছালা' নামে একখানি গ্রাম আছে। (৯) রামপুরহাটের নিকট আর একখানি গ্রাম আছে, তাহার নাম হাতীকান্দা। এ অঞ্চলে এই নামের গ্রামের আধিক্য দেখিয়া মনে হয়—পূর্ব্বোক্ত হাতীছালাই হয়তো হস্তিনীভিট্ট। বালবলভীভুজঙ্গ—রাঢ়ে একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লাভপুরের যে দেবীদহ নামক বিস্তৃত জলাশয়ের উল্লেখ করিয়াছি, উহাই ভবদেবভট্ট—প্রতিষ্ঠিত জলাশয় হওয়াই সম্ভব। উহার প্রাচীনত্বের প্রবাদ,—দেবখাতরূপে প্রসিদ্ধি, দেবীদহ নাম এবং সিদ্ধলগ্রামের সমীপবর্ত্তিতা আমাদের এই অনুমানের সমর্থন করে। সামলাবাদের সঙ্গে বঙ্গেশ্বর 'সামলবর্ম্মার' কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। সিদ্ধলগ্রামের আর একটি ব্রাহ্মণ-বংশও বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মা—

সিদ্ধলগ্রাম ভবদেব ভট্ট ও অট্টহাস

আদিদেব এবং হস্তিনীভিট্ট

বালবলভী ভুজঙ্গের জলাশয়

সামল বর্ম্মা

(৮) লাভপুর থানার মানচিত্রে (গ্রাম নং ৩৭৮) এই গ্রামের নাম 'সিধলগ্রাম' বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। লোকেও ইহাকে সিধলগ্রাম বলে। ইহা সিদ্ধলের অপভ্রংশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ভবদেবের প্রশস্তিতেও রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামের নাম উল্লিখিত আছে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

(৯) হাতীছালার নিকটে 'দেউলে' নামক স্থানে ১।২ বিঘা জমি জুড়িয়া একটি ধ্বংসস্তূপ আছে। প্রবাদ—তথায় শিবমন্দির ছিল। চৈতপুর গ্রামে অনেকগুলি বাসুদেব-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। পাকুড়িয়া গ্রামে ও যুগসরা গ্রামে গাফিলেশ্বর ও যোগেশ্বর শিব—অনাদিলিঙ্গ নামে খ্যাত। ফলতঃ ঐ অঞ্চলটি যে খুব প্রাচীন এবং এক সময় বেশ সমৃদ্ধ স্থান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। নিকটবর্ত্তী রাজহাট গ্রামেও দুইটি বাসুদেব-মূর্ত্তি আছে। পালরাজগণের সময়ে নির্ম্মিত বাসুদেব-মূর্ত্তির সঙ্গে, এই মূর্ত্তিগুলির আকার ও ভাবগত যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

এই সিদ্ধলগ্রামী পীতাম্বর শর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ শর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ শর্ম্মার পুত্র শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরামদেব শর্ম্মাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী উপ্যালিকা গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। (১০) পাইকোড়ে যে 'পণ্ডিত শ্রী বিশ্বরূপস্য' নামযুক্ত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহাকে এই রামদেব শর্ম্মার পিতা বলিয়াই মনে হয়। ইহা হইতে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়,—যে সামলাবাদের সহিত সামলবর্ম্মার সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামী ভবদেবভট্ট—বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রসচিব ছিলেন। আবার সেই সিদ্ধলগ্রামী রামদেব শর্ম্মাকে ভোজবর্ম্মার শান্ত্যাগারাধিকারীরূপে দেখিতে পাইতেছি। ভবদেবভট্ট হরিবর্ম্মার পুত্রেরও দণ্ডনীতিবিধাতা ছিলেন। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন—সামল ও হরিবর্ম্মা দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, ইহাই বোধ হয় প্রকৃত সিদ্ধান্ত। (১১) ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব না থাকাই সম্ভব, এবং হরিবর্ম্মার পুত্রের হস্ত হইতেই সামলবর্ম্মা বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাই ভবদেবের পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া, তাঁহার বংশকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন বৈরনির্যাতন-মানসেই তাঁহারই স্বগ্রামবাসী অপর ব্রাহ্মণবংশকে তিনি প্রাধান্য দিয়াছিলেন। এইজন্যই সামলের পুত্র ভোজবর্ম্মা রামদেবকে শান্ত্যাগারাধিকারীরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শাসনগ্রাম দান করিয়াছিলেন। সামলের সময়ে বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের প্রসিদ্ধি আছে। লাভপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে যে ওঝা, মিশ্র প্রভৃতি উপাধিধারী বেদমার্গানুসারী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারা সামলেরই আনীত কিনা তাহাও আলোচনা করিবার বিষয়।(১২) কোনো নূতন মতের প্রচার অথবা কোনো নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা,—আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে।

সিদ্ধল গ্রামের অপর পণ্ডিতগণ

সামলবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মা

(১০) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. X.

(১১) রাজন্যকাণ্ড ২৮৩ পৃষ্ঠা

(১২) লাভপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে এখনো প্রায় চারিশত মৈথিলী ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। (রামপুরহাট-কাহিনীর) নারায়ণপুরের নিকটে ব্রহ্মাণী নদীর পরপারে হরিদাসপুর প্রভৃতি গ্রামেও অনেক মৈথিলী ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইঁহারা কোন্ সময়ে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারেন না। স্থানীয় জনসাধারণও এ সম্বন্ধে কোনো তথ্য অবগত নহে। তবে ইঁহারা যে বহুকাল হইতে এ অঞ্চলে বাস করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

রাঢ়ের বিভিন্নস্থান পরিদর্শনে—স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচনাদি শ্রবণে এবং বাঙ্গালার ঐতিহাসিক-ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনে—মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে,—আমাদের ভবিষ্যত সুবিধার জন্য এই বিবরণে মাত্র তাহাই লিপিবদ্ধ রহিল। যদি কখনো সে দিন আসে—বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির যত্নে যদি কখনো তেমন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়,—তখন এই সমস্ত জটিল ঐতিহাসিক-ঘটনার সঙ্গে বীরভূমের—তথা রাঢ়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ইচ্ছা রহিল। জানি না—দেশমাতৃকা—কবে আমাদের এই আশা পূর্ণ করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

বীরনগর-কাহিনীর পরিশিষ্ট

[১]

শীতলা-ষষ্ঠীর কথা (১)

এক দেশে' সওদাগর থাকেন,' আর তার এক পুত্র থাকে। ছেলের মা নাই, তাই সকাল সকাল তার বিয়ে দিয়ে সওদাগর বৌমাটিকে ঘরে নিয়ে এলেন। বিয়ে যখন হয়, কনে'র বাপ তখন বলে' দিয়েছিলেন 'মেয়েটি আমার টাট্‌কা কোনো জিনিস খেতে পারে না, মেয়ের সব 'বাসি' চাই, এমন কি রোজ 'বাসি' কাপড় ভিন্ন পরে না। গরম কোনো জিনিস খায় না বলে' মেয়ের মা সাধকরে' নাম রেখেছে শীতলা। তা দেখবেন—আপনার ঘরেও যেন মেয়ের এই নিয়মগুলি বজায় থাকে'। বুড়ো সওদাগর উত্তর দিয়েছিলেন—'কি বলবো বলুন—আজ যদি আপনার বেয়ান' বেঁচে থাক্‌তেন,—তা' যাক' আমার সাত নাই পাঁচ নাই, ঐ এক ছেলে, তার এই সোনার চাঁদ বউ।—আর মা'কেই তো আমার ঘরে গিয়ে নিজেই সব দেখে শুনে নিতে হবে। যা' হোক' আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে-সব বিষয়ে কোনো ত্রুটী হবে না'। শ্বশুরঘরে শীতলার ভারি আদর,—খুব লক্ষী-বৌ, সকলেই তার গুণে সন্তুষ্ট।

(১) বীরনগর-কাহিনীতে—পাইকোড়ের প্রসঙ্গে প্রাচীন 'মাঘী ষষ্ঠীর' ব্রতে-র উল্লেখ করিয়াছি। বীরভূম—অঞ্চলে উহা এখন 'শীতলা-ষষ্ঠী' নামে প্রসিদ্ধ। এদিন অরন্ধন-ব্রত পালন করিতে হয়। সেকেলে' ধরণের প্রায় সকল গৃহস্থই আজিও তাহা পালন করেন। তবে আধুনিক বাবুদের বাড়ীতে—কিন্তু তাঁহারাই বা করিবেন কি—ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতির কৃপায় বাসি জিনিস তো তাঁহাদের সহ্য হইবার উপায় নাই।

এই ষষ্ঠীর পূজা-পদ্ধতি এইরূপ,—শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে—উপুড়ভাবে দেওয়ালে ঠেস্‌দেওয়া—বাটনা বাটিবার শিল—হলুদে ছোপানো কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার সময় বাগ্‌দী-বৌ আসিয়া, ভাঙলা সিদুরীলতা এবং ভগলি—দিয়া গিয়াছে সে গুলিও একত্রে ঐ শিলের কাছে সাজানো থাকে,—রাত্রে একথালা ভাতও (সোপকরণ) সাজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিন পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন। খই মুড়ি মুড়কীর নৈবেদ্য দিয়া পরে সেই ভাতের ভোগ নিবেদন করিয়া দেন। পূজা হইয়া গেলে পাড়ার সমস্ত ঝি—বৌরা কোনো ঠাকুরুণ কি কালদিদির কাছে ষষ্ঠীর কথা শুনিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে পায়। কথা শুনিবার সময় হাতে বাঁশপাতা রাখিতে হয়। "ভাত—থালাটি (অবশ্য থালা বাদ-দিয়া) বাগ্‌দী-বধূ আসিয়া লইয়া যায়।

শীতলার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে, ক্রমে জানা-জানি হলো। বাড়ীর চাকর বাকর, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই খুসি,—বুড়ো শ্বশুর তো আহ্লাদে আটখানা। তিনি আত্মীয়-কুটুম্বদের এনে,—বৌমাকে পাঁচমাসে 'পাঁচকলাই', সাতমাসে—'সাতভাজা' শেষে নয়মাসে 'সাধ' দিলেন। বুড়োর শুধুই ঐ একধ্যান—'কখন্ নাতির মুখ দেখ্‌বো। দশমাস-দশদিন পূর্ণ হ'য়ে এলো,—একদিন বুড়ো-সওদাগর ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন—শীতলা সাম্‌নে দিয়ে বেড়িয়ে গেল। কিন্তু যখন ফিরে এলো, তখন তাকে দেখে খুব কাহিল্ বলে' মনে হলো। বুড়ো ভাবতে ভাবতে বাইরে গিয়ে দেখলেন—একটা চামড়ার থলে' কাকে-চিলে ছিঁড়ে টানা-টানি কচ্ছে, তার মধ্যে কতকগুলো তখনিকার প্রসব-হওয়া ছেলের ভিড়,—তারা হাত-পা ছুঁড়ে টোয়া টেঁায়া করে কাঁদছে। সওদাগর ঘরে এসে বৌমাকে জিজ্ঞাসা করে সব বুঝতে পারলে'ন, তখন তাড়াতাড়ি একটা ঝুড়ি নিয়ে ছেলেগুলোকে কুড়িয়ে আন্‌লেন, গুণে দেখা গেল—ছেলে হয়েচে ষাটু'টি। শীতলার কথামত তক্ষুনি ষাট' খানা 'আতুর-ঘর' (সূতিকাগৃহ) তৈরি হলো', ষাটজন 'আগুনী' (সূতিকা ঘরে আগুন রাখে, ধাইএর ফর্মাস মত খাটে) এলো,' ষাটু'জনঃধাই নিযুক্ত হয়ে' গেল। খুব ধুম ধাম করে পাঁচদিনে 'পাঁচুটে', ছয়দিনে 'ষাট" রো', (ষষ্ঠীপূজা) একুশদিনে 'একুশে' হয়েগেলে, ছেলে' পোয়াতি 'আতুর' থেকে বার' হয়ে' তেলহলুদ মেখে স্নান করে' শুদ্ধ হলো। ছ'মাসে অন্নপ্রাশন। শীতলা বল্লে—দই-দুধ-সন্দেশ কোনো কিছু মাটিতে পড়ে'—গেলেই ষাটু ষাটু বলতে হবে। ছেলে যদি বিষম খায়—এমন কি ছেলে কোলে নিলে কারো কাপড়ে যদি * * ক'রে দেয় তা'হলেও বলতে হবে ষাটু ষাটু, আর ষাটু খানা গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন কত্তে হবে। তাই হলো, ভোজ খেয়ে' ষাটুখানা গাঁয়ের লোক 'বাখানে' গেল তারা এমন কখনো দেখে নাই, শোনে নাই। ক্রমে ছেলে-সব 'স্তায়না' হয়ে' এলো, দশ বছরে তাদের 'কাণে সূতো' (কর্ণ-বেধ) হয়ে' গেল।

বুড়োর ভাবনা—ছাই—ক'দিনের সংসার,—কোন্ দিন মরে' যাব', এই সময় নাত'বৌ ঘরে এনে দুদিন আমোদ—আহ্লাদ করা যাক্'। সওদাগর শীতলার কাছে কথা পাড়তে'ই শীতলা বল্লে,—'তোমার নাতিদের বিয়ে—তো যে—সে ঘরে হবেনা বাবা, যেখানে একঘরে ষাটুটি মেয়ে পাব' সেইখানেই ছেলেদের বিয়ে দেবো'। বুড়ো কনে' খুঁজতে বেরুলেন,—কত রাজার দেশ, কত মুলুক তিনি ঘুরে বেড়ালেন,—এক ঘরে ষাটুটি মেয়ে কোথায়ও মিল্‌লো না। একদিন

এমনি ঘূর্ত্তে ঘূর্ত্তে হাররাণ হয়ে' এক নদীর ধারে গাছতলায় তিনি বসে' আছেন—দেখেন—সার' দিয়ে এক বয়সের কতকগুলি ছোট ছোট মেয়ে—তারা নদীতে জল নিতে আসছে। এক এক করে গুণে' যখন তিনি দেখলেন—ঠিক্ বাট্‌টি হচ্চে—তখন তাঁর মনে একটু ভরসা হলো। সওদাগর মেয়েগুলির পরিচয় নিয়ে তাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরিচয়ে জান্‌লেন্—মেয়েগুলি এক ম'ার পেটের না হলেও তারা' এক বাড়ীরই খুড়তুতো জেঠ্‌তুতো বোন', কারুরি এখনো বিয়ে হয় নাই। তিনি খুসী হ'লেন বটে, তবে শীতলার জন্তে একটু বিস্ত থেকে' গেল, যাই হোক' কথা-বার্ত্তা এক রকম আধ্-ঠিক্ ঠাক্ গোছের করে' বুড়ো বাড়ী ফিরে এলেন। এসে শীতলাকে সব কথা বলে' শেষে বল্লেন—'মা তুই না হয় বাট্ ছেলে পেটে ধরেছিস,—এখন এমন্‌টি আর কোথায় পাওয়া যাবে, তবে একইঘর,—আপন খুড়তুতো জেঠ্‌তুতো বোন, তারা,—এখন তোর যদি মত হয় তো আমি এদের ঘরেই পাকা কথা দি"। শীতলা কি আর শ্বশুরের কথার অমান্ত কত্তে পারে, তবে তার সেই কথা কোনো জিনিস পড়ে, গেলে বাট্-বাট্ বলতে হবে। বাট্‌টি ছাদ্‌নাতলা—বাট্‌টি বাসরঘর—সব পৃথক্ পৃথক্ কত্তে হবে। যাই হোক তার মতহলো দেখে বুড়োও একেবারে বিয়ের দিন ঠিক করে' কনে বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিলেন। খুব ঘটাকরে' বিয়ে হয়ে গেল। শীতলার বাট্ ছেলে—বাট্ বৌ নিয়ে—বাট্‌খানা চৌদলে চড়ে' বাড়ী ফিরে এলো। স্বয়ং ষষ্ঠী-দেবী এসে বাট্-মূর্ত্তি ধরে'—শীতলার বেশে—হলুদিয়ে বর-কনে' বরণ-করে' ঘরে তুল্‌লেন। সওদাগর তো দেখে অবাক, ভাবলেন বৌমা আমার 'মনিস্যি' নয়!

বাট্‌বেটা, বাট্‌বৌ, ধন-দৌলত, চাকর—চাকরাণী—সোনার—সংসার। বড় সুখেই শীতলার দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু সুখের সময়েই মানুষের মতিভ্রম ঘটে, শীতলার তাই হলো'। মাঘমাসে—ষষ্ঠীর দিন—আকাশে মেঘলা করে আছে, মন্দ মন্দ হাওয়া দিচ্ছে, শীতলা সব বৌদের ডেকে বল্লে—"দেখ মা আজ কেমন দিন,—আজ গাভারী কাঠের পিঁড়ি হয়, নি-ধুমো কাঠের (কুল-কাঠের) আগুন হয়,—গরম জলে নেয়ে, নতুন কাপড় পরে', পিঁড়িতে বসে আগুন পোহাতে'—পোহাতে' গরম গরম—ঘি—খিচুড়ি, মাগুর-মাছের-ঝোল্, টাট্‌কা সন্দেশ, গরম দুধ এই সব খেতে পাওয়া যায়—তো বেশ হয়"। বৌ রা একসঙ্গে বলে' উঠলো—দেখ দেখি মা—লোকের একছেলে থাক্‌লেই কত-কি আনে, কত কি করে, আর তোমার বাট্ ছেলে থাক্‌তে এই একটা সামান্ত

সাধ মিটবে না—এও কি কথা ! আমরা এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যেমন কথা—তেমনি কাজ—দেখতে দেখতে দণ্ডের মধ্যে সব যোগাড় হয়ে' গেল। শীতলা গরমজলে স্নানকরে', নতুন কাপড় পরে' পিঁড়িতে বসে' আগুন পোহাতে পোহাতে' গরম গরম ঘি-খিচুরী—পাঁচ ভাল-মন্দ খেয়ে খুব খুসী হলো। সেদিন সারা দিনটা আমোদেই কেটে গেল। দিনের শেষে রাত' এলো, সবাই আপন আপন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো', কিন্তু পরের দিন প্রাতঃকালে আর কেউ উঠলো না। শীতলা দেখলে—বিছানায় মরা স্বামী পড়ে, সাত ছেলে—সাত-বৌ ঘরে ঘরে সব মরে' আছে, বাড়ীর দাস-দাসী কুকুর-বিড়াল একটি প্রাণীও বেঁচে নাই, বেঁচে আছে কেবল বুড়ো সওদাগর আর সে—নিজে। তখন শীতলার চেতনা হলো,—সে সব বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে মাথাখুঁড়ে হায় হায় করে' ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। খানিক পারে ভেবে-চিন্তে শ্বশুরকে বল্লে 'বাবা তুমি পাহারা দিয়ে থাক। যতদিন আমি না ফিরি, যে—যেখানে যেমন—ভাবে আছে, যেন ঠিক তেমনিটিই থাকে, আমি এখন যে দিকে দু-চোখ' যায় সেই দিকেই চল্লুম। শীতলা চ'লে' গেল, —যেতে যেতে নানান্ দেশ, নানান্ সহর, নানান্ গাঁ পার' হয়ে সে এক বনে গিয়ে উপস্থিত হলো'। গহন বন—সেখানে পাতা পড়লে, 'কুলো' হয়, কাঠী পড়লে ঢেঁকি হয়, 'জন-মনিষ্যির গতাগম্যি' নাই। শীতলা কিন্তু যায়,—খানিক দূরে গিয়ে দেখলে, বিড়ালের উপর বসে' একটি মেয়ে—হাতভরা শাঁখা—সিঁথিজোড়া সিন্দুর—মচ্-মচ্ করে পান চিবুচ্চে, ঘন-ঘন পিক্ ফেলছে আর ঘ্যানর ঘ্যানর করে' চড়কা কাটছে। —দেখে বল্লে ও-মা-গো—কি তোমার আক্কেল মা, কাল' গিয়েছে ষষ্ঠী, আর আজ ভোর না হতেই তুমি কি না—পান চিবুচ্ছো, পিক্ ফেলছো, আর চরকা কাটছো ! মেয়েটি বল্লে তোমার এত খোঁজে কাজ কি গো ? তুমি হচ্ছো সাত বেটার মা, তুমি গরম জলে স্নান কোর্ব্বে নিধূমো-কাঠের আগুন পোহাবে, গরম গরম ঘি-খিচুড়ী খাবে, পরের কথায় তোমার দরকার কি বাছা ? তাই শুনে শীতলা তখন বল্লে,—"মা আমি যে খেলুম' কোথে তুমি কি করে' জানলে' বলে—তবে তুমিই মা ষষ্ঠী', এই বলে' কেঁদে তার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রলে'। কান্না দেখে মা ষষ্ঠীর দয়া হলো'! তিনি একটা পচা মড়া—সর্ব্বাঙ্গে পোকা কিল্-বিল্ করছে গন্ধে ভূত পালায়,—সেইটে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এই ভাঁড় নে, আর এই দই নে, দইটা মড়ার গায়ে ঢেলে দিয়ে,—তাই আবার জিভে করে' তুলে এই ভাঁড়টা ভরে' বাড়ী ফিরে যা। এই দই—যার উপর ছিটিয়ে দিবি, সেই বেঁচে-

উঠবে"। ঘরে ছেলে মরে পড়ে' আছে,—মায়ের প্রাণ,—তার কি আর ভা'ববার সময় আছে, সে সেই মড়ার উপর দই ঢেলে জিভ্ দিয়ে তুলে ভাঁড় ভর্ত্তি করে'। তখন মা-ষষ্ঠী তাকে বল্লেন "মা এমন কাজ আর করিস্ না। তুই আমার দাসী, আমার পূজা-প্রচারের জন্যেই তোর মর্ত্তলোকে আসা, তা যেমন কাজ করে'-ছিলি, তেমনি পরীক্ষে হয়ে, গেল, চেয়ে দেখ মড়া-টড়া কোথাও কিছু নাই, আর ও ভাঁড়ে যা নিয়েছিস্ সব অমৃত! এখন যা—বাড়ী ফিরে—যা, তোর শশুর খুব ভাব'ছেন"। শীতলা মা-ষষ্ঠীকে প্রণাম করে' ঘরে ফিরে এসে—সেই দই ছিটিয়ে দেবা মাত্র ছেলে-পুলে ঝি-চাকর সব বেঁচে উঠ্‌লো। বেলা হয়েছে দেখে—বৌগুলি তো লাজে মুখ দেখাতে পারে না। শাশুড়ীর উপর অভিমান করে' বলতে' লাগলো 'এত বেলা হয়েচে মা,—তবু আমাদের কেউ ডাকে নাই' শীতলা বল্লে' "কাল' যে আমি ছাই খেয়ে ছিলুম' মা,—তাই তোমাদের কাল-ঘুম এসেছিল"। বুড়ো সওদাগর কাণ্ড দেখে তো অবাক্। নাতীদের বিয়ের দিনের মত আজ আবার তাঁর মনে হলো—"বৌমা আমার 'মনিষ্যি' নয়"। শীতলা স্বামী-পুত্র নিয়ে শশুরের সেবা করে' সুখে ঘর-কর্ন্না কর্ত্তে লাগলো। সেই অবধি শীতলার নামে এই ষষ্ঠীর নাম—'শীতলা ষষ্ঠী'। একথা যে বলে—যে শোনে—সে হারিয়ে গেলে কুড়িয়ে পায়, মরে' গেলে ফিরে পায়, স্বামী,—বেটা,—বউ নিয়ে সুখে ঘর করে।

পরিশিষ্ট

[২]

কলহপুর-কাহিনী

উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের 'দাস' বংশের যে শাখা বীরভূমে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে 'দাস-কলগ্রামের' দাসগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ-বৈষ্ণব-পদকর্তা—জ্ঞানদাস এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) খৃষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীর মধ্য ভাগে—এই বংশীয় নীলাম্বর দাস ঠাকুরের সন্তান—কিষণদাস রায় চৌধুরী প্রভৃতি—কুতবপুর-পরগণার জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া 'রাজসাহী' পরগণার জমিদারী স্বত্ব বন্দোবস্ত লইয়া কলহপুরে আসিয়া বাস করেন। বাঁশ-নদীর (গঙ্গার একটি উপনদী) তীরবর্ত্তী এই স্থান তখন—বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রায়-চৌধুরী মহাশয়—বহু যত্নে স্থানটিকে বাসোপযোগী করিয়া এই স্থানে আপনার বাসভবন প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ বলেন "এইস্থানে 'ওড়ম্বর' নামে একটি প্রাচীন পল্লী অবস্থিত ছিল"। আমাদের অনুমান হয়—উত্তর-কালে (১৫৮২ খৃঃ অঃ) মোগল-সম্রাট আকবরের রাজস্ব-সচিব রাজা তোড়রমল্ল যখন সমগ্র বঙ্গরাজ্য ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন,—তখন এই ওড়ম্বরকে লইয়াই—বঙ্গ-দ্বার (তেলিয়াগড়ি) হইতে মুর্শিদাবাদের চুনাখালী পরগণা পর্য্যন্ত ভূমিভাগকে 'সরকার ওড়ম্বর' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। যাহাহউক কিষণদাসের বাসস্থাপনের পর ক্রমে নানাস্থান হইতে বহুলোক আসিয়া কলহপুরে বাস করে। এক সময় কলহপুরে প্রায় সহস্রাধিক-ঘর লোকের বাস ছিল। কলগ্রামের

(১) জ্ঞানদাসের জন্মভূমি দাস-কলগ্রামের নিকটবর্ত্তী কাঁদড়াগ্রামে। তাঁহার অপর এক নাম ছিল 'মঙ্গলঠাকুর'। তাহা হইতেই দাসঠাকুর উপাধির প্রবর্ত্তন হয়। তিনি বিবাহ না করিলেও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ কেহ কেহ তাঁহারই বংশীয় বুঝিয়া 'দাস ঠাকুর' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। নীলাম্বর দাস ঠাকুর তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। বীরভূম-বিবরণ পর-খণ্ডে জ্ঞানদাসের পরিচয় ও দাস-বংশের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

অনুকরণে দাসমহাশয় ইহার নাম রাখিয়াছিলেন কলপুর। নীলাম্বর দাস ঠাকুরের নামে একটি পল্লী নীলাম্বরপুর নামেও অভিহিত হইত। কলপুর আটটি পল্লীতে বিভক্ত ছিল—১। কলপুর, ২। শান্তি-কলপুর, ৩। বিপ্র-কলপুর, ৪। নীলাম্বরপুর, ৫। অমৃতপুর, ৬। মহেশপুর, ৭। নরোত্তম-পুর, ৮। ওড়ম্বরপুর। স্থানীয় অধিবাসীগণের কথায় একটু 'হ' কারের টান্ থাকায়—কলপুর ক্রমে কহলপুর হইতে কলহপুরে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন সনন্দ ও কাগজ-পত্রাদিতে ইহার কলপুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিষণদাসের কলপুর প্রতিষ্ঠার যে সময় আমরা প্রাপ্ত হই—তখন সুপ্রসিদ্ধ শের-শাহ্—বাঙ্গালার অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দাসমহাশয় সম্ভবতঃ শের-শাহের নিকট হইতেই রাজসাহী পরগণার বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) কিন্তু সে সময় রাজসাহীর পরিমাণ ও রাজস্ব কত ছিল, জানিতে পারা যায় না। নাটোরের রাজা রামজীবন যখন রাজ-সাহীর বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, তখন ইহার তুল্য সুবিস্তৃত জমিদারী সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীন রাজসাহীর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র থাকাই সম্ভব, কারণ রামজীবনকে বন্দোবস্তের—সময় উদয়নারায়ণের রাজসাহীর সঙ্গে সীতারামের নলদী এবং রাণী সর্ব্বাণীর ভাতুরিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (৩) তাহা হইলেও দাসগণ যে সেকালের প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিষণদাস, বিষণদাস, ত্রৈলোক্যদাস ও ত্রিপুরাদাস রাজসাহীর আদিম-জমিদার বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কিষণদাস দশআনা-অংশের অধিকারী ছিলেন। কিছুদিন পরে অপর তিনজনের ছয়আনা অংশ সিংহ-চৌধুরী উপাধিধারী জমিদারগণের হস্তগত হয়। সিংহগণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—জমিদারীর সঙ্গে-সঙ্গে দস্যুবৃত্তিও—ইহাদের অপর একটি পেশা ছিল। রায়চৌধুরীগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইহারা কলহপুরে এক সিংহবাহিনী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় শতবর্ষ গত হইল—সিংহবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই বংশের শেষ উত্তরা-ধিকারিণী এক বৃদ্ধা—আপনার অবশিষ্ট সম্পত্তি আদি হিলোরা-নিবাসী কোনো

(২) শের-শাহ্ তাঁহার রাজত্ব বহু পরগণায় বিভক্ত করিয়া রাজস্ব-আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে সেই পদ্ধতি রাজা তোডরমল্ল কর্ত্তৃক সংশোধিত-আকারে পরিগৃহীত হইয়াছিল। বীরভূমের পশ্চিম-প্রান্তে 'শের গড়' পরগণা শের-শাহের স্মৃতি বহন করিতেছে।

(৩) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

আত্মীয়কে দিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বেই অপরা এক বিধবা সিংহবাহিনী-মূর্ত্তি-সহ—উক্ত হিলোরা গ্রামে আপন ভ্রাতুস্পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলহপুরে দেবীর—প্রাচীন মন্দির এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুর্শিদকুলী খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব,—সেই সময় কিষণের বংশধর কিঙ্কর রায়-চৌধুরী—নিমন্ত্রিত হইয়া মুর্শিদাবাদ দরবারে উপস্থিত হন নাই। এই অপরাধে নবাব—তাঁহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া রাজসাহী-জমীদারী লালা উদয়নারায়ণ রায়কে অর্পণ করেন। কিঙ্করের দরবারে অনুপস্থিতিই উদয়নারায়ণের রাজসাহী প্রাপ্তির অন্যতম কারণ। (৪) কিঙ্কর রায়-চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-চৌধুরীগণও রাজসাহী জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সিংহবংশে তখন দুইটি বিধবা ও এক 'নাবালক' মাত্র বর্ত্তমান ছিলেন। বিধবাগণ সেই নাবালক-সন্তানটিকে লইয়া বহুকষ্টে নবাব-পত্নীর নিকট গিয়া উপস্থিত হন। নাবালককে দেখিয়া নবাব-পত্নীর দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। তাঁহার অনুরোধে নবাব—শিশুকে 'পেড়া ও মণ্ডা' খাইবার জন্য রাজসাহী-পরগণার অন্তর্গত 'পেড়া ও মহাদেব নগর' মৌজা পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি সিংহবংশ এই দুইটি মৌজা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। শেষে বংশধরের অভাবে এই সম্পত্তি তাঁহাদের হিলোরার একজন আত্মীয় পাইয়াছিলেন। সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপে কিঙ্করের পুত্র বাণেশ্বর রায়-চৌধুরীও নবাবের নিকট গিয়া দরবার করিয়াছিলেন, ফলে তিনি—চারিটি পরগণার 'কানুনগোই'-এর কাজ প্রাপ্ত হন। বাণেশ্বরের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া উদয়নারায়ণও তাঁহাকে কিছু নিষ্কর-ভূমি দান করিয়াছিলেন। বাণেশ্বরের পুত্র

(৪) 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের' উপর নির্ভর করিয়া আমরা কমকপুর-কাহিনীতে (৩২ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছি লালা-উপাধিধারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ অনেকদিন হইতে রাজসাহী জমিদারী ভোগ করিতেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ঠিক নহে। রাজসাহীর আদি জমিদার ছিলেন—উক্ত রায় চৌধুরী উপাধিধারী কায়স্থগণ। তবে এমন হইতে পারে যে, উদয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজসাহীর কোনো ক্ষুদ্রতম অংশের জমিদার ছিলেন, পরে উদয়নারায়ণ নবাবের নিকট হইতে সমস্ত রাজসাহী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত অথবা কেরাণী প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ 'লালা' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। উদয়নারায়ণের লালা উপাধি দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে জমিদার অপেক্ষা পণ্ডিত বলিয়াই এই বংশের প্রসিদ্ধি ছিল।

শিবরামের—নামীয় একখণ্ড-তায়দাদ্ হইতে—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে রাজসাহী পরগণার জমিদার ছিলেন, এবং বাণেশ্বর—উদয়নারায়ণের নিকট হইতে নিষ্কর-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহা জানিতে পারা যায়। বানেশ্বরের বংশধরগণ একাল পর্য্যন্ত উদয়নারায়ণ-প্রদত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের বাসভবনের চতুর্দ্দিকে এখনো প্রাচীন-পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বংশে এখন কিষণদাস হইতে একাদশ-অধস্তন পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। কলগ্রাম হইতে আনীত বিগ্রহ আজিও ইহাঁদের বাড়ীতে পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন। কলহপুরে—প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়—উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেবরামের অপর নাম ছিল ব্রজরায়। (৫) শুনিতে পাওয়া যায়—ব্রজরায় একবার কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইলে কলহপুরের এক বৈদ্য তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উদয়নারায়ণ বৈদ্যকে যৎসামান্য নিষ্কর তালুক দান করিয়া—ব্রজরায়ের নামে এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা (প্রায় দেড়শত বিঘা পরিমাণ হইবে) প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাও ঐ তালুকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় দীর্ঘিকা-তীরে দক্ষিণা-কালিকা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তিনি দেবতার নিত্য-পূজাদিরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই দীঘি এখন 'ব্যাজরায়ের দীঘি, নামে বিখ্যাত। কলহপুরে উদয়নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺মদন মোহন

(৫) রামপুরহাট—কাহিনীতে উল্লিখিত নারায়ণপুরের উত্তরে বলবন্তনগর (বর্ত্তমান নাম জয়পুর) নামে একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে। নারায়ণপুর ও বলবন্তনগরের মধ্য-ব্যবধান-পথে ব্রহ্মাণী-নদী প্রবাহিতা হইতেছে। বলবন্তনগরের দুর্গ রাজা উদয়নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান জয়পুর হইতে হরিদাসপুর পর্য্যন্ত প্রায় এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান। বলবন্তনগরে রাণী-সায়র নামে একটি দীঘি আছে. পরিখা-প্রাকারের চিহ্ন আছে। বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। জয়পুর ও হরিদাসপুরের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি স্থানের নাম—উদাসীডাঙ্গা, উদয়পুর, রাঙ্গারচিপ, বীরবাগান প্রভৃতি। শুনিতে পাওয়া যায়, রাঙ্গারচিপে কাছারী বাড়ী ছিল। উদয়পুরে এখন কয়েকঘর মুসলমানের বাস। বীরবাগানে সেনানিবাস ছিল এইরূপই প্রবাদ। হরিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম রায় মহাশয়ের বাড়ীতে যে সমস্ত কাগজ-পত্র আছে, তন্মধ্যে সন ১২০৮ সালের দুইখানি তায়দাদ্ হইতে রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের নাম পাওয়া যায়। সন ১০৮৮ সালের একখানি সনন্দে সাহেবরামের নাম পাওয়া যায়। জয়পুরের কামাখ্যা-দেবী (মন্দিরে এখন কোনো দেবতা নাই) উদয়নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ আছে। হরিদাসপুরে উদয়-নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়-বিগ্রহ আজিও পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন। দেবতার নামে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। তাহা উদয়নারায়ণই দিয়া গিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে উদয়নারায়ণের সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

বিগ্রহ আজিও পূজা-প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে—নসীপুর রাজের তত্ত্বাবধানে এই দেবসেবা এখনো সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে।

কলহপুরের উত্তরপার্শ্বে "ভানুমতীর সরাণ" নামে একটি লুপ্তাবশেষ সরণির চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে—উজানীর (মঙ্গলকোটের) রাজা বিক্রমাদিত্যের পত্নী ভানুমতী এই পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি নাকি ভোজবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন এবং এখানে আসিয়া সেই বিদ্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন। উজানীর সঙ্গে এ-স্থানের কি সম্বন্ধ ছিল জানিবার উপায় নাই। ওড়ম্বর নামটি প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হয়। ইহার সহিত উজানীর কোনো সংস্রব ছিল কিনা জানা যায় না। ওড়ব—মানে 'পঞ্চস্বর বিশিষ্ট রাগ'। আবার উড়ুম্বর-অর্থে 'নক্ষত্র আচ্ছাদনকারী' হয়, ইহার ভিতরে ভানুমতীর ভোজ-বাজীর কোনো রহস্য আছে কি-না তাই-বা কে জানে! উড়ুম্বর বোধ হয় ডুমুরের গাছকেও বুঝায়। বাঁশ নদীর তীরে কি ডুমুরের বন ছিল? কিন্তু তাহা হইলেও খব সংস্কৃত-জানা লোক ভিন্ন অন্যের দ্বারা এই নামকরণ সম্ভবপর নহে। দাস-ঠাকুরগণ তো সংস্কৃত জানিতেন। তাঁহাদের দ্বারা এ-নামের সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নহে। তবে বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদের আমলে—বাঙ্গালা-ভাষার সেই নূতন শ্রীবৃদ্ধির সময়ে—এমন 'দাঁতভাঙ্গা' নামের উদ্ভব—একটু সন্দেহ থাকিয়া যায়!

মুরারই ষ্টেশন হইতে প্রায় উত্তর-পূর্ব্বে—কিছু দূরে কলহপুর গ্রাম। গ্রামের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কথা এখন প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়,—আশ্বিনে-আনন্দময়ীর-আগমনে—কলহপুরে বাইশখানি প্রতিমার পূজা হইত! আজি আর সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই! গ্রামে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, তিলি, মালী, নাপিত, তন্তুবায় প্রভৃতি বহু জাতির বাস ছিল। বর্ত্তমানে—বৈদ্য, নাপিত, তন্তুবায়, গোয়ালা ও ধোপা-বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। গ্রামের বর্ত্তমান পত্তনীদার শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এই গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺গৌরসুন্দর ঘোষ ও ৺দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় নসীপুর-রাজের নিকট হইতে এই পত্তনী স্বত্ব গ্রহণ করিয়া কলহপুরে আসিয়া বাস করেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-দয়ালু ও পরোপকারী বলিয়া ইঁহাদের প্রসিদ্ধি ছিল। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়—কলহপুরের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি।

গ্রামের আধুনিক অধিবাসীগণের মধ্যে স্বর্গীয় কবিরঞ্জন গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ‘কবিতাবলী’, ‘কবিতারত্নাবলী’, "গীতাবলী", "বিষাদ-কাহিনী", "মণিহরণ-উপাখ্যান", "জীমূতবাহন-উপাখ্যান", ও "সত্যনারায়ণ-উপাখ্যান", প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "ত্রিশূল", "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক", প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। ধর্ম্মপরায়ণ আচারনিষ্ঠ, সুবক্তা এবং পণ্ডিত বলিয়া সমাজে কবিরঞ্জনের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

সন ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে—রাজসাহীজেলার অন্তর্গত যোগিদপুর গ্রামে গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়—মাতার নাম ৺সারদাসুন্দরী দেবী। নিকটবর্ত্তী ‘বাঘা’ গ্রামের মধ্যইংরাজী-বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া,—তিনি পুঠিয়ার উচ্চইংরাজী-বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে অর্থাভাব বশতঃ বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রামসুন্দরের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। পৈত্রিক জোত-জমার যৎসামান্য আয়—এবং শিষ্যগণের প্রদত্ত প্রণামীর অর্থে কোনোরূপে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত মাত্র। এতদ্ভিন্ন তিনি কবিরাজী-ব্যবসায়েও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের আশায় গোবিন্দচন্দ্র কবিরাজী-শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে পিতার নিকট তিনি—মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, হরিনামামৃত-ব্যাকরণ, অমরকোষ, নিদান ও নাড়ীচক্র প্রভৃতি পাঠ করেন।

গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম রামতারণ এবং ভগিনীর নাম গিরিবালা। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অপর চারিজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। কলহপুর গ্রামে গিরিবালার বিবাহ হইয়াছিল। এই গিরিবালার উদ্যোগেই গোবিন্দচন্দ্র কলহপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। মাতামহী রুক্মিণীসুন্দরী দেবী নিজ ব্যয়ে—গোবিন্দচন্দ্রের কলহপুরের বাসভবন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। বীরভূম-জেলার আমজোল-গ্রামের ৺দুর্গাকান্ত মজুমদারের প্রথমা কন্যা নীরদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। সন ১২৯৯ সালে পিতৃবিয়োগের পর তিনি কলহপুরে আসিয়া বাস করেন। কবিরাজী-চিকিৎসায় তাঁহার সুনাম ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় রাজসাহীতে ওকালতি করিতেছেন। গত সন ১৩২৪ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ বেলা,

প্রায় সাড়ে-চারি ঘটিকায় সময় (রামতারণের বাসায়) গোবিন্দচন্দ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তাঁহার উদ্যোগে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকল্পে স্থানে স্থানে—কয়েকটি হরি-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (৬) গোবিন্দচন্দ্র একজন দক্ষ মৃদঙ্গ-বাদক ছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তনগান এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি নিজের চেষ্টাতেই সংস্কৃত বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই তিনটি ভাষাতেই অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন।

(৬) বীরভূমের কোগ্রাম, আড়াইল, আমড্ডোল, কলহপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হরিসভা বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে কোগ্রামের হরিসভাই উল্লেখ-যোগ্য। এই সভা হইতে মাঝে-মাঝে কাঙ্গালী-ভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই গ্রামখানি নলহাটী-থানার অন্তর্গত। নলহাটী-আজিমগঞ্জ-শাখা-রেলপথে—তকীপুর ষ্টেশন হইতে উত্তরে প্রায় একমাইল দূর।

বঙ্গীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে ফতেচাঁদ মজুমদার নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাস ছিল। তিনি মুর্শিদাবাদের অধীনে ধাওয়াপরগণার নায়েব ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়—নবাবের সহিত শেঠবংশের মনোমালিন্য ঘটিলে তিনিই মধ্যস্থ হইয়া সে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী তাঁহাকে নিজ দরবারে নিযুক্ত করেন। ইহা বোধহয়—নবাব সরফরাজ খাঁর সময়ের কথা। মজুমদার মহাশয়ের দৌহিত্রবংশীয় শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোগ্রামের হরিসভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রলোকগণের যত্নে সভার বার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সভার মোহান্তরূপে একজন প্রাচীন-বৈষ্ণব নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইঁহার বয়স ১০৬ বৎসর, তথাপি ইনি এখনো বেশ কর্ম্মক্ষম আছেন। কোগ্রামের প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয়ের দৌহিত্র-বংশীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ইঁহার ছয়টি পুত্র সকলেই উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং নানা স্থানে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইঁহার ৩য়—পুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতার বার্ড কোম্পানীর মাইনীং ইঞ্জিনিয়ার, ইহার বেতন মাসিক ৭০০৲ সাত শত টাকা। ভরসা করি এই সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা জন্মভূমির দুঃখ দূর হইবে।

পরিশিষ্ট

[৩]

জাজীগ্রাম

• •

বীরনগর,—ভাটরা, প্রভৃতি স্থান যেমন বীরভূমের উত্তর-প্রান্তের শেষ সীমায় অবস্থিত, জাজীগ্রামও তেমনি বীরভূমের উত্তর-পূর্ব্বের শেষ সীমান্তে অবস্থিত; ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। প্রবাদ আছে—"সিং, শিমলা, কর, তিনে জাজী নগর"। সিং—সিংহ-উপাধিধারী কায়স্থ। শিমলা,—শিমলালগাঞী-ব্রাহ্মণ, কর,—বৈদ্য। ইহারাই গ্রামের আদিম বাসিন্দা, এখনো গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়স্থের বাস।

গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটির চাল-চিত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তথাপি তাহার উচ্চতা এখনো প্রায় দুইহস্ত পরিমিত হইবে। গ্রামের দক্ষিণে পঞ্চ-দুর্গাতলা, সিদ্ধস্থান। সম্প্রতি স্থানটিতে একটি ভগ্ন-মন্দির পড়িয়া আছে। কোনো দেবমূর্ত্তি নাই। গ্রামের পূর্ব্বে কালীনগর (টেঁটুনা)। তথায় কর-চরণাদি বিহীনা এক শিলাময়ী কালী-মূর্ত্তি আছেন। পশ্চিমে দ্বারবাসিনী দেবী ও দ্বারেশ্বর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। উত্তরে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিতা বৃদ্ধমাতা কালী এবং শ্মশাননাথ শিব রহিয়াছেন। বৃদ্ধমাতার মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি গঠন করিয়া কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় পূজা হয়। গ্রামে পূর্ব্বে অসংখ্য কালীমূর্ত্তির পূজা হইত। এখনো জাজীগ্রামের কালীপূজা এতদঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু। এত কালী-প্রতিমার পূজা বীরভূমের আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। ইহা হইতে অনুমিত হয় এই গ্রামের আদি অধিবাসীগণ সকলেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। এই স্থান পূর্ব্বে তান্ত্রিকগণের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

জাজীগ্রামের নিকটেই হিলোরা নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হইলেও একটি বিশেষত্বের জন্য ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। হিলোরার শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ-মূর্ত্তি এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এত বড় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ অপর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

দেখিলেই মনে হয় যেন সত্যই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। বিগ্রহের বামে শ্রীমতি প্রতিষ্ঠিত নাই। বিগ্রহের হাতে বাঁশী নাই, সে ত্রিভঙ্গিম বঙ্কিম-ঠাম নাই। শ্রীমূর্ত্তি পদ্মাসনের উপরে সোজাভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্যামসুন্দরের কোনোরূপ শস্যজাত দ্রব্যের ভোগ হয় না। মোহান্তও শস্যজাত দ্রব্য আহার করিতে পান না। বিগ্রহের ফল-মূলাদির ভোগ হয়, মোহান্তও তাহাই প্রসাদ পাইয়া থাকেন। শ্যামসুন্দরের প্রভাব-প্রতিপত্তি বড় কম নহে। তিনি বার্ষিকী আদায়ের জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। মুরারই অঞ্চলে কোনো বিশেষ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান হইলে অগ্রে শ্যামসুন্দরের প্রণামীর বন্দোবস্ত করিতে হয়। নূতন মেলার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, শ্যামসুন্দরকে লইয়া গেলে, মেলায় লোক সংগ্রহের জন্য আর চিন্তা করিতে হয়না। কিন্তু শ্যামসুন্দরের শুভাগমনও বড় সহজে ঘটে না। তাঁহার ভোগরাগ, শ্রীহরিনাম বা লীলাদি কীর্ত্তনের ব্যবস্থা তো আছেই, এতদ্ভিন্ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রায় দুই তিন শতেরও অধিক মুদ্রা প্রণামী দিতে হয়! শ্যামসুন্দরের পাটের দেবোত্তর সম্পত্তির এবং শিষ্যাদির প্রদত্ত প্রণামীর আয়ও বড় মন্দ নহে। শুনিতে পাওয়া যায় "শ্যামসুন্দর সন্ন্যাসীর আনীত ঠাকুর"! "সর্ব্বেশ্বর, মদন-মোহন" প্রভৃতি অপর তিনটি বিগ্রহ-মূর্ত্তি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। উপরোক্ত চারিটি বিগ্রহই একজন সন্ন্যাসীর আনীত। সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এইরূপে বিগ্রহ আনয়ন ব্যাপারটি বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বীরভূমের বহু স্থানে আমরা এইরূপ সন্ন্যাসী-দত্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সন্ন্যাসী আনীত বাণলিঙ্গ-শিব, বা কোনো কোনো শক্তি-মূর্ত্তিও গৃহস্থের বাড়ীতে কচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণব-সাধু-প্রদত্ত প্রাগুক্ত শ্যামসুন্দরাদি বিগ্রহ-মূর্ত্তির সংখ্যাই এতদঞ্চলে অধিক। বীরভূমে ভাণ্ডীরবনের গোপাল, মঙ্গলডিহির শ্যামচাঁদ ও খয়রা শোলের বলরাম, জামনা গ্রামের ধ্রুববাটীতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহ-মূর্ত্তিগুলি সন্ন্যাসীর আনীত। প্রবাদ-প্রসঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়, মঙ্গলডিহি—ভাণ্ডীর বন ও জামনা—এই তিন স্থানেই ধ্রুব নামক গোস্বামী বিগ্রহ-মূর্ত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয় উক্ত তিন স্থানের ধ্রুব গোস্বামী তিনজন পৃথক্ ব্যক্তি নহেন, এক ধ্রুব-গোস্বামীই পৃথক্ পৃথক্ সময়ে উক্ত পৃথক্ তিনটি স্থানে দেবমূর্ত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এই যে ঠাকুর-আনা সন্ন্যাসীদল, ইহাঁরা যে খেয়ালের বশে, অথবা নিজেরা বিগ্রহ-সেবায় অপারগ হইয়া, কিম্বা কিছু লাভের প্রত্যাশায় এইরূপ করিয়া

ঠাকুর দান করিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে। ইঁহাদের রীতিমত একটি সম্প্রদায় ছিল, এবং কোনো একটি প্রধান স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, বেশ প্রণালীবদ্ধ ভাবেই ইঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই আমাদের অনুমান। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বহুল-প্রচার এবং দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা, ইঁহাদের এই কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহুদিন হইতে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় এদেশে পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। বিশেষ, সেকালের লোক অতিথি পাইলে কৃতার্থ হইতেন। আতিথেয়তা তখনকার দিনে একটি নিত্যানুষ্ঠেয়,—অবশ্য-করণীয় পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং,—দেব-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্ত সকল যখন লোকের সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল, সেই অতীত দিনের প্রাচীনগণ, যে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত বিগ্রহ—আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন, ইহা না বলিলেও চলে। সন্ন্যাসীগণও মানুষ চিনিতেন। ভূয়োদর্শনের সতর্ক-নির্ব্বাচনে, তাঁহারা—যাঁহাকে উপযুক্ত-পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তিনিই এইরূপ বিগ্রহ-সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেন। যোগ্যতর ক্ষেত্র-নির্ব্বাচনেও যে ইঁহারা যথেষ্ট সতর্ক থাকিতেন, জাজীগ্রামের পার্শ্বেই, হিলোরায় শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ স্থাপনই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে দেব-সেবার দুরবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সন্ন্যাসীগণ বোধ হয় জানিতেন না, যে বাঙ্গালায় এমন এক দুর্দ্দিন আসিবে, যে দিন বাঙ্গালী-হিন্দু-গৃহস্থগণ,—বিগ্রহকে গলগ্রহ জ্ঞান করিয়া নদীগর্ভে চির-বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না, কেহ কেহ কোনো 'আখড়ায়' যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া আপনার কুল-দেবতাকে, বংশের ভাব-ধারার—আধার, স্মরণাতীত-কালের সযত্ন-রক্ষিত রত্ন-মঞ্জুষাকে—চির-নির্ব্বাসিত করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। জানিলে সেই সমাজ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনহিত-ব্রত-ধারী সজ্জনগণ কি এমনি করিয়াই মহাপ্রস্থান করিতেন, না এমনি করিয়াই সমাজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া লুক্কায়িত থাকিতে পারিতেন? জানি না তেমন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় আর আছেন কি না। এদিকে সমাজের লোকেও আজকাল বেশ চতুর চালাক হইয়াছে,—বহু কুসংস্কারকেই বর্জ্জন করিয়াছে, সুতরাং থাকিলেও সেকেলে সম্প্রদায়ের দ্বারা যে আজকাল বিশেষ কিছু লাভ হইত, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হিলোরা গ্রামের উত্তরে জুড়ান বিবি ও তুর্কাণ সহিদের সমাধি আছে। এই সহিদ পীর ও বিবি সাহেবার, পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, কেহ বলিতে পারে না। কতদিন পূর্ব্বে ইঁহারা এখানে আসিয়া ছিলেন, তাহাও কেহ

জানে না। সমাধির (উত্তর-প্রান্তে) প্রাচীর-গাত্রে একটি আরবী শিলালিপির অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমান আছে। অপরার্দ্ধের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি ও কয়েকটি সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট, প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বারদেশের অংশবিশেষ, গ্রামের অতীত হিন্দু-সমৃদ্ধির পরিচয় দান করিতেছে।

জাজী-গ্রামের প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে কুলেড়া-গ্রাম। এই গ্রামে স্বনাম-প্রসিদ্ধ 'কেদার-রায়ের ভিটা' আছে। কুলেড়ায় রায় মহাশয়ের খনিত এক প্রকাণ্ড দীঘি আজও কেদার রায়ের দীঘিনামে বিখ্যাত। বীরভূমে একটি গাথা প্রচলিত আছে, রেতের' ঠাকুর কেদার রায়,—রেতে' আসে রেতে' যায়। বীরভূম মহম্মদাবাদ পরগণার আঙ্গারগড়ে' গ্রাম হইতে একটি রাস্তা (মুর্শিদাবাদ) গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার লুপ্তাবশেষ আজিও কেদার রায়ের সরাণ' নামে পরিচিত। প্রবাদ প্রচলিত আছে—আঙ্গারগড়ে গ্রামে, তাঁহার বাস ছিল। মাতৃদেবীর গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য তিনি এই সরণিটি প্রস্তুত করাইয়া দেন। রায় মহাশয় মুর্শিদাবাদ-নবাব-দরবারে কার্য্য করিতেন। দিবা-ভাগে কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, এইজন্য রাত্রিতে অশ্বারোহণে আসিয়া তিনি রাস্তার কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। রাত্রেই মজুর-বিদায় প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিয়া প্রভাতের পূর্ব্বেই রায় মহাশয় পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যাইতেন। সেই জন্যই জন-সাধারণে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল, "রেতে'র ঠাকুর কেদার রায়"। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। (বীরভূম' মহম্মদাবাদ পরগণার অধীন আঙ্গারগড়ে গ্রামেই তাঁহার বাস ছিল। কারণ তাঁহার নির্ম্মিত রাস্তাটি আঙ্গার-গড়ে' হইতেই বাহির হইয়াছে। আঙ্গারগড়েতে তাঁহার বাসভূমির ধ্বংসস্তূপ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের অনুমান হয়, শেষ-জীবনে অথবা অন্য কোনো কারণে হয়তো আঙ্গারগড়ে, ত্যাগ করিয়া রায় মহাশয় কুলেরায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। অথবা সেখানেও তাঁহার একটা বাড়ী ছিল। রায় মহাশয়ের ইহার অধিক পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় না।

১। ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়   ২। শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৩। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়   ৪। ৺গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

[৪]

কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

তারাপুর-কাহিনীতে দাঁড়কার উল্লেখ করিয়াছি। (১) সন ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাঁড়কায় আসিয়া তথাকার মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। কিছু দিনের জন্য তিনি মালিয়াড়ার রাজপুত্রের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া মালিয়াড়ায় গিয়াছিলেন, কিন্তু মন স্থির না হওয়ায় তথা হইতে পুনরায় দাঁড়কায় ফিরিয়া আসেন। কয়েক বৎসর দাঁড়কায় থাকিয়া—পরে নিকটবর্ত্তী লা-ঘোষা গ্রামে গিয়া তথায় তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন। লা-ঘোষায় তাঁহার বাস-ভবন এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১২৫০ সালের ১৪ই আষাঢ়—২৪ পরগণা—নৈহাটী থানার অধীন রাহুতা গ্রামে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী। ইঁহারা ছয় সহোদর ছিলেন, সম্প্রতি দুই সহোদর বর্ত্তমান আছেন। স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইঁহার মধ্যম সহোদর ছিলেন। রঙ্গলাল বাল্যে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে বিদ্যারম্ভ করিয়া—রাহুতার

(১) দাঁড়কায় প্রায় ৮।৯ শত ঘর লোকের বাস। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ায় বারশত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমান লোক সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার হইবে। দাঁড়কায় পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট রেশম-কোয়া প্রস্তুত হইত। এখনো এখানে তুঁতপাতার চাষ হয়। দাঁড়কার রায়-বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদ হইতে এই বংশের একশাখা খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেই বংশেই রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। আর এক শাখা প্রথমে মাধাইপুরে পরে এই দাঁড়কায় আসিয়া বাস করেন। এই বংশে মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দাঁড়কায় বহু কীর্ত্তিমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। মহারাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীশচন্দ্র রায় এখন দাঁড়কায় একজন সম্রান্ত জমিদার বলিয়া পরিচিত।

লা-ঘোষা গ্রামে 'ভল্লা' নামে একটি জাতি আছে। বাগদীগণের সঙ্গে আপোষে ইঁহাদের খাওয়া চলে। কিন্তু মজ্‌লিসে পংক্তি-ভোজন—কি বৈবাহিক আদান-প্রদান চলে না। 'মল্ল' এবং 'ভল্ল' আমরা এক শ্রেণীর জাতি বলিয়া মনে করি। মল্ল যেমন মাল হইয়াছে, ভল্ল তেমনি ভল্লা হইয়াছে। মল্লদের মত ইঁহারা ও একটি প্রাচীন বৌদ্ধ্‌জাতি। বর্ত্তমানে ইঁহাদের দুর্দ্দশাও প্রায় মালদের অনুরূপ।

ইংরাজী-বাঙ্গালা—বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। পরে পুরুলিয়ায় তাঁহার খুল্লতাত ৺শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় গিয়া তথাকার উচ্চইংরাজী-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কিছুদিন অধ্যয়নের পর এই স্থান হইতেই তাঁহার বিদ্যালয়ের সহিত সকল সম্বন্ধের শেষ হইয়া যায়। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি কিছুদিন (বালীর পশ্চিমস্থিত) বলুটীগ্রামে ও চন্দননগরে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। এই সময়েই বৈদ্যবাটীর লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতের কন্যা জ্ঞানদা সুন্দরীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

বিবাহের অল্পদিন পরেই প্রবল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া রঙ্গলাল শিক্ষকতা-কার্য্য ত্যাগ করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়াও তিনি বিদ্যার সংস্রব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতেই তাঁহার চিকিৎসক ও বন্ধু—ডাক্তার রমণচন্দ্র সাধুর নিকট এবং ডাক্তার আই হার্দার্ড সাহেবের নিকট তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য চন্দননগরে আসিয়া বাস করায় এবং প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক রেরিণী সাহেব মধ্যে মধ্যে ২।৪ দিন করিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া অবস্থিতি করায়—রঙ্গলাল তাঁহাদের নিকট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়-বন্ধু—লোকনাথ কবিরাজের অনুরোধে তিনি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতেও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অতঃপর রঙ্গলাল ইছাপুর স্কুলের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া যান, কিন্তু ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। কলিকাতায় আসিয়া টাকশালে প্রথমে পয়সা কাটিবার ঘরে, পরে—পয়সা মুদ্রাঙ্কন করিবার ঘরে তিনি কিছুদিন অফিসিয়েটিং অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল কলিকাতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুঃসাধ্য ম্যালেরিয়া জ্বর তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গাজিপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায় চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া তিনি কিছুদিন পুলিসের কেরাণীগিরির কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশের কাজ তাঁহার মনোমত না হওয়ায় তিনি দাঁড়কায় চলিয়া আসেন। বীরভূমের স্কুলসমূহের ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টর হরকালী বাবু তাঁহার নিকট আত্মীয় ও জ্ঞাতি ছিলেন। হরকালী বাবুই রঙ্গলালকে দাঁড়কায় আনিয়াছিলেন। গাজীপুরে তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও জমিদার

ঠাকুর দত্তের নিকট পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়েই কানপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তের পণ্ডিত গিরিজা দত্ত শাস্ত্রী, নয়াগাঁয়ের পণ্ডিত যুবক মন্নুলাল শাস্ত্রী এবং বৃদ্ধ মন্নুলাল শাস্ত্রীর নিকট তিনি কাব্য-নাটক, আগম-পুরাণাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথমে ৺কাশীধামে কোনো পরমহংসের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে তারামন্ত্রে দীক্ষিত হন। দাঁড়কায় আসিয়া তিনি একটি ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্রের খুব আদর হইয়াছিল। দাঁড়কায় এখনো কাহারো কাহারো নিকট তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি সুন্দর সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ধর্ম্মসভার জন্য অনেক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।

স্বভাব-কবি রঙ্গলাল বাবু উপস্থিত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতার পাদ-পূরণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। দাঁড়কায় অবস্থিতিকালে—তথাকার ভদ্রলোকেরা এবং অভ্যাগত পণ্ডিতগণ আমোদ করিয়া কবিতা শুনিবার জন্য তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতেন, রঙ্গলাল বাবু প্রশ্ন শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। দাঁড়কার পঞ্চানন রায় ও মহাতাপচন্দ্র রায় তাহা লিখিয়া লইয়া প্রায় এডুকেশন-গেজেটেই পাঠাইতেন। এডুকেশনে এমন বহু কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইং ১৮৭০ সালে স্কুল-ইনস্পেক্টর স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাঁড়কার স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। সে সময় তাঁহার এবং উপস্থিত ভদ্রলোকগণের প্রশ্নে রঙ্গলাল বাবু বহু কবিতার পাদ-পূরণ করিয়া সকলকেই আনন্দিত করিয়াছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কল্পদ্রুম, আর্য্যদর্শন, এবং জন্মভূমিতেও তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া আরো অনেক কাগজেই রঙ্গলাল বাবু অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের নাম শরৎশশি, বিজ্ঞানদর্শক, চিত্ত-চৈতন্য উদয়, বৈরাগ্য বিপিন-বিহারী এবং হরিদাস সাধু। আর্য্যদর্শনে (১২৯১ সালে) প্রকাশিত শতবর্ষের-প্রাকৃত-বঙ্গও বোধ হয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রামবনবাস' নামে একখানি নাটক লিখিয়া তিনি হেতমপুর-রাজবাটীর সখের-থিয়েটারে অভিনয় করিতে দিয়াছিলেন। নাটকখানি বড় বলিয়া থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে একটু কাট-ছাঁট দিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বইখানি

লইয়া যান। আর কিন্তু ফেরৎ দেন নাই। রামবনবাস মুদ্রিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। ১২৯০ সালে রঙ্গলালবাবু কলিকাতায় একটি ছাপাখানা করিয়াছিলেন। তাহাতে বহু টাকা লোকসান হওয়ায় তিনি ছাপাখানা উঠাইয়া নিজগ্রামে লইয়া যান। রাহুতা গ্রামে তিনি প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়ভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বকোষ বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই বিশ্বকোষ সম্পাদন পূর্ব্বক অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

দাঁড়কা অঞ্চল ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। তিন-চারি বৎসর পূর্ব্বে—এই সেদিনও—মাত্র এক বৎসরে এই ম্যালেরিয়ায় বারশত লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে!! রঙ্গলাল বাবুর সময়েই ইহার সূচনা হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য দেখিয়া তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই সময় দাঁড়কা হইতে অদূরবর্ত্তী লা-ঘোষায় গিয়া তিনি বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন লা-ঘোষায় অতিবাহিত হইয়াছে। বিগত সন ১৩১৬ সালের ১৭ই কার্ত্তিক লা-ঘোষার বাস-ভবনেই এই বহুগুণসম্পন্ন কবি রঙ্গলাল—পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্ব-দেহ দাহ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার দেহ লা-ঘোষায় সমাধিস্থ হইয়াছে। সমাধির উপর একটি ইষ্টক-বাঁধানো বেদী, তাহার-উত্তর-পার্শ্ব-সংলগ্ন একখণ্ড মর্ম্মর প্রস্তরে লিখিত রহিয়াছে—

ওঁ তারা

দয়া সিন্ধুর্ম্মহাযোগী "বিশ্বকোষ" প্রবর্ত্তকঃ।
জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ববাসিনাম্‌।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—

আবির্ভাব গ্রাম রাহুতা জেলা ২৪ পরগণা
২৪শে আষাঢ় ১২৫০

তিরোভাব ১৭ই কার্ত্তিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্‌।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে।

রঙ্গলাল যখন দাঁড়কায় আসেন,—সন্ন্যাসীর বেশ,—গেরুয়া পরিতেন, প্রথম প্রথম কাহারো সঙ্গে বড়-একটা মিশিতেন না, সকাল-সন্ধ্যায় একা একা

ময়ূরাক্ষী-নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, আর দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময় প্রায় বই লইয়াই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। পড়ার নেশা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। ঘরে বসিয়া বহুবিধ বই পড়িয়াই তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় অনন্য-সাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-খ্যাতির কথা এখনো প্রবাদের মত শুনিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসালব্ধ-উপার্জ্জন হইতে মৃত্যুকালে তিনি বহু সহস্র টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।'

রঙ্গলালের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দাঁড়কার পঞ্চানন রায় মহাশয় প্রশ্ন করেন, 'হাতের বাঁশীটি কেন হইল সরল'! সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গলাল পূরণ করিয়া দেন—

একদিন হাসি হাসি শশিমুখী রাই,
কহিলেন শুন শুন প্রাণের কানাই।
লইয়া বাঁকার হাট ওহে নটরাজ,
আগমন করিয়াছ এই ব্রজমাঝ।
ললাটে অলকা তব বাঁকা ভাবে আঁকা,
চরণে নূপুর পরো—তাও শ্যাম বাঁকা।
শিরে শিখি-পুচ্ছ-চূড়া—বাঁকা হ'য়ে রয়,—
সকলি তোমার বাঁকা—সোজা কিছু নয়।
বাঁকা আঁখি, বাঁকাঠাম—বাঁকাই সকল
হাতের বাঁশীটি কেন হইল সরল?

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন দিয়াছিলেন—'গোদ হয়নি চুলে' রঙ্গলাল উত্তর দিয়াছিলেন—

"সুন্দরে দেখিয়া যত পুরনারারী দলে,
নিজ নিজ পতি-নিন্দা করিছে সকলে।
এক ধনি কহে সই কি কহিব দুখ,
বিধাতা আমার প্রতি বড়ই বিমুখ।
গোদাপতি বাম-বিধি দিলেন আমায়,
গোদের ভরেতে মম সদা প্রাণ যায়।
নাকে ঝোলে লম্বা গোদ যেন পাঁড়শশা,
কাণেতে ঝুলিছে গোদ বাবুয়ের বাসা।
চোকে গোদ, দাঁতে গোদ, গোদ গ্রন্থিমূলে,
সত্যপীরে সিন্নি মেনে গোদ হয়নি চুলে।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাপ চন্দ্‌ বাহাদুর রঙ্গলালকে "কাব্য-রত্নাকর" উপাধি দিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট

[৫]

(ভদ্রপুরের পার্সি-সনন্দ)

বালানগর-কাহিনীতে পঞ্চম-সংখ্যক পাদটীকায় সৈয়দ মহবুবউল্লা সহিদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ভদ্রপুরের শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবদুস্ সোভান্ তাঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইহার নিকট হইতে একটি পার্সি-সনন্দের আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল। সৈয়দ আবদুস্ সোভান বলেন,—'এই সনন্দে বাদসাহ কর্ত্তৃক তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে ভূমিদানের কথা আছে'। এই সনন্দে "সৈয়দ মোয়াজ্জাম" এর নাম পাওয়া যায়। সোভান সাহেব আমাকে —তাঁহাদের বংশতালিকার যে নকল দিয়াছেন,—তাহাতে মোয়াজ্জাম সাহেবের নাম পাওয়া গেল না। তবে 'মোয়াজ্জাম' যদি কাহারো নামান্তর হয় তো— সে পৃথক্ কথা। এই সনন্দখানিতে দুইটি 'মল' আছে। তাহাতে লিখিত রহিয়াছে—"সা-শুজার জানবেগ"। সা-শুজা যখন বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন,—তখন তাঁহার রাজধানী ছিল বোধ হয় রাজমহালে। জানবেগ কোথায় জানি না। নিম্নে সনন্দখানির মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল। ইহাতে বাঙ্গালা সন ১০৪৮ সালের উল্লেখ আছে।

সনন্দের মর্ম্মানুবাদ

"ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহম্মদাবাদ সরকারের অধীন—আলমক চাকা পরগণায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত কর্ম্মচারীগণ জ্ঞাত হউক যে, সৈয়দ মোয়াজ্জাম উপযুক্ত পাত্র বিবেচিত হওয়া—এবং তাঁহার অনেকগুলি পোষ্য থাকায়,—ঐ পরগণার 'দীঘী' নামক মৌজা—তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদের ভরণপোষণার্থ দেওয়া গেল। তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ—বাঙ্গালা সন ১০৪৮ সালের ফসল রবির সুরু হইতে উক্ত মৌজার রাজস্ব বার টাকা পাঁচ আনা ধার্য্য হইল। কেহ ইহাতে কোনো-রূপ বাধা দিবে না। তাঁহারা প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক ফসলে ঐ আয় ভোগ করিবেন, এবং নবাব-পরিবারের জন্ত খোদার নিকট দোয়া' করিবেন।"

পরিশিষ্ট

[৩]
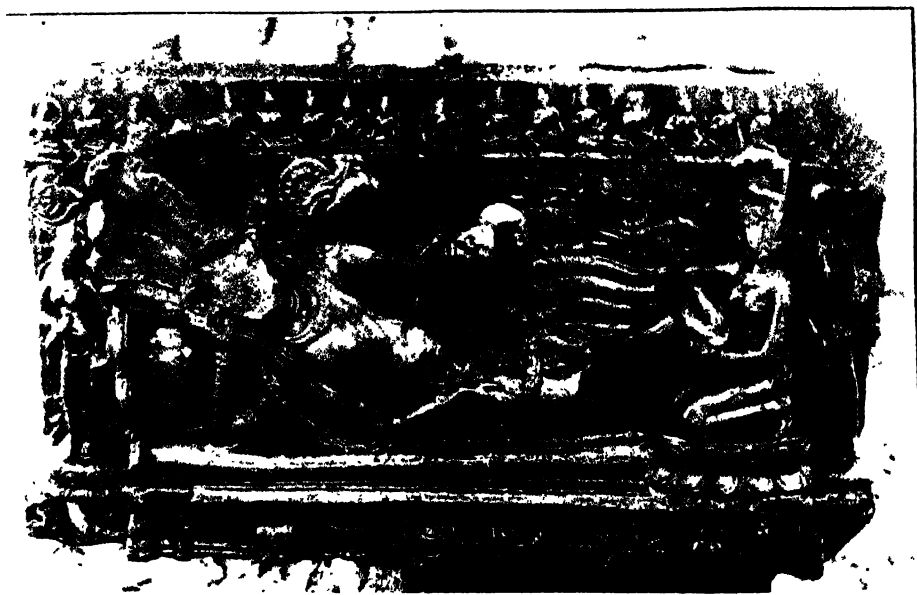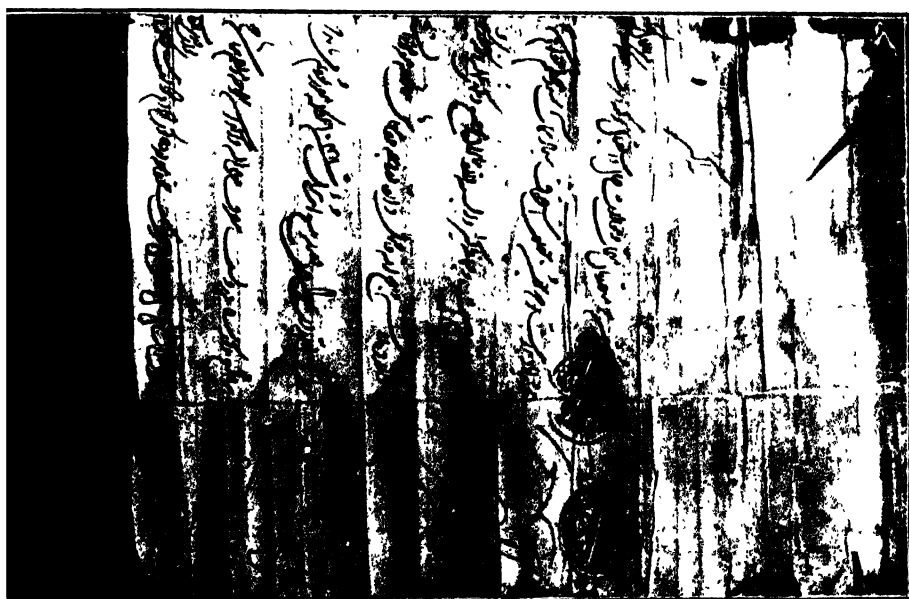
(রামপুরহাট-কাহিনী মাড়গ্রামের—মানপতি রাজা)

রাজা মানপতির উপর একটু সন্দেহ হইয়াছে। তজ্জন্য এই প্রসঙ্গের পুনরবতারণা করিতে হইল। গয়া-জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুরগ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে মগধেশ্বর মানরাজগণের পরিচয় পাওয়া যায়। (১) একটা বংশেরই নাম ছিল 'মান-বংশ'। শিলালিপিতে 'বর্ণমান', 'রুদ্রমান' প্রভৃতি নরপতিগণের নাম উল্লিখিত আছে। ১০৫৯ শকাব্দে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়। ১০৫৯ শকাব্দায় খৃষ্টাব্দ ১১৩৭ ছিল। রাজসভার পণ্ডিত মনোরথ—গৌড়াধিপতির প্রধান-মন্ত্রী শ্রীদেবশর্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনোরথ পুত্র গঙ্গাধরের সহিত—গৌড়াধিপের প্রিয়পাত্র জয়পাণির কন্যা পাসলে-দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন—সে সময় (১১৩৭ খৃঃ অঃ) সম্রাট্ বল্লালসেন গৌড়-সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। যাহা হউক এই মান-বংশের সঙ্গে যে গৌড়ের সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। শিলালিপির একস্থানে লিখিত আছে—"তস্মিন্ মানপত্তের্মহীরসি গৃহে প্রাপিপ্রতিহারতা"। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—'মানপতি' তাঁহাদের একটা সাধারণ উপাধি ছিল। এখন সন্দেহ হইতেছে—'মাড়গ্রামের মানপতি' হয়তো উক্ত মান-বংশীয় কোনো নরপতি হইতে পারেন। মগধে মুসলমান-বিপ্লবে উপদ্রুত হইলে হয়তো তাঁহারা গৌড়পতির আশ্রয়ে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অথবা মগধ ও গৌড়ের একই দুরবস্থা দেখিয়া কোনো মান-বংশধর রাঢ়ের এই নিভৃত প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাণ্ডক্য, মাড়গ্রাম, মানপতি, সবই সন্দেহজনক। বীরভূমে 'মানারা', 'মানদারা' প্রভৃতি কয়েকটি স্থান মাড়গ্রামের অদূরেই অবস্থিত। বর্দ্ধমান জেলায় সুপ্রসিদ্ধ 'মানকরের' নাম অনেকেরই পরিচিত। মানকরের নিকটে 'অমরার গড়' নামে এক প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 'পানাগড়'ও বোধ হয় বেশীদূরে হইবে না। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের মনে হয়—এক সময় 'মানবংশ' এদেশে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড ২য় ভাগ) ৪র্থ অংশ।

পরিশিষ্ট

[৭]

(দাঁড়কের-মাঠের নির্ণয়কুণ্ড হইতে প্রাপ্ত মুদ্রা)

তারাপুর কাহিনীতে দাঁড়কের-মাঠের উল্লেখ করিয়াছি। দাঁড়কের মাঠে নির্ণয়-কুঁড়ে নামে একখণ্ড জমি (ধানের ক্ষেত) আছে, তাহাও বলিয়াছি। এই নির্ণয় কুঁড়ে বা নির্ণয়কুণ্ড যে দণ্ডেশ্বর রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন পুষ্করিণী ছিল, এবং তথা হইতে কৃষকেরা সময়ে অর্থাদি প্রাপ্ত হয়, সে কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। জয়সিংহপুর-নিবাসী ৺হটুমণ্ডল একবার নির্ণয়কুণ্ড হইতে বহু মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র ক্ষুদিরাম সিংহের নিকট এ সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছি। জয়সিংহপুরের মাখনলাল দত্তের বাড়ীতে একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাটিও নির্ণয়কুণ্ড হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দত্ত মহাশয় যাহার নিকট হইতে এই মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নানা কারণে আমরা তাহার নাম প্রকাশে বিরত রহিলাম। চিত্রের দক্ষিণপার্শ্বে সেই মুদ্রার চিত্র রহিয়াছে। এই মুদ্রাটি বাঙ্গালার সুলতান শামসউদ্দীন ফিরোজ সাহেব। ইনি নাসিরউদ্দীন মহমুদ শাহ বা বাগড়া খাঁর পুত্র। বাগড়া খাঁর অপর পুত্রের নাম কায়কোবাদ, ইনি দিল্লীর সুলতান হইয়াছিলেন। মুদ্রার এক পার্শ্বে লিখিত আছে—

"আশ্ সুলতানা আবুল মোজাফ্ফর ফিরোজ শাহ শামস্দ্দুনয়া ওাদদি আল্ আজাম্।"

অপর পার্শ্বে আছে—

"আমিরুল্ মোমেনিন্ আল্ এমামুল্ মোয়াজ্জাম"। টাঁকশালের নাম কি সন তারিখ নাই। এই মুদ্রার বাম দিকে ক্রমান্বয়ে অপর যে তিনটি মুদ্রার চিত্র আছে তাহার দুইটি রামচন্দ্রী মোহর নামে পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। এই মুদ্রা কিরূপে কখন সৃষ্ট হইয়াছে, রামচন্দ্রের মোহর কেন নাম হইল, বলিতে পারি না। চতুষ্কোণ মুদ্রাটির এক পার্শ্বে "লা ইলাল্লাহো" ইত্যাদি ও অপর পার্শ্বে "হাসেন হোসেন ও ফাতেমার" নাম লিখিত রহিয়াছে। ইহা কাহারো মুদ্রা নহে। ইহাকে আমরা এক প্রকার "পদক" বলিয়া অনুমান করি।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি	শুদ্ধ
ভিওর	৪		১৭	ভীওর
ব্রাহ্মণ	৯		২	ব্রাহ্মণ
ধ্বংসত্তপকে	১১	(১০) পাদটীকা	৯	ধ্বংসস্তূপকে
প্রাতষ্ঠা	১৩		১৮	প্রতিষ্ঠা
উক্ত নাটক হইতে	১৬		৪	চণ্ডকৌশিক নাটক হইতে
মূত্তি	২৬	২৩ পাদটীকা	২	মূর্ত্তি
জোগানদার	.৩৮		১২	যোগানদার
গোতস্বামি	৪৬	৪ পাঃ	৬	গোতস্বামী
শিবচন্দ্র চৌধুরী	৬০		১০	শিবচন্দ্র সরকার
বালানগন্ন-কাহিনী	৭১		(শীর্ষক)	বালানগর-কাহিনী
ব্যবহার জীব	৮১		৩	ব্যবহারাজীব
ঘাম পরিবর্ত্তন	৮০		(পার্শ্বসূচী)	ক্রম-পরিবর্ত্তন
মুরলী দাস	৮১		১৪	মুরারী দত্ত
রত্নাট	৮২		২	রতনটি
দি বেঙ্গল একাডেমি লিটারেচার	৮৪		পার্শ্ব সূচী	দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার
জিনিসের দোকান।			৮	, জিনিসের দোকান-
পশারীর সংখ্যা ও	৯৫			পশারীর সংখ্যাও
প্রাচ্যা	৯০	পাদটীকা	১	প্রাচ্যাং
গঙ্গাজলাবিতা	৯০	,,	১	গঙ্গাজন্মাবিতা
প্রতীচ্যন্ত	৯০	,,	২	প্রতীচ্যন্ত
বৃহন্তে	৯১	,,	১	বৃহন্ত
স্বামি	৯২	,,	৮।১০	স্বামী
স্বামিসহ	৯৬	,,	১৭	স্বামীসহ
এন্ এল্ এম	১৮০	,,	২৭	এন্ এন্ এম
তিনিজন	১০০	,,	৩০	তিনজন

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি	শুদ্ধ
উদ্যত হইল	১০২	,,	৬	উদ্যত হইলে
করিত থাকে	১০২	,,	১৩	করিয়া থাকে
মধুঋষি	১০২	,,	১৫	মধু-ঋষি
কোনো সন্দেহনাই	১০২	,,	১৭	তাহাতে কোন সন্দেহ নাই
একঘর বোলতেই	১০২		২৭	এক ঘরবোলাতেই
(১৩)	১০৩		৩	(১৪)
দেখিতে যায়	১০৪		১	দেখা যায়
কুতবা	১০৪		৭	কুতুবা
কুতবার				...ার নির্ণয়...
কৃষমাত্তী	,,			...ম সিংহের নিকট এ সম্বন্ধে
কৃষমাত্তী	,,		পার্শ্বসূচী	...র বাড়ীতে একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। দত্ত মহাশয়
নারায়ণপুরেই	,,		২৪	নানা কারণে আমরা তাহার
সংস্থাগার	১০৫		১৮	[illegible]
উঠাইয়া	,,		২৬	উঠিয়া
শাশা	১০৬		২১	শাপা
মালুই	১০৭		২৮	শালুই
যেদিন	১০৮		১০	সে দিন
মহাশয়ের	১০৯		(পাদটীকা)	মহাশয়
স্বর্ণপুর,	,,	,,	৪	গণপুর
তৃজাতেই	১১০		১৭	তৃজাতেই
পাচিক-বৃত্তি	১১০		১৯	পাচিকা-বৃত্তি
বাজা কলহ	১১০		২৩	বাক-কলহ
তাহার পর আর রাজা	১১১		১৯	তাহার পর রাজা
বলিয়াছিলেক	১১২		৩০	বলিয়াছেন
এই কর্য্য	১১৩		১	এই কার্য্যে
আথরা রাজার	১১৩		১৬	আড়রা রাজার
মূত	১১৩		২৯	মৃত
উপাখ্যান জালা	১১৪		২৫	উপাখ্যান [illegible]

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
পৃথক গ্রাম	১১৬	৬	পৃথক্ গ্রাম ও
কন্যা	১১৬	২২	কন্যা
আহাজে	১১৭	২৮	তাহাই তো
কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়	১১৮	১৯	কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া
সে সাধু	১১৯	১৯	যে, সাধু
ক্ষেত্রেই	,,	২১	ক্ষেত্রই
ধ্বংসে	১২০	৬	ধ্বসে
রাজাত্তর্ব্বর্ত্তী	১২০	১৭	রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী
মন্নটীর	[illegible]	১৮	মলুটির
জোগানদার	[illegible]	১০	অধ্যায়ে
পোতস্বামি	[illegible]	২১	অধীশ্বরী
শিবচন্দ্র চৌধুরী	[illegible]	২৪	পূর্ব্বজন্মের
বালানগন্ত-কাহিনী	[illegible]	৫	বলিলেন
ব্যবসাদে জীব	[illegible]	২২	বশিষ্ঠদেব
সে যে	,,	২৪	যে
বশিষ্ঠ জীবন-কাহিনী	,,	২৫	বশিষ্ঠের জীবন-কাহিনীর
সাত-পুত্রের	১২৫	১১	শত [illegible]
নেত্র পক্ষে	,,	১৮	নেত্রপক্ষে
যুবরাজ	১২৬	১০	যেবরাজ
হে রায়	১২৭	২৯	হে রায়ে !
উর্দ্ধে কেশানন্দ নাথ	১৩০	২৩	উর্দ্ধকেশানন্দনাথ
পচাকেনা	১৩৩	৬	পচাকোল্
অবস্থিতের	১৩৪	২২	অবস্থিতির
অখ্যাত	১৩৭	১৭	আখ্যাত
প্রাক্	১৩৮	১১	প্রাক্‌-সময়ে
শিক্ষা-দিক্ষায়	,,	২০	শিক্ষা-দীক্ষায়
তনি	১৪০	৩	তিনি
নান	১৪১	১৩	নানা
উক্তরূপ	১৪২	১	উক্তরূপ

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
গ্রহণ করিয়াছেন	১৫৯	৫	গ্রহণ করিয়াছিলেন
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য দেবের-সহিত কিন্তু—	১৫৯	৬	কিন্তু নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য দেবের সহিত
শুক্লদত্ত নাম	১৫৯	১৮	শুক্ল দত্ত নাম,
পুরুষোত্তম আচার্য।	”	”	পুরুষোত্তম আচার্য্য—
নানে	১৭৬	১	নামে
গ্রামে	১৭৭	১	গ্রাম
জোয়ানকে	১৮৫	৯	যোয়ান-কে
প্রাঙ্গনে	১৮৬	[illegible]	প্রাঙ্গণে
পাইকোড়ে একটি ভগ্ন বাসুদেব মূর্ত্তির পাদপীঠে 'পণ্ডিত বিশ্বরূপ[illegible] নামের লিপি দেখিয়াছি।	[illegible]	[illegible]	এই অংশ উঠিয়া যাইবে।
পণ্ডিত আনন্দ যশা ও পণ্ডিত বিশ্বরূপ কে	১৯[illegible]	১৯	পণ্ডিত আনন্দ যশাকে

বীরভূম-বিবরণ

(১ম খণ্ড)

সম্বন্ধে অভিমত

২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
কলিকাতা, ২রা পৌষ, ১৩২৬

হেতমপুরের রাজবাড়ী হইতে বীরভূম-বিবরণের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। বইখানি [illegible] প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হইবার পরক্ষণেই গ্রন্থকার সাদরে আমা[illegible]নি পাঠাইয়া দেন। কিন্তু নানাকারণে বইখানি এতদিন পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। ১৩২৬ সালের ভাদ্রমাসে একদিন নির্জ্জনে বইখানি পড়িতে আরম্ভ করি। মনে করি[illegible]লাম "সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা" যেমন গেজেটিয়ারের বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়া ও গাঁয়ের গালগল্প একত্র করিয়া ও নিজের গোটাকতক কথা দিয়া জেলার কাহিনী লিখেন, এও বুঝি তাই। কিন্তু বইখানি খুলিয়া আমার মনের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। দেখিলাম বইখানি একবার খুলিলে শেষ না করিয়া আর যোড়া যায় না। এক ত বীরভূম বাঙ্গালা ছাড়া দেশ। বাদ্‌সাহী ও নবাবী আমলে বীরভূম প্রায়ই স্বাধীন ছিল। ইংরাজেরাও ১৭৮৮ সালের পূর্ব্বে বীরভূম কায়দা করিতে পারেন নাই। সুতরাং উহার ইতিহাস জানিবার জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই আগ্রহ আছে, আমারও ছিল। যে সব জিনিষ জানার জন্য আগ্রহ ছিল তাহার অনেকই ইহাতে পাইলাম। প্রথম, হেতমপুরের রাজারা দুই তিন পুরুষের মধ্যে কেমন করিয়া এতবড় জমিদারী করিয়া ফেলিলেন তাহার বিবরণ ইহাতে খুলিয়া দেওয়া আছে। ইঁহাদের পূর্ব্বে রাজনগরের মুসলমান রাজা ছিলেন তাঁহাদের বিবরণ খুলিয়া দেওয়া আছে। মুসলমানদেরও পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন তাঁহাদেরও কথা অনেক দেওয়া আছে। তাহা হইলেই বাঙ্গালার পাশে একটি স্বাধীন রাজ্যের তিন চারি শত বৎসরের ইতিহাস ইহাতে দেওয়া আছে। পড়িতে কোন কষ্ট নাই জলের মত পড়িয়া যাও তাহা অতি প্রাঞ্জল (প্রাণ-জল)। ইহারই [illegible] বর্গীর হাঙ্গামের কাহিনী আছে। সিয়ার-উল্ মুতাক্ষরীন্-এ বর্গীর

হাঙ্গামের চোখে দেখা বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু সে বিবরণ সারা রাঢ়দেশে বর্গীর হাঙ্গামের বিবরণ। ইহাতে শুধু বীরভূমে যে বর্গীর হাঙ্গামা হয় তাহারই বিবরণ আছে। গ্রন্থকার নিজে ত চোখে দেখেন নাইই কিন্তু তিনি এমন করিয়া লিখিয়াছেন যেন চোখে দেখা লোকের কাছে শুনিয়াছেন কিম্বা চোখে দেখা লোকের বই পড়িয়া লিখিয়াছেন।

নন্দকুমার একজন সেকালের বাঙ্গালার প্রকাণ্ড লোক। তাঁহার বংশ-পরিচয়, তাঁহার জীবনচরিত তাঁহাব উত্তরাধিকারীদের কথা শুনিবার জন্য কোন্ বাঙ্গালীর আগ্রহ নাই। সে আগ্রহ নিবারণের জন্য অনেকেই প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও ইতিহাস লিখিয়াছেন। কিন্তু সবই বই পড়িয়া লেখা—ইংরাজের [illegible] পড়িয়া লেখা, নন্দকুমারের কথাই লেখা—তাঁহার বাপ-পিতামহের কথাও নাই, তাঁহার ছেলেদের কথাও না [illegible] ই কীর্ত্তি-কাহিনীর কথাও নাই। এ বইএ কি [illegible] তুঁইফোড় নহেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরাও কীর্ত্তি [illegible] করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা [illegible] মোটা হাসাইয়াছেন— তাহাও একশত বৎসরের মধ্যে—তাহাও বেশ খুলিয়া দেওয়া আছে। ভদ্রপুর-কাহিনী অতি খাসা লেখা হইয়াছে।

ভারতের এক উজ্জ্বল রত্ন বীরভূমের খনি হইতে বাহির হইয়াছেন। সে রত্নটি জয়দেব, আর খনিটি কেঁদুলি। জয়দেবের কথা যতদূর পাওয়া যায় সব আছে। আর কেঁদুলির আশপাশের অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জায়গার ইতিহাসও দেওয়া আছে। এখনকার কেঁদুলির মেলা কেমন করিয়া জমিয়া আসিল তাহাও খুলিয়া দেওয়া আছে।

বলিতে কি, একদল শিক্ষিত লোক স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া অনেক খুঁজিয়া, অনেক ঘাঁটিয়া, অনেক সংগ্রহ করিয়া বইখানি লিখিয়াছেন, পড়িয়া বাস্তবিকই পুলকিত হইয়াছি। পড়িতে দেরী হইয়াছে বলিয়া অপরাধ স্বীকার করিতেছি ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* * * * * * * * *

"বীরভূম বহু কীর্ত্তিমান্ লোকের জন্মভূমি। জয়দেব, চণ্ডীদাস, লাউসেন, ইছাইঘোষ, নন্দকুমার প্রভৃতি বীরভূমের লোক। এই বিবরণ হইতে ইঁহাদের বহু কীর্ত্তির পরিচয় প্রকাশিত হইবে। এবং এই সমস্ত বিবরণ হইতে ক্রমে বঙ্গের ইতিহাস মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ হইবার পথ পাইবে।

এইজন্য মহারাজকুমার বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন।"

প্রবাসী ১৩২৩। ফাল্গুন।

(১৬শ ভাগ ২য় খণ্ড)

* * * * *

"ইহাতে হেতমপুর, [illegible]পুর, সুপুর। [illegible]রবন, বক্রেশ্বর, মঙ্গলাডিহি জোঁকলা [illegible] গ্রন্থের কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। কাহিনীও [illegible] প্রাচীন কীর্ত্তি-কথা। ঐতিহাসিকের কাছে সে[illegible]-গ্রন্থে বহু চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে,—ছাপা কাগজ, [illegible] ভারতী বৈশাখ ১৩২৪।

* * * * *

"আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। আনন্দের অনেকগুলি কারণ আছে,—প্রথম, মহারাজকুমার স্বদেশের গৌরব-কাহিনী অতীতের অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল যে নিজের দেশ-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, ইহাতে তাঁহার ইতিহাস-রসিকতা, সাহিত্য-প্রিয়তা এবং পরিশ্রম-পটুতাও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। * * * * আর একটি আনন্দের কথা, এই পুস্তকের ভাষা বিশুদ্ধ। বাঙ্গালাভাষা আজ কাল যেরূপ নিরাশ্রয় হইয়াছে, উদ্দাম লেখকের পদাঘাতে পরিপিষ্ট হইতেছে, তাহাতে এরূপ বিশুদ্ধভাষা দেখিলে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। পুস্তকের ছাপা কাগজ, ছবি সবই মনোহর। চিত্রগুলি কেবল যে সুন্দর এমন নহে, শিক্ষাপ্রদ।" * *

হিতবাদী, ১৩২৩।২৫ শে ফাল্গুন।

* * * * *

"বীরভূম হেতমপুরের মহারাজকুমার—শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বীরভূমে একটি অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কাজের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার আরম্ভ দেখিয়া যদি পরিণতির কল্পনা করা অসঙ্গত না হয়, তবে আমরা বলিতে পারি এ সমিতি বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনা কার্য্যে বিশেষ

সাহায্য করিতে পারিবে। * * * অনুসন্ধান-সমিতের কার্য্য অতি অল্প দিনই আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই বীরভূমে ইতিহাসের যে পরিমাণ উপকরণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সকলেই বলিবেন যে, বীরভূম বাঙ্গালার অতীত কীর্ত্তির এক মহাশ্মশান।" * * * বসুমতী, ১৩২৩৩রা

* * * * *

[illegible]পুরের মহারাজকুমার শ্রীমান্ মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী 'বীরভূম-[illegible]সমিতি' নাম দিয়া এক সমিতি গড়িয়াছেন। সেই সমিতির উদ্যোগে [illegible] বীরভূম-বিবরণ ১ম খণ্ড নামক একখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি। পুস্তকখানি আমরা আগা[illegible] পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত এবং আশান্বিত[illegible] তাঁহার লিখন-ভঙ্গীর পরিচয় পাইয়া,—উঁহার[illegible] মহারাজকুমার শ্রীমান্ মহিমানিরঞ্জনের বিনয় [illegible] এতটা আনন্দ নহে। আনন্দ ইহার জন্য,—আমার এই [illegible] * * এতদিন পরে বাঙ্গালীর জাতীয়তার বেদী রাঢ়ের প্রকৃত ইতিহাস-বিশ্লেষণ ও নির্দ্ধারণ জন্য সে কেলে গৃহিণীর ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়িতে সকল সামগ্রীর সংগ্রহ হইতেছে * * * এই সংগ্রহের পদ্ধতি অশেষ প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাই শতমুখ থাকিলে শতমুখে মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনের প্রশংসা করিতাম"। * * * নায়ক, ৯ই ফাল্গুন ১৩২৩।

* * * * *

"এই সকল গ্রন্থের সঙ্গে আজ আর একখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে আমরা শ্লাঘা বোধ করিতেছি। সে গ্রন্থখানি 'বীরভূম-বিবরণ'। বীরভূম বাঙ্গালী-কীর্ত্তির এক পবিত্র পীঠস্থান। বীরভূমের কথা না বলিলে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব যে গীতি-কাব্য তাহার সৃষ্টিও এই বীরভূম অঞ্চলে। শুধু জয়দেব ও চণ্ডীদাসের লীলাভূমি বলিয়া নয়, কবি জগদানন্দ ও ইছাইঘোষ প্রভৃতির জন্যও এ অঞ্চল বিখ্যাত। তার পর কবি ও সাধক ছাড়া কর্ম্মবীরও এ অঞ্চলে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের স্মৃতি লাউসেনের স্মৃতি এদেশের ইতিহাসের সহিত জড়ান মাখান আছে। * * * বাস্তবিক বীরভূম বাঙ্গালার গৌরব-ভূমি। * * তাই বলিতেছিলাম বীরভূমের ইতিহাস না লিখিলে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পূ[illegible]

হয় না। শুধু অসম্পূর্ণ নহে, বাঙ্গালী যাহা লইয়া গৌরব বোধ করে সে গৌরবের অনেক কথাই অপ্রকাশিত থাকে। বীরভূম-বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা অত্যুজ্জ্বল পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদ যিনি কাগজ-কলমের সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ধরিতে পারেন, তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

তাই হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমরা শত-শত ধন্যবাদ দিতেছি তিনি বীরভূম-বিবরণের এ [illegible] সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। * * * বাঙ্গালী [illegible]

এতদ্ভিন্ন বহু সাময়ি[illegible]

করিয়া[illegible]

মহারাজকুমার।—

শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত।

'বীরভূম-বিবরণ ১ম খণ্ড'

চিত্র-শোভিত।

মহারাজকুমারের গ্রন্থ

'বীরভূম-রাজবংশ'

মূল্য—১৲ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—অথবা—

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

হেতমপুর রাজবাটী,

(বীরভূম)